আত্মজীবনী • মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

আত্মজীবনী

মূল : মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

অনুলিখন : যুবাঈর আহমাদ

ভাষা-নিরীক্ষণ : আহসান ইলিয়াস

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২২

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ২০২২

ষষ্ঠ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২৩

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ

মূল্য : ৫০০ (পাঁচশত) টাকা মাত্র

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৫৮৯৮-৮-৪

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

Email : ettihadpub@gmail.com

www.facebook.com/ettihadpublication

ইহদা ও অর্পণ

উম্মে আইমানকে
আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তার মাধ্যমে
অল্পসময়ে সবদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন।
বারাকাল্লাহু ফীহা ওয়া ফী আওলাদিহা!

অনুলেখকের কথা

এক- স্বপ্নপুরুষের খোঁজে

ধাপ-১

তখন সবেমাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে পা দিয়েছি। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় জীবিত দেশীয় আকাবিরদের সাক্ষাতকার বিষয়ক একটি গ্রন্থ হাতে আসে। ধারাবাহিক অধ্যয়নের মাঝে একজন আকাবিরের জীবনীতে চোখ আটকে গেল। সুদীর্ঘ তিন দশক প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন। বিশ্বখ্যাত একটি প্রিয় প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সৌভাগ্য জুটেছে তাঁর। দক্ষিণ এশিয়ায় ফিকহের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক যুগের সর্বপ্রথম তাখাসসুস প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তার; মূলত তিনিই ছিলেন এই প্রোগ্রামের প্রথম ছাত্র। দারুল ইফতার মতো সংবেদনশীল বিভাগের সুদীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা তার ঝুলিতে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেশে ফিরেছেন। এখানেও দীর্ঘ এক দশকের অধিক সময়জুড়ে (তখনকার হিসেবে) প্রতিষ্ঠানের খুঁটি ও বিশেষ পরিচিতি হিসেবে নিরসলভাবে কাজ করে যাচ্ছেন! এসব জানার সাথে সাথেই মনে জেগে ওঠে আকাঙ্ক্ষার বীজ! সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা! একটিবার তাঁর নুরানি চেহারায় দৃষ্টিপাতের আকাঙ্ক্ষা! দুহাত বাড়িয়ে তাঁর পেশানীতে চুমু এঁকে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা!

ধাপ-২

একজন মাওলানা সাহেবকে শুনতাম। দিনরাত একাকার করে শুনতাম। মনের গহীনে পৌঁছে যেত তার আবেদন। মুসলিম উম্মাহর বয়ান তুলে ধরতেন তিনি হৃদয়ের ভেতর লুকানো আগ্নেয়গিরির উত্তাপ নিয়ে। এই আহলে দিল মাওলানার আবেদন তাই শ্রোতার অন্তরকে শুধু নাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতো না, অন্তরের দরদমাখা আহ্বান শ্রোতাকে মাওলানার মিশনের জন্য পাগলপারা করে দিত। তখনো আমি উচ্চ

মাধ্যমিকের গণ্ডিতেই ছিলাম। একদিন মাওলানার মুখে তাঁরই গুরু, তাঁর শাইখ ও রাহবার, তাঁর জীবন গড়ে দেওয়ার কারিগরের নাম শুনি। হিন্দুস্থানি মুহাজির এক খান্দানি মুফতি সাহেব ছিলেন তিনি। আপাদমস্তক একজন সাদাসিধা মানুষ। দেখে বোঝার উপায় নেই এমন সাধারণ মানুষটির মাঝে কী অসাধারণ তেজ ও স্পৃহা লুকিয়ে আছে। সময়ের জালিমদের জুলুমি সিদ্ধান্ত সবসময় প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। সাতপুরুষজুড়ে বয়ে নিয়ে চলা আসমানি আমানত শুধু বংশধারায় সীমাবদ্ধ না রেখে এই মনীষা তাঁর একান্ত শাগরেদদের মাঝেও সমানভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। আমার স্বপ্নের পুরুষ ক্ষণজন্মা এই মনীষার হাতে গড়া বিশিষ্ট ও নিকটতম শাগরেদ। যেদিন একথা জানলাম, সেদিন থেকে এই মানুষটিকে এক নজর দেখার জন্য মনের ব্যাকুলতা আরো বহুগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু কী করার ছিল! আমি তো তাঁর কর্মস্থল থেকে প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিলাম। সাক্ষাতের বাহ্যিক কোনো উপায়-উপকরণও আমার সামনে ছিল না। এর কিছুদিন পূর্বে সবেমাত্র অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে প্রবেশ করার সুযোগ হয়েছিল; কিন্তু এই স্বপ্নপুরুষের নাম বহুবার সার্চ করেও তাঁর কোনো প্রতিচ্ছবি স্ক্রিনে ভেসে উঠল না! কেন পেলাম না? কারণটা পরে জেনেছিলাম।

ধাপ-৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষবর্ষে পড়ি সেসময়। আকাবিরদের জীবনী বিষয়ক বই খুঁজতে গিয়ে হিন্দুস্থানি সেই মনীষার জীবনী খুঁজে পাই। তাঁরই এক শাগরেদ কর্তৃক রচিত। স্বাভাবিকভাবেই নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বসে যাই পড়তে। কিন্তু ভূমিকা ছেড়ে মূলপাঠে যেতেই বিরাট এক ধাক্কা খাই! এ কী! পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মনীষাকে নিয়ে আমার স্বপ্নপুরুষের ভাষ্য উল্লেখ হয়েছে। মনীষার জীবনীর নানা দিক, নানামাত্রিক বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য কেউ নয়, আমার স্বপ্নপুরুষের ভাষ্যে সেখানে উঠে এসেছে। খুব বেশি এগোতে পারছিলাম না পাঠে। প্রতি দুই পৃষ্ঠা অন্তর অন্তর থেমে ট্যাবটি বুকে আগলে ধরছিলাম। আজও মনে পড়ে, হ্যাঁ ঠিকই! বুকে আগলেই রাখছিলাম। মনে তখন চিন্তার ঝড়! কী মহান এই ব্যক্তিত্ব! এ মাটি তাঁকে এত অনাড়ম্বরভাবে কীভাবে ধরে রেখেছে! তাঁকে নিয়ে কারও কোনো উচ্ছ্বাস নেই, নেই তাকে তুলে ধরার কোনো আন্তরিক প্রয়াস! কী নিষ্ঠুর! কী পাষাণ এই মাটি! বইটির প্রায় প্রতিটি পাতা উস্তাদ-শাগরেদের এক অপূর্ব রসায়ন তুলে ধরছিল। আমার স্বল্প-অধ্যয়নে দুর্বল স্মৃতিতে জমা

হওয়া ইতিহাসের ঝাঁপি থেকে উস্তাদ-শাগরেদের পাতাগুলো একে একে খুলে যাচ্ছিল ধারাবাহিক ভঙ্গিতে। মনে হচ্ছিল আলকামা তাঁর ভাষ্যে ইবনে মাসউদকে বর্ণনা করছেন; ইবনুল মুবারক বৈশিষ্ট্যায়ন করছেন ইমাম আযমের ব্যক্তিত্বকে; ইবনুল কাইয়িম তুলে ধরছেন ইবনে তাইমিয়াকে; শাহ আবদুল আযিয মহান পিতা শাহ ওয়ালিউল্লাহকে অনুপম ভঙ্গিকে উচ্চারণ করছেন; শাইখুল ইসলাম অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে শাইখুল হিন্দের মাল্টার গোপন কথাগুলো বয়ান করছেন; শাইখুল হাদিস বর্ণনা করছেন সাহারানপুরির গবেষণার নানামাত্রিক কর্মপদ্ধতি; শাইখুল ইসলাম তাঁর মহান পিতা মুফতিয়ে আজমের হিজরত বর্ণনা করছেন; অথবা রিয়াদের বাংলোতে মুহাক্কিকুল আসরের উজ্জ্বল সৌম্যকান্ত চেহারার সামনে দোজানু হয়ে বসে একমনে কিতাব তাহকিক করে চলেছেন মুফতি সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় 'মৌলবি মুখতাসার'! আমি আর এগোতে পারিনি। সেই দফা অপূর্ণাঙ্গই ছিল কিতাবটি। বহুদিন পর সেটি পুনরায় অধ্যয়নের সুযোগ হয়।

এই বইটি যখন পাঠ করছিলাম, তখন আমার স্বপ্নপুরুষ প্রৌঢ়ত্বের প্রায় শেষপর্যায়ে। কিছু মাধ্যমে তাঁর খোঁজখবর নিতাম। কিন্তু গিফার গোত্রের সেই মহান সাহাবির মতো সেসব খবর আমাকে কোনোরূপ সন্তুষ্ট করত না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিই, রবের দরবারে উপায়-উপকরণহীন অবস্থায় খালেস তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে একবার চেয়ে দেখব, কী হয়! যদি অন্তর বিশুদ্ধ থাকে, চাওয়া আন্তরিক হয়, সাক্ষাতের ইচ্ছায় শুধু লিল্লাহিয়াত থাকে; তাহলে অবশ্যই এই দোয়া আসমানে পৌঁছাবে।

ধাপ-৪

গ্র্যাজুয়েশনের শেষদিকে একসময় রাজধানী যাওয়ার সুযোগ ঘটে। তখন ২০১৯-এর পড়ন্ত বেলা। বাহ্যত চরিত্রে গুরুগম্ভীর এক প্রকাশক আমার হাত ধরে অপর একজন বুজুর্গ স্বভাবের রুচিশীল প্রকাশকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। গল্পে গল্পে জানতে পারি, তিনি আমার সেই স্বপ্নপুরুষের খুব নিকটতম স্নেহধন্য শাগরেদ। তথ্যটি শুনে চেপে রাখা ইচ্ছা আমার মনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেগে ওঠে। লাজশরম ভুলে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করে ফেলি, হজরতের মতো ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনী সংগ্রহ করে প্রকাশের ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনা কথা! জিজ্ঞাসার সাথে সাথে আমাকে অবাক করে দিয়ে আগ্রহ নিয়ে ইতিবাচক জবাব দেন প্রকাশক মহোদয়। কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে

হজরতের উচ্চমার্গীয় উরদুকে ধারণা করতে পারবেন, এমন কাউকেই প্রয়োজন ছিল। আমি প্রস্তাব করি, খুব ভালো লেখেন এমন কোনো প্রত্যয়দীপ্ত তরুণ লিখিয়েকে এই প্রকল্পে শামিল করা হোক। কিন্তু উপস্থিত প্রকাশকদ্বয় আচমকা আমাকে চেপে ধরেন- আপনিই যেহেতু এই প্রকল্পের ধারণা দিয়েছেন, কাজটা আপনিই করুন। এই দুঃসাহস দেখাবার স্পর্ধা আমার কোনোকালেই ছিল না। কেননা, স্বপ্নপুরুষের সান্নিধ্য নেবার ঐকান্তিক ইচ্ছা মনমাঝে সদাজাগ্রত থাকলেও আমার কলম এতটাও শক্তিশালী ছিল না যে, তাঁকে আমি আমার কলমে ধারণ করব! ওদিকে প্রকাশক মহোদয় বলছিলেন, এমন একটি প্রকল্পের ব্যাপারে খুব বিলম্ব না করাই ভালো। আপনি না এগিয়ে এলে হয়তো এই প্রকল্প এখানেই মুখ থুবড়ে পড়বে। আর হজরতের স্বাস্থ্যও সবিশেষ ভালো না। এসব শোনার পর আর নিজেকে পিছিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। স্বপ্নপূরণের এত কাছে এসে শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম। আবেগাপ্লুত মনে স্বর প্রকাশে অপারগ হয়ে মাথা হেলিয়ে ইতিবাচক জবাব দিই। পরিকল্পনার পর এবার ছিল প্রত্যয় পূরণের পালা। কিন্তু... কদ্দারাল্লাহু মা শা আ!

জীবনের ব্যস্ততায় এরপর আমি নিজেই হারিয়ে যাই। শিক্ষাজীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে খুবই চিন্তিত ছিলাম কর্মজীবনে কোন পথে পা বাড়াব, জটিল এই ভাবনায়। দেখতে দেখতে কয়েক মাস এভাবেই কেটে যায়। এরপর মালিকের ইশারায় কোনোভাবে প্রকল্পটি নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। আমার না অবশ্য, প্রকাশক ভাইয়ার তাগাদায়। সুযোগ হয় তথ্য সংগ্রহের জন্য হজরতের সান্নিধ্যে পৌঁছাবার।

দুই- সান্নিধ্যের পরশে

হজরতের সান্নিধ্যপরশে ধন্য হবার জন্য উম্মুল মাদারিসে পৌঁছাই। কয়েকদিন অপেক্ষার পর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যার জন্য আমি দীর্ঘ প্রায় এক দশক যাবত চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করে গেছি। আজ সেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষণটি আমাকে আনন্দিত করবে, তা না- উলটো আমি নার্ভাসনেসে ভুগতে শুরু করি। প্রকাশক ভাইয়ার হাত ধরে তবু ধীর পায়ে প্রবেশ করি জামিয়ার ফটকে। বেলা গড়াচ্ছিল তখন। সূর্য মধ্যগগন পেরিয়ে যাচ্ছিল প্রায়। আমরা জামিয়ার বিশাল মাঠে এসে দাঁড়াই। কিছুক্ষণ অসহ্য অপেক্ষার পর ভাইয়া বললেন, ওই যে হজরত আসছেন! তৈরি হোন। ভাইয়ার কথায় বিদ্যুৎ খেলে যায় আমার শরীরে। চকিত ঘুরে দাঁড়াই পশ্চিমমুখে। তাকিয়ে দেখি, দুজন সৌভাগ্যবান

ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে এক সৌম্যকান্ত বুজুর্গ দরবেশ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছেন! মাথায় সাদা পাগড়ি। মুখের নুরানি দাঁড়িগুলো অধিকাংশই সাদা হয়ে গেছে। পরনে একটা খাকি জুব্বা। তার উপর শীতের উপযোগী একটা সোয়েটার-কোট। ধীরপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামার পর হাতে ওয়াকার ধরনের একটা লাঠি চেয়ে নিলেন। এরপর অত্যন্ত ঋজুতার সাথে বেশ কিছু কদম হেঁটে এলেন। মাঠে বেঞ্চ পাতা ছিল। কিন্তু হজরত সেখানে আসার পূর্বেই দুজন ফিদা ছাত্রভাই দৌড়ে গিয়ে একটি চেয়ার নিয়ে এলেন। হজরত চুপচাপ সেখানে এসে বসে গেলেন। কিছুটা কষ্ট মনে হয় হয়েছিল। বসার পর কালিমার উচ্চারণে তাই হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমাদের দাঁড়ানো দেখে বসতে ইশারা দিলেন; আমরাও বসে পড়লাম। আমি অত্যন্ত কাচুমাচু ভঙ্গিতে প্রকাশক ভাইয়ার গায়ের সাথে এঁটে বসে ছিলাম, এখনো চিত্রটি চোখে ভাসে। এরপর সালাম-কালাম ও পরিচয়পর্ব। হাল্কা কিছু আলাপ হয়েছিল। আমি অবশ্য তেমন কথা না বলে তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আভা উপভোগ করছিলাম।

এর ঠিক কিছুদিন পর হজরতের সান্নিধ্যে তার ব্যক্তিগত কামরায় সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। পরিচয়পর্ব হয়; তবে এবার আগমনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে। এসময় হজরত তার পারিবারিক জীবনে চলমান কিছু পেরেশানির কথা আমাদের খুলে বলেন। বিষয়গুলো আমাদের নাড়িয়ে দেয়। সেদিন ফিরে এসে প্রচণ্ড হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল, কোনো বড় গুনাহের ফলেই আমার এই মাহরুমি। ক্ষণিকের সাক্ষাতেই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে অমূল্য নেয়ামত। হজরতের পেরেশান অবস্থায় তার আত্মজীবনীর প্রকল্প শুরু করা সম্ভব নয়, এটা সবাই বুঝতে পারছিল। দেখতে দেখতে প্রায় এক সপ্তাহ চলে যায়। আমি একরকম আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এসময় প্রকাশক ভাইয়া আমাকে বারবার সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। ধৈর্যের সবক শোনাচ্ছিলেন নিয়মিত। কিন্তু এই অশান্ত মন কোনোভাবেই প্রশান্ত হচ্ছিল না। সারাদিন কোনো কাজ না থাকায় দোয়া-ইসতিগফার চালিয়ে যাচ্ছিলাম। একদিন ভাইয়া খবর দিলেন, হে হতাশাগ্রস্ত ভাই, আপনার জন্য সুখবর! চাইলে কাল থেকে প্রকল্প আরম্ভ করা যাবে। আমি খুশিতে পাশের মসজিদে শোকরানা আদায় করি!

এরপর হজরতের অনুমতিক্রমে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয়। প্রতিদিন দুবেলা বসতাম আমরা। হজরত তার প্রিয় খাটে আধোশোয়া অবস্থায় থাকতেন। আমি হজরতের চরণতলে বসে পড়তাম। তিনি আমার জন্য একটা চেয়ারের ব্যবস্থা করে রাখতেন; কিন্তু

প্রথম দশদিন আমি নিচেই বসেছি। দেওবন্দি ইতিহাসের প্রথম চিত্র কিছুটা জাগ্রত করে তালিবে ইলমির এমন পরিবেশ গড়ে তোলার অনুপম ও অমূল্য সুযোগ কি আর কখনো হবে—একথা ভেবে পুলকিত হতাম। প্রতিদিন বেশ কয়েকঘণ্টা করে তার সান্নিধ্য গ্রহণের সুযোগ হতো। একদম একা! যদিও সেসময় হজরত অত্যন্ত দুর্বল, অসুস্থ এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। এরপরেও লক্ষ করতাম, হজরত তার তীক্ষ্ণধার স্মৃতি থেকে জীবনের খুঁটিনাটি দিক তুলে ধরতেন। পরে বলেছিলেন, আমার প্রশ্নগুলোর জবাবে মৌলিক তথ্য হিসেবে টুকরো স্মৃতিগুলোই তিনি আলোচনা করেছেন! এভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় তথ্য সংগ্রহ।

পরিপূর্ণ সুস্থ ও মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকলে স্মৃতির মণিকোঠা থেকে আরো ইলম ও ইতিহাস বেরিয়ে আসত, এটা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি। তবে যতটুকুই হোক, আলোচনাগুলো ছিল অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। মনে হতো যেন আমি সত্তরের দশকে আল্লামা বানুরির দরসে বসে আছি। আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানি যেন হজরতকে হাতে-কলমে মাকালা লেখা শেখাচ্ছেন, এমন দৃশ্য তার চোখের তারায় জেগে উঠতে দেখতাম। হজরত মূলত উরদুতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তথ্যসংগ্রহ তাই এই ভাষাতেই হতো। আহলে ইলম খুব ভালোভাবেই জানেন হজরতের উরদু কত বেশি চমৎকার ও প্রাঞ্জল! আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেও তাঁর খুব কমই মাতৃভাষায় প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছি। পাঠকমহলের কাছে সেজন্য আন্তরিকভাবে আমার অক্ষমতা প্রকাশ করছি। আবারও স্বীকার করছি, এই প্রকল্পে নবীন কোনো প্রাণোচ্ছল যোগ্যতর তরুণ অথবা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ কোনো প্রবীণ হাতের ছোঁয়া থাকলে কাজটি আরো বহুগুণে সৃজনশীল ও মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়ে উঠত!

এখানে একটি তথ্য দিয়ে রাখি। হজরতের একান্ত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজটি প্রথমে উরদুতে আনার কথা ছিল। কিন্তু নানাবিধ কারণে সেটি বিলম্বিত হয়। প্রথমে বাংলা সংস্করণ প্রস্তুত হলে সেটি পৌঁছে যায় মুফতিয়ে আজমের দরবারে। তার সুযোগ্য সাহেবজাদা মাওলানা ইসহাক সাহেবের সহায়তায় হজরত প্রচুর সময় নিয়ে পুরো পাণ্ডুলিপি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেছেন। মনোযোগের মাত্রা কতটা বেশি ছিল, তা সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির দিকে শুধু এক নজর তাকালেই বোঝা যাবে। মূলত যখন তিনি পাণ্ডুলিপি শ্রবণ করছিলেন, তখন মাশাআল্লাহ সুস্থ ও বহাল তবিয়তে ছিলেন। মস্তিষ্কে তেমন কোনো পেরেশানিও ছিল না। ফলে এই দফা তার প্রখর স্মৃতিশক্তির চমক

দেখার সুযোগ হয় আমাদের। পুরো পাণ্ডুলিপিজুড়ে এত সূক্ষ্ম সব সংশোধনী ও সংযোজন দিয়েছেন, যা সত্তরোর্ধ্ব একজন ব্যক্তির পক্ষে প্রায় অসম্ভবই বটে। আমাকে একবার ফোন করে বলেছিলেন—এটি তার সাথে আমার শেষ ফোনালাপ ছিল—ভাই, জারা আসান আলফাজ মে লিখনা! তা ক্য হার আদমি মেরি বাত সামাঝ স্যাক্যে! হজরতের খুব ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু তথ্য প্রদান করে-বিশেষভাবে তার রচিত গ্রন্থগুলোর পেছনের ইতিহাস ও তালিকায় থাকা বেশ কিছু অধরা প্রকল্পের আলোচনা করে আত্মজীবনীর কাজটি আরো সমৃদ্ধ করবেন। কিন্তু ...! নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু!

چراغ علم بجھا ہے یقین نہیں آتا

یہ سانحہ بھی ہوا اب یقین نہیں آتا

তিন- অমর স্মৃতি

এ তো গেল হজরতের নিকট পৌঁছানো ও তথ্যসংগ্রহের পেছনের গল্প। এবার একটু কাজ ও কাজের ধরন নিয়ে আলোচনা হোক।

আত্মজীবনী! সাহিত্যের এই জনরাটি খুবই চিত্তাকর্ষক, একইসাথে শিক্ষণীয়। আসমানিগ্রন্থের পর সম্ভবত সবচেয়ে শিক্ষণীয় সাহিত্য হলো আত্মজীবনী। এখানে উপস্থাপিত তথ্যে সত্যের পরিমাণ থাকে অনেকটাই বেশি। এটি সবসময় বেঁচে থাকা ব্যক্তিটি নিজেই লিখে থাকেন। সাধারণ বাস্তবতা এমনই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম হয়। যেমন অনুলিখনমূলক আত্মজীবনী। এখানে মূলত ব্যক্তি তাঁর জীবনকে নিজ ভাষায় বলে যান। উপস্থিত একজন অনুলেখক সেসব তথ্য সংকলনের গুরুভার বহন করেন। পরবর্তী সময়ে তথ্য যাচাই-বাছাই ও যথাযথ সম্পাদনা শেষে গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখে। এক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি কিছুটা বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। কেননা, এখানে প্রাইমারি ভাষা ছিল উরদু। তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল অডিওতে। ফলে প্রথমে উরদু ভাষায় একটা খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। এরপর সেখান থেকে পুনরায় মাতৃভাষায় রূপায়িত হয়েছে গ্রন্থটি। পাঠক, ভাষা পরিবর্তনের এই পিচ্ছিল অবস্থার কথা শুনে বিচলিত হবার কিছু নেই। বাংলা পাণ্ডুলিপি খোদ কথক (মুফতিয়ে আজম) আদ্যোপান্ত শুনে শেষ করেছেন। প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও সংযোজন-বিয়োজনের দুরূহ কাজটি তিনি নিজেই

আনজাম দিয়েছেন। এ যেন তার উপর একটি আমানত ছিল। তা নাহলে ইহলোক ত্যাগের মাত্র দু সপ্তাহ পূর্বে কীভাবে এই প্রকল্পটি তিনি শেষ করবেন! মহান রব তাকে সর্বোত্তম জান্নাতে অবস্থান দান করুন।

আত্মজীবনীতে বেশ কিছু অনুষঙ্গ স্থান পায়। এর মাঝে সবকটি সব ধরনের আত্মজীবনীতে উপস্থিত থাকে না। যেমন একটি অনুষঙ্গ হলো আত্ম-উন্মোচন। ব্যক্তি যেখানে নিজ উদ্যোগে নিজেকে জানানোর চেষ্টা করে। পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে বর্ণাঢ্য জীবনের নানা সফলতা ও অর্জন। তবে ইসলামি ও ইলমি ব্যক্তিদের আত্মজীবনীতে এই অনুষঙ্গটি উহ্যপ্রায়। প্রয়োজনীয় ও শিক্ষামূলক তথ্য ছাড়া তারা নিজেদের জীবনকে খুব বেশি খোলসমুক্ত করতে চান না। হজরতকে নিয়ে আলোচ্য কাজটিতেও এমন পরিস্থিতি দেখা গেছে। জীবন-পরবর্তী স্মারকে হয়তো এমন মানুষদের স্বচ্ছ-নির্মল-মাবরুক জীবন স্বমহিমায় ভাস্বরিত হয়ে থাকে।

অনেকে বলে থাকেন আত্মজীবনীর চেয়ে স্মারকগ্রন্থ অধিকতর মূল্যবান। কথাটির সাথে আমিও দ্বিমত করব না। তবে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। ব্যক্তির আত্মজৈবনিক তথ্যাদি তাঁর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত না থাকলে অনেক সময় স্মারকে অতিরঞ্জন (exaggerated information) অথবা ভুল তথ্যের (Misinformation) শিকার হয়ে থাকে পাঠকসমাজ। আত্মজীবনী না থাকা অধিকাংশ স্মারকে এমন অজস্র ঘটনা পাওয়া যায়, যা সঠিক তথ্যের বাহককে অত্যন্ত বিব্রত ও অস্বস্তিতে ফেলে থাকে। এজন্য কিংবদন্তি বা সচেতন লেখক-গবেষকরা সুস্থ ও স্বাস্থ্য থাকতেই শেষজীবনে আত্মজীবনী লিখে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। এতে করে তথ্যের বিশুদ্ধতা অটুট থাকা ও পরবর্তী সময়ে স্মারকগ্রন্থ সমৃদ্ধ হওয়ার কাজটি সহজ হয়।

মনীষীদের জীবনী সাহিত্যের যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জনরা, ঠিক একইভাবে শিক্ষালাভ ও আত্মিক উৎকর্ষলাভেরও অন্যতম মাধ্যম। আল্লামা ইবনুল জাওযি তার বিখ্যাত গ্রন্থ সাইদুল খাতিরে লিখেছেন—"আমি গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, শুধুমাত্র ফিকহ ও হাদিস শ্রবণে শ্রম ব্যয় করার মাধ্যমে ব্যক্তির মাঝে পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও উৎকর্ষ জন্ম নেয় না। এর সাথে সম্পূরক হিসেবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দিকগুলোর অন্যতম হলো- পূর্ববর্তী নেক, খোদাভীরু ও আল্লাহওয়ালা সালাফের জীবনী অধ্যয়ন করা। হারাম-হালাল নিয়ে দিনরাত পর্যালোচনার পাশাপাশি এমন সালাফদের জীবনী পাঠ অতীব জরুরি, যারা তাদের ব্যক্তিজীবনে ইসলামকে ঠিক সেভাবে চর্চা করে

গেছেন, যেভাবে এটি নবীজির উপর নাজিল করা হয়েছে। তাদের জীবনীপাঠের পর অন্তরে যে পরিমাণ আমলের ঝোঁক ও আল্লাহকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তা শুধু অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। মনে রাখবেন, আমি বহু মনীষীর নিকট থেকে এই শিক্ষাটি শ্রবণের পাশাপাশি নিজেও বহুবার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছি। সাধারণত মুহাদ্দিসরা উঁচুমানের হাদিস সংগ্রহে নিজেদের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে থাকেন। ফকিহরা তাদের দিনরাত একাকার করেন দলিলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মত দুর্বল দেখানোর জন্য। কিন্তু এতসবের মাঝেও তারা একটি সময় পৃথক করে নিতেন। এই প্রহরে তারা ওলি-আল্লাহ বুজুর্গদের দরবারে গমন করতেন—কোনো পেশাগত উদ্দেশ্যে নয়; শুধু তাদের জীবনপ্রণালি পর্যবেক্ষণ করতে। এটা সেই জীবনধারা, কিতাব ও সুন্নাত থেকে যার শুদ্ধ রূপ প্রণয়নে তাদের (মুহাদ্দিস ও ফকিহ) জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। অথচ এই সালাফরাই প্রহরের পর প্রহর এই আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন। অবশ্যই এর ইতিবাচক প্রভাব তারা তাদের জীবনে উপলব্ধি করতেন। আমাদেরও উচিত, তত্ত্বমূলক জ্ঞানগবেষণার পাশাপাশি বেশি বেশি সিরাত ও সালাফদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা। এটাই সেই কাজ—দীনের উপর চলার পথ মসৃণ করতে যা আমাদের সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে থাকে।" (সাইদুল খাতির)

মুফতীয়ে আজম বাংলাদেশ। একটি নাম। একটি স্বর্ণালি প্রজন্মের ইতিহাস। উপমহাদেশের সমকালীন ইসলামি ও ইলমি মহলের প্রায় অনেকের মুরুব্বি তিনি। ভারতবর্ষ ভাগের পর সৃষ্ট ইসলামি প্রজাতন্ত্রে কীভাবে নতুনভাবে ইসলামি জ্ঞানের শাখাগুলো তৎকালীন বিশেষজ্ঞরা ঢেলে সাজিয়েছিলেন, সেই ইতিহাসের জ্বলন্ত সাক্ষী তিনি। খুব কাছে থেকে তাদের সুদীর্ঘ সান্নিধ্য গ্রহণ করে অনন্য সব স্মৃতি বহন করেছেন এই বুজুর্গ মানুষটি। জীবনসায়াহ্নে এসে অশীতিপর এই জ্ঞানতাপস সেসব স্মৃতি রোমন্থন করে গেছেন, অনায়াসে অবলীলায়।

যাদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন, স্মৃতির পাতায় তাদের আলোচনা উঠে আসার সময় মানুষটি কতটা আবেগি হয়ে পড়তেন, তা যদি পাঠককে দেখানো যেত! বিশেষ করে মুফতীয়ে আজম হজরত ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেব, মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা ইউসুফ বানুরি সাহেবের নাম উঠলেই সাথে সাথে অশ্রুসজল হয়ে ওঠা আঁখিযুগলের স্মৃতি আমার মস্তিষ্কের কোঠায় জীবনভর অমর হয়ে থাকবে। উসতাদের প্রতি চূড়ান্ত আবেগ ও মহব্বতের এক অত্যুজ্জ্বল নমুনা দেখেছি আমি তাঁর মাঝে।

ছোটবেলা থেকেই মানুষটি অনুপম বিনয় ও চূড়ান্ত আনুগত্য নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। স্কুলগমনে অনাগ্রহ থাকায় বেশ কয়েক বছর পিতার পক্ষ থেকে জমিতে নির্বাসন পেয়েছিলেন, তবু স্কুলে ফিরে তাকাননি। এমন গোয়ার্তুমি করে জীবনে টিকে যাওয়াটা সহজ ছিল না। অনেকেই এখানে হার মানে, তিনি মানেননি। যাপিত জীবনের ব্যস্ততাও তাকে কলুষিত করেনি কখনো। করেছেন সহজ-সরল নির্লোভ জীবনযাপন। দুনিয়ার প্রতি প্রাকৃতিকভাবে অনাসক্ত ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল নমুনা তিনি। ইলমের গাম্ভীর্যও ছিল, আবার সাধারণের সাথে মিশে যাওয়ার অসাধারণ সরলতাও ছিল তাঁর নির্মল চরিত্রে। উলাইকা আবাঈ, ফাজি'নী বিমিসলিহিম!

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মৌলিক পাঠকশ্রেণি (Target Audience) যেহেতু আহলে ইলম, তাই কাজের সময় অতিরিক্ত টীকা ব্যবহারের দুঃসাহস দেখাতে যাইনি। ধারাবাহিক পাঠ যেন সাবলীলতা পায়, এই প্রচেষ্টা ছিল সর্বোচ্চ, সর্বত্রই। হজরত উরদুতে খুবই সাবলীল হবার পাশাপাশি অত্যন্ত প্রাঞ্জলতাও ধরে রাখতেন সমানতালে। বাঙলায়নের সময় এই মুন্সিয়ানা দেখানো আমার পক্ষে ঠিক সেভাবে সম্ভব হয়নি, যেভাবে তিনি উরদুর ক্ষেত্রে প্রদর্শন করেছেন। আসলে এমন কাজের জন্য খুবই দক্ষ ও প্রবীণ হাতের প্রয়োজন ছিল হয়তো। জানি না অযোগ্যরা কীভাবে সুযোগ পেয়ে গেছে!

হজরতের সুবিশাল ব্যক্তিত্বের ধারণা নানাভাবে তুলে ধরা সম্ভব। সাধারণ পাঠকদের জন্য আমি দুয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে দিতে চাই।

* একবার আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ. বানুরিটাউনের একটি ফতোয়ায় দারুল উলুম করাচি ও দারুল উলুম দেওবন্দের বিপরীত মত দেখতে পান। সেসময় তিনি লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। দেশে ফিরে যাচাইয়ের জন্য মুফতি সাহেবকে ডেকে আনান। তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর দেখেন বানুরিটাউনের ফতোয়া অধিকতর বিশুদ্ধ। তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন- মুফতি সাহেব (ওয়ালি হাসান সাহেব) আর তোমার উপর আমার ভরসা আছে। তোমরা সহজেই ভুল করো না।[১]
* সমকালীন যুগে ইতিহাসগবেষণায় অতি পরিচিত নাম মাওলানা ইসমাইল রেহান। এই মাওলানা সাহেব হজরত মুফতিয়ে আজমকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অভিমত

---

[১]. সাওয়ানেহে মুফতি ওয়ালি হাসান। পৃষ্ঠা-৪৬।

দিয়েছেন। সেখানে তার একটি বাক্য ছিল এরূপ-'এমন আকাবিরদের নিয়ে লেখার জন্যও বিরাট হিম্মতের প্রয়োজন।'

* আমাদের মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের ভাষ্যমতে-প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমি হজরতের শাগরেদ হতে না পারলেও তাঁর থেকে এবং তাঁর কুতুবখানা থেকে অনেক অনেক উপকৃত হয়েছি। আর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ যে, হজরত আমাকে শাগরেদদের মতোই মহব্বত করতেন। একসময় হজরত আমাকে স্নেহ করে 'মৌলবি মুখতাসার' বলে স্মরণ করতেন।[২]

* একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক হজরতের জানাজার চিত্র দেখার পর বলেছিলেন-একটা জানাজা দিয়ে শিক্ষকতার সারাজীবনের অর্জন খাটো করছি না, কিন্তু নিজ ব্রেইন চাইল্ডের কাঁধে চড়ে বা তাদের ধ্বনিতে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার লোভ সামলানোও অপ্রত্যাশিত না! প্রচলিত পড়াশোনায় কোথাও একটা মিসিং লিংক আছে। জেনারেল ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে আত্মার বন্ধনটা কোথায় জানি একটু স্যালো'!

ফখরুল ইসলাম হিমেল

সহকারী অধ্যাপক, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

তথ্যসংগ্রহের পর অনুলিখন ও অনুবাদের সময় আমি আরেকবার জীবনঘনিষ্ঠ কিছু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ি। মূলত কর্মজীবন নিয়ে দ্বিধান্বিত থাকায় আমি মানসিকভাবে খুব চিন্তিত থাকতাম। ফলে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছু সময় বেশি লেগে যায়। প্রকাশক মহোদয় অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সেসময় আমাকে সহ্য করে গেছেন। তাঁর সহনশীলতাকে আমি সালাম জানাই। কাজ চলাকালে সার্বিক দিক থেকে তিনি অধমকে সহযোগিতা করে গেছেন। হজরতের শিষ্যত্বের সৌরভ আমি তাঁর মাঝে শুরু থেকেই দেখে এসেছি। আল্লাহ তায়ালা আহলে ইলমকে আহলে আখলাক হিসেবে উম্মতের সামনে মুকাওয়াম রাখুন।

কাজটিকে আত্মজীবনীর ধাঁচে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে—হজরতের সমৃদ্ধ জীবনের সব কিছু যদিও এত স্বল্প পরিসরে তুলে আনা সম্ভব হয়নি। তবে সাধ্যমতো গুছানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রথম সংস্করণে একে খুব বেশি না গুছিয়ে হজরত যেই ধারায়

[২]. মাসিক আলকাউসার। অক্টোবর, ২০২১ সংখ্যা।

বলে গেছেন, ঠিক সেভাবেই রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পাঠকদের পক্ষ থেকে পরামর্শ এলে এর বিন্যাসে পরিবর্তন আনার কথা বিবেচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসংগ্রহের প্রাক্কালে প্রকল্পের একেবারে শেষসময়ে এসে অনন্য সাধারণ কিছু নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছি। স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি এসব নেয়ামত নসিবে হবে। এমন একজন শায়েখের একান্ত সান্নিধ্যে দীর্ঘ প্রায় এক মাস অবস্থান, স্বপ্নবাজদের স্বপ্নকেও হার মানাবে। স্বপ্নপুরুষের নিকট থেকে তাঁর সকল বিষয়ের 'আনোখা' ইযাজতগুলো লাভ করা! সুবহানাল্লাহ! বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কালামে পাকের বেশ কয়েকটি কেরাতের ক্লান্তিকর চর্চার উপরেও যে হজরতের ইজাজত মোহরাঙ্কিত হবে, কবেই-বা ভেবেছিলাম! ফালিল্লাহিল হামদু ওয়াল ফাদলু ওয়াল মিন্নাহ!! হজরত হাফেজ্জী যেভাবে শাইখুল হিন্দের সাথে মুসাফাহা করার কারণে গর্ব করতেন, আমিও একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে গর্ব করতে পারি-সেই মানুষটির একান্ত সান্নিধ্য আর তার কপোলে চুমু এঁকে দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যার শাগরেদরা সম্প্রতি নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। হজরতের সাথে একান্তে বহু আলাপ হয়েছে, যা আমি একান্ত স্মৃতি হিসেবেই রেখে দিতে চাই। এজন্য নিয়ত করেছি বক্ষ্যমাণ কাজটিতে নিজের অযোগ্য পরিচয় প্রকাশ করব না। হজরতের একজন আশিক হিসেবেই থেকে যেতে চাই।

সবশেষে আহলে ইলম আলিমগণসহ পাঠকমহলের নিকট সনির্বন্ধ নিবেদন, দৃষ্টিতে পড়া মাত্র গ্রন্থস্থিত ভুলত্রুটি অবহিত করবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই প্রকল্পে নিজের নাম উল্লেখ করার দুঃসাহস দেখাতে চাই না। প্রকাশক মহোদয়ের অনুরোধে কুনিয়াহ নিয়েই উপস্থিত থাকছি। আসলে কাজ তো অনেক হচ্ছে; কিন্তু মাকবুল কাজ কতগুলো হচ্ছে, এটা এখন বড় প্রশ্ন। উম্মাহর ঈমান-আমলের হেফাজত ও হকের উপর আহলে ইলমের ইসতিকামাতের দোয়াও চাই সকলের কাছে। মহান রাব্বে কারিম সংশ্লিষ্ট সকলকে দীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

আশেকে মুফতিয়ে আজম
যুবাঈর আহমাদ
ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী
zamnoor622@gmail.com

মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী রহ. এর ব্যাপারে ইতিহাসবিদ
মাওলানা ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহুর

মূল্যবান অভিমত

'এমন আকাবিরকে নিয়ে লিখতেও প্রবল সাহস ও অতুলনীয় হিম্মত প্রয়োজন'

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। বাদ আরজ,

হজরত আল্লামা মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ সময়ে ইলমে দীনের এক বিরাট সমুদ্র ছিলেন। তার ব্যক্তিত্ব ও মহত্বের বিশালতা আকাশছোঁয়া সেই পাহাড়ের সমান, যার চূড়ার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত সাহস, হিম্মত ও যোগ্যতা অর্জন করা আমার মত নগন্য তালেবে ইলমের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। হজরতের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করা তো দূরের কথা, এ ব্যাপারে শুধু ধারণা অর্জন করার জন্যও প্রয়োজন বিরাট যোগ্যতা ও অনুপম দক্ষতা।

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হজরত মুফতি সাহেবকে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট পরিমণ্ডলে যেভাবে গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পারদর্শিতা প্রদান করেছিলেন, সমকালীন যুগের খুব কম মনীষার ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে। বিষয়ের একদম গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালিয়ে উপসংহার বের করে আনার মত অসাধারণ যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেছিলেন। সেই সাথে হজরতের ব্যক্তিত্বের মাঝে সমন্বয় ঘটেছিল অসামান্য বিনয়, লৌকিকতামুক্ত নম্রতা, অকপটে সত্য গ্রহণ করার উন্নত মানসিকতা এবং সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সত্য প্রকাশ করার মত উন্নত মানবীয় গুণাবলি। শেষোক্ত দুটি গুণ তো একজন বিশ্বমানের গবেষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বরং আমি বলব, এই বৈশিষ্ট্যগুলো গবেষণার ক্ষেত্রে রূহ বা আত্মার সমপর্যায়ে রয়েছে। বহুবছর ধরে গবেষণা ও অনুসন্ধান

চালানোর পর এই বৈশিষ্ট্যগুলো গবেষকের মাঝে ফুটে ওঠে। কিন্তু হজরতের ব্যক্তিত্বের মাঝে আল্লাহ তায়ালা এই গুণগুলো প্রাকৃতিকভাবে সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

আমরা ছোটবেলায় যখন কিতাব বিভাগে পড়াশোনা করতাম, তখন আমাদের উসতাদবৃন্দ আমাদের মত অলস ও কমজোর প্রকৃতির তালিবে ইলমদের সামনে সমকালীন আকাবিরদের আলোচনা টেনে আনতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আকাবিরদের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে হয়তো এদের মাঝে অধ্যয়নের শখ ও আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। আমি আমার অধিকাংশ উসতাদের নিকট হজরত মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী সাহেবের ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি। আমার প্রাণপ্রিয় উসতাদে মুহতারাম হজরত মাওলানা ইয়াহইয়া মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব বেশি পরিমাণে হজরত মুফতি সাহেবের আলোচনা আমাদের সামনে তুলে ধরতেন। তিনি হজরতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে একথা বলতেন যে, 'হজরত মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন করতে অভ্যস্ত ছিলেন।' আমরা হজরতের মুখে এ ঘটনা শুনেছি যে, হজরত মুফতি সাহেব জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া নিউটাউনের লাইব্রেরিতে মাগরিবের পর প্রবেশ করে গভীর রাতে বের হয়ে আসতেন।[৩] দীর্ঘকাল তার এই অভ্যাস ও রুটিন চলমান ছিল। সম্ভবত হজরত আমাদেরকে ১০ বছর অথবা ২০ বছরের কথা বলেছিলেন। এই মুহূর্তে আমার পরিপূর্ণ স্মরণে আসছে না, তবে সুদীর্ঘকাল হজরত মুফতি সাহেব এই রুটিনে চলেছেন, একথা আমাদের উসতাদ আমাদেরকে বারবার শোনাতেন। এরপর হজরত আমাদেরকে বলতেন, 'তোমরা আজকে যেই মুফতি আবদুস সালাম চাটগামীকে দেখছো, তার পেছনে হজরতের সুদীর্ঘকালের মেহনত ও মুজাহাদা লুকিয়ে রয়েছে।' এই আলোচনাগুলোর মাধ্যমে হজরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব আমাদেরকে কোনো বিষয়ের উপর গভীর অধ্যয়ন করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি হজরত মুফতি সাহেবের গভীর, বহুমুখী ও দীর্ঘকালীন অধ্যয়নের ঘটনা শোনার মাধ্যমে প্রচণ্ডরকম উৎসাহিত হয়েছিলাম।

আমার অন্যান্য উসতাদও হজরতের শাগরেদ ছিলেন। তারাও সময়ে সময়ে আমাদেরকে হজরতের নানামুখী বৈশিষ্ট্য, অতুলনীয় বিনয় ও নম্রতা, একাগ্রচিত্তে

---

[৩]. হজরতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বহুদিন এমন হতো যে, তিনি মাগরিবের পর লাইব্রেরিতে গেছেন, বের হয়েছেন ঠিক ফজরের পর।
বি.দ্র. মাগরিব থেকে ফজরের মাঝে ফরজ নামাজের সময় অবশ্যই জামাতে শরিক হয়েছেন। এটা খুব স্বাভাবিক বিষয়। তবু যেন ভুল ধারণা না জন্মে, তাই স্মরণ করানো হলো।

দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করার গল্পগুলো শোনাতেন। কখনো কখনো দরস চলাকালে আমার উসতাদবৃন্দ সমকালীন জটিল কঠিন ফিকহি মাসআলাগুলো আলোচনা করতেন; তখন বলে উঠতেন, আমাদের শাইখ হজরত মুফতি আবদুস সালাম সাহেব চাটগামী এই মাসআলাকে এই এই দলিলগুলোর মাধ্যমে অত্যন্ত ইনসাফের সাথে সমাধান করেছেন। আমার (ইসমাইল রেহান) দুর্ভাগ্য, আমি কখনো তাঁর সরাসরি শিষ্যত্ব অর্জনের সুযোগ লাভ করতে পারিনি।

যখন চিংড়ি মাছ হালাল নাকি হারাম- এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়েছিল, অনেক ওলামায়ে কেরাম একে হারাম ফতোয়া দিয়েছিলেন; তখন হজরত মুফতি সাহেব রহিমাহুল্লাহ তার অসাধারণ যোগ্যতা ব্যবহার করে বিষয়ের গভীর, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণসাপেক্ষে এই মাসআলায় নিজের অবস্থান প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর নিকট চিংড়ি মাছ খাওয়া হালাল ছিল। পরে এই লেখাগুলো ব্যাপক সমাদৃত হয়। প্রকাশিত হয় প্রায় প্রতিটি জার্নাল, পত্রিকা ও মাসিকে। আমরাও তখন এটি অধ্যয়ন করেছিলাম। হজরত মুফতি সাহেবের অনুপম যোগ্যতা, অসাধারণ বিশ্লেষণশক্তি ও গবেষণাধর্মী পর্যালোচনার ব্যাপারে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করতে পেরেছিলাম সেসময়। পরবর্তী সময়ে হজরতের এই বিষয়ক প্রবন্ধগুলো একত্রিত হয়ে একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে বেশ কয়েকটি বিষয় আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রথমত, তথ্যসূত্রের প্রাচুর্য আমি মুফতি সাহেবের লেখায় দেখতে পেয়েছিলাম। একটি তথ্যের কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করে অন্য গবেষকদের জন্য পর্যালোচনার পথ মসৃণ করার মৌলিক গবেষণাপদ্ধতি আমি সে-সময় পরোক্ষভাবে তার নিকট থেকেই শিক্ষালাভ করি। দ্বিতীয়ত, তার লেখার ধরন ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। নিজের অবস্থান শক্তিশালী ভঙ্গিতে তুলে ধরার পাশাপাশি ভিন্নমতের গবেষকদের যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার মত পর্বতপ্রমাণ উদারতা তাঁর লেখার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

সমকালীনদের সাথে হজরতের যখনই মতানৈক্য ও ইখতিলাফ হতো, তখন হজরত তার খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা ব্যবহার করে আপন মত অত্যন্ত শক্তিশালী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতেন। একইসাথে ভিন্নমত পোষণকারী গবেষকদের প্রতি প্রদর্শন করতেন যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা। এত ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান আমি খুব কম মুফতি সাহেব ও বিদগ্ধ গবেষকের মাঝে দেখতে পেয়েছি। হজরতের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও ধরন আমাকে আমার গবেষণায় ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে।

আমার মনে হয় এই বৈশিষ্ট্যগুলো একজন গবেষক তখনই অর্জন করতে পারেন, যখন গভীর জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল সময় অতিবাহিত করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ! হজরতের ভাগ্যে এ দুটি বিষয় অর্জনের পরিপূর্ণ সুযোগ ঘটেছিল। আর তিনিও খোদাপ্রদত্ত মেধা, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা ব্যবহার করে এদুটি নেয়ামত থেকে প্রথমত নিজেকে এবং সমগ্র উম্মতকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহি আলা তামামিল মিন্নাহ!

সম্প্রতি জানতে পারলাম, হজরত মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী রহমাতুল্লাহি আলাইহির আত্মজীবনী প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রথমে এটি তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় এবং পরবর্তীতে উরদু ভাষাতেও ইদারাতুল মানহাল পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হবে। মাওলানা যুবাঈর আহমাদ সাহেব জানালেন, হজরতের জীবদ্দশাতেই আত্মজীবনীর কাজটি সম্পাদনা করে শেষ করেছিলেন। মাওলানা আমাকে হজরতের ব্যাপারে কিছু লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে আমি দুঃসাহস করে এই সুযোগটি গ্রহণ করি। হজরতের মতো ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনীতে দুটি কথা দিয়ে হলেও শরিক থাকার মতো সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাইনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে এমন আকাবির আসলাফের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পথচলার তাওফিক দান করেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের সাহস, হিম্মত ও যোগ্যতা আমাদেরকে নসিব করেন। আমিন বিজাহি সাইয়িদিল মুরসালিন।

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান[৪]

হাসান আবদাল, আটক, পাকিস্তান।

[৪]. মাওলানা ইসমাইল রেহান : 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক।

সূচিপত্র

শাহাদাতপানে আলিমগণ

বটবৃক্ষের ছায়ায়

অনুলেখক : আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। হজরত, আমরা শুরুতেই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আপনি আমাদেরকে আপনার সকল ব্যস্ততা ও পেরেশানির মাঝেও সময় দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাঁর ইচ্ছা ও শান অনুযায়ী বিনিময় দান করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে সুস্থতা দান করুন। সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করুন। দীনে ইসলাম ও ইলমে নববির খেদমতে আমৃত্যু বহাল রাখুন। আমিন।

আমরা একটি উদ্দেশ্যে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। বড়দের নিকটে শুনেছি, আলবারাকাতু মাআ আকাবিরিকুম।[৫] বরকত আকাবিরদের কাছে রয়ে গেছে। এই বরকত নিজেরা গ্রহণ করা ও জাতির কাছে আপনার মতো জীবন্ত কিংবদন্তির (আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সকল বদনজর থেকে হেফাজত করুন, নাহসাবুকা সালিহান ওয়া লা নুঝাক্কী আলাল্লাহি আহাদান) জীবনগাথা তুলে ধরার লক্ষ্যে আপনারই জবানিতে আপনার জীবনকথা সংগ্রহ করতে চাই। আপনার ব্যস্ততম সময় থেকে প্রতিদিন সামান্য কিছু পেলে আমরা হয়তো এই প্রকল্পটি একটি গন্তব্যে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হতাম। এই অঞ্চলে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায় অবদান রেখে যাওয়া মনীষীদের জীবনী তাদেরই জবানিতে তুলে ধরার একটি বৃহৎ প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি। ইনশাআল্লাহ, এই প্রকল্পটি অব্যাহত থাকলে দেশ ও জাতি অশেষ উপকৃত হবে বলে আশা রাখি।

হযরত: আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়িদিল মুরসালীন। ওয়া আলা আলিহী ওয়া-সাহবিহী আজমাইন।

আপনাদের উদ্দেশ্য ও মাকসাদ মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। কিন্তু আমি তো বর্তমানে জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে গেছি। স্মরণশক্তিও আগের মতো সঙ্গ দেয় না। তা ছাড়া আমার জীবনকথা জাতিকে ও বিশেষত প্রিয় তালিবানে ইলমদের কতটুকু

---

[৫]. মুসতাদরাকে হাকেম, তাবারানি, বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ। البركة مع اكابركم।

উপকৃত করবে, সেটিও বড় প্রশ্ন বটে! তবু আপনাদের অনুরোধে আমি দৈনিক কিছু সময় দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার স্বাস্থ্যও এখন আগের মতো নেই। ইচ্ছামতো চলাফেরা করতে পারি না। এতকিছুর পরেও আলহামদুলিল্লাহ, আমার মালিক আমাকে ভালো রেখেছেন, দীনের মেহনতে সামান্য পরিসরে হলেও যুক্ত রেখেছেন, তালিবানে ইলমের খেদমত করে যেতে পারছি, এতেই আমি খুশি, আলহামদুলিল্লাহ। আমার মালিক যেন আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই অল্পবিস্তর খেদমত করে যাবার সুযোগ দেন, এই দোয়া করবেন।

ক্ষণিকের মেহমানখানায়

(আমার পৃথিবীতে আসা, কিছু টুকরো শৈশবস্মৃতি আর বাল্যকাল নিয়ে সামান্য আলোচনা)

দেখুন, আমরা এমন একটি যুগে শৈশব কাটিয়েছি, যখন স্কুলে ভর্তি বা পড়াশোনায় হাতেখড়ির সময় নিজের জন্মসাল ও দিন-তারিখ জানাটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমিও যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, আমার সাথেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ফলে একদম নিশ্চিত হয়ে জন্মসাল ও তারিখ বলা আমার পক্ষে সম্ভব না। কিছুটা অনুমাননির্ভর হয়ে এবং তার চেয়ে বেশি সামসময়িক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে নিদেনপক্ষে জন্মসালটুকু ধারণা করা সম্ভব। আমাদের পরিবারের মুরুব্বিরা আমাদেরকে এভাবে জানাতেন যে, অমুক বছরে তোমার জন্ম। আমরা সেভাবেই ব্যাপারটি মেনে নিতাম। তাদের নিজেদেরও এই বিষয়গুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংরক্ষণ করে রাখার খুব একটা প্রচলন ছিল না। আমরা একই বয়সি তিনজন ছিলাম। একজন আমার দূরসম্পর্কের চাচাতো (জেঠাতো) ভাই। তাঁর নাম ছিল (মাওলানা মুহাম্মাদ) ইয়াকুব। আরেকজন ছিল আমার আপন চাচাতো ভাই। সে আমার চেয়ে সতের দিনের ছোট ছিল। মাত্র দু সপ্তাহের ছোট হবার পরেও সে আমাকে 'বড় ভাই' বলে সম্বোধন করত। তার নাম ছিল নুরুল আলম। আমার এই ভাইটির ছোট বয়সে ইনতেকাল হয়ে যায়। আর (মাওলানা) ইয়াকুব আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিল। তাঁর বাবার নাম ছিল মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল। উনি দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল[৬] ছিলেন। আমরা দুজন একসাথেই খেলাধুলা করতাম। বাচ্চাদের জন্য নির্ধারিত মসজিদের মক্তবেও আমরা একসাথে যাওয়া-আসা করতাম। আমার আব্বা আমাদেরকে দুটো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। একইসাথে। প্রথমে আমরা মক্তব-ধরনের একটি মাদরাসায় যেতাম। সেখানে

[৬]. গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষা সমাপনকারী।

কায়দায়ে বোগদাদী[৭] ও আম্মাপারা[৮] পড়ানো হতো। এখানে আমরা যেতাম সকাল সকাল। মাদরাসা থেকে এসে নাশতা করে দশটার সময় আবার ছুটতে হতো স্কুলমুখে। বাড়ির কাছেই একটি স্কুল ছিল। আমার মনে পড়ে, আমি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন মুসলিম বাংলা শিক্ষা নামে একটি ঘণ্টা হতো। স্কুলে থাকতেই আমার নামের বাংলা বানান প্রথমবার লেখা হয়। সেসময় স-এর ব্যবহার ছ-এর মাধ্যমে হতো। ফলে আমার নামের বানান যেমনটা আপনারা দেখে থাকবেন, আবদুস সালামের পরিবর্তে আবদুচ্ছালাম লেখা হয়। প্রচলনের সাথে এই বৈপরীত্য এলে তখন থেকেই চলে আসছে। আমার যেহেতু পাসপোর্ট অনেক পুরোনো, তাই বানান সংশোধন আর করা হয়ে ওঠেনি। তেমন প্রয়োজনও বোধ করিনি।

আমার জন্মসালের ব্যাপারে আমার আব্বাজান আমাকে বলেছিলেন, তোমার জন্ম ৪৩ (১৯৪৩) অথবা ৪৪ (১৯৪৪) সালে। অবশ্য আমার যে চাচাতো ভাই ছিল সে আমাকে বলত, তোমার জন্ম ৪৫ (১৯৪৫) সালে। আর আমার (চাচাতো ভাইয়ের) জন্ম ৪৪ (১৯৪৪) সালে। আমার আম্মা বলেছিলেন তোমার জন্মের পরবর্তী বছর বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সে হিসেবে ১৯৪৩ সালই আমার সঠিক জন্মসাল হবে বলে মনে করছি। কিন্তু মাস ও তারিখের ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি কিছুই।

পড়াশোনায় হাতেখড়ি

সে যুগে বাচ্চাদের আলিফ বা তা-এর সবক দেওয়ার সময় সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হতো। এরপর শুরু হতো মাদরাসা বা স্কুলগমন। স্কুলে আমি শুধু প্রথম শ্রেণি পর্যন্তই পড়ি। এরপর স্কুল ছেড়ে দিই। এসময় মাদরাসায় আমি এক বছরে কায়দা ও আম্মাপারা এবং পরবর্তী বছরে কুরআন মাজিদ একবার খতম করি।

স্কুলজীবনের কিছু টুকরো স্মৃতি

সেই যুগের স্কুলজীবন কেমন ছিল তার একটা চিত্র আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আশা করছি, এখান থেকে আপনারা একটা ধারণা পেয়ে যাবেন।

আমরা সকাল সকাল স্কুলে চলে যেতাম। সাথিবন্ধু থাকত কজন আশেপাশে। হিন্দু ছেলেরাও পড়ত একই স্কুলে। তবে ওদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আমাদের

---

[৭]. আরবি ভাষার পাঠদান গ্রহণের লক্ষ্যে প্রথম যেই ঐতিহ্যবাহী পুস্তিকা পড়ানো হয়। আমরা প্রচলিত অর্থে যাকে নুরানি কায়দা বলে থাকি।

[৮]. কুরআন মাজিদের ত্রিশতম পারা। ধারাবাহিক তেলাওয়াতে অভ্যস্ত করার জন্য এই পারা প্রশিক্ষণ হিসেবে পড়ানো হয়।

স্কুলের হেডমাস্টার (প্রধানশিক্ষক) সাহেব অত্যন্ত ইসলামপ্রিয় মানুষ ছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আলাদা একটা আবেগ কাজ করত। তখন সবেমাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে। মাস্টার সাহেবের নাম ছিল জিয়াউল মুলক। শুনেছিলাম দেশ স্বাধীনের আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। তো একদিন কী হলো- উনি হন্তদন্ত হয়ে আমাদের ক্লাসে প্রবেশ করলেন। হাতে ছিল দৈনিক পত্রিকা। সম্ভবত ইত্তেফাক ছিল ওটা। তখনকার সময়ে পাকিস্তানে ইত্তেফাক আর আজাদী- এই দুটো জাতীয় দৈনিক পত্রিকা চলত সবচেয়ে বেশি। তো হেডমাস্টার সাহেব ক্লাসে প্রবেশ করেই সবার উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'এই যে বাবারা! তোমাদের একটি শোকসংবাদ শোনাই।' উনি তো বাংলায় বলেছিলেন, আমি এখন সেটি উরদুতে বলছি। উনার হৃদয়ে যেই আবেগ আর উত্তাপ আমি লক্ষ করেছিলাম, তা ফুটিয়ে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 'আজ পাকিস্তানের বাবা শহিদ হয়ে গেছে। ইসলামের অভিভাবক উজিরে আজম লিয়াকত আলি খান দুনিয়া থেকে চলে গেছেন! ইসলাম আজ এতিম হয়ে গেল! বাবারা! তোমরা তাঁর জন্য দোয়া করবে।' মাস্টার সাহেবের হাতে ছিল পত্রিকার খোলা পৃষ্ঠা। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতারত একটি ছবিও ছিল সম্ভবত। পরে জেনেছিলাম, ভরাজনসভায় তাঁকে গুলি করে শহিদ করে দেওয়া হয়। তিনি সেদিন বলছিলেন, এ দেশ ইসলামের জন্য স্বাধীন হয়েছে। এ মাটিতে ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। একথার সাথে সাথে সামনে থাকা ডায়েসে মুষ্টাঘাত করেছিলেন তিনি। আর ঠিক কিছুক্ষণ পরই কোথা থেকে যেন আততায়ীরা তাঁকে নিশানা করে শহিদ করে দেয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে মুহাম্মদ আলি সাহেবের পর তিনিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ইসলামপন্থি রাজনীতিবিদ ছিলেন।[১]

---

[১]. নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান (১৮৯৬-১৯৫১) অখণ্ড পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে তিনি রাজনীতিতে উঠে আসেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তিনি মুহাম্মদ আলি জিন্নাহর ডানহাত হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি কায়েদে মিল্লাত ও শহীদে মিল্লাত উপাধিতে ভূষিত হন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৩০ এর দশকে তিনিই মুহাম্মদ আলি জিন্নাহকে ভারতে ফিরে আসতে আগ্রহী করে তোলেন; এরই ফলে একপর্যায়ে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়। চল্লিশের দশকে লাহোর প্রস্তাব পাশ হবার পরে লিয়াকত আলি খান পাকিস্তান আন্দোলন এগিয়ে নিতে জিন্নাহকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেন। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশবাসীর পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছিলেন; বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্বের বিষয় কাশ্মীর সমস্যাকে তিনি জাতিসংঘে উত্থাপন করেন। ইসলামপন্থি নেতা হিসেবে তিনি সর্বমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেলেও বহিঃশত্রুদের চক্ষুশূল হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে তাঁকে এজন্য অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে (পরে জানা যায়, সাদ আকবর ছিল তার নাম।) জীবনও দিতে হয়। রহিমাহুল্লাহ। তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী।

অল্পবয়সি বালক হলেও মাস্টার সাহেবের আবেগ আর উদ্দীপনা সেদিন আমাকে ছুঁয়ে যায়। আমার সাথে আমার এক চাচাও স্কুলে পড়তেন। জি, ভুল শোনেননি, আমার চাচা। আমরা একইসাথে স্কুলে যাতায়াত করতাম। সেদিন বাড়ি আসার সময় আমি চাচাকে এই বিষয়টি বারবার জিজ্ঞাসা করি, চাচা! মাস্টার সাহেব এভাবে কেন বলছিলেন, ইসলামের বাবা আজ শহিদ হয়ে গেছেন! চাচার কাছে তেমন সদুত্তর ছিল না। তাই বাড়ি এসে পিতামাতার সামনে আবারও প্রশ্নটি ছুড়ে দিই। সর্বশেষ খবর তাদের জানা ছিল না। তাই তারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান। আমি তখন জিয়া স্যারের সব কথা খুলে বলি। সব শুনে আব্বা খুব দুঃখ পান। তিনি আমাকে কাছে বসিয়ে লিয়াকত আলি খানের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা শোনান। তখন বুঝতে পারি, তিনি কে ছিলেন এবং কেনই-বা স্যার তাঁকে নিয়ে এভাবে আবেগি মন্তব্য করেছিলেন। আমার বয়স তখন সর্বোচ্চ সাত এবং সর্বনিম্ন পাঁচ বছর হবে।

স্কুলজীবনের দিনগুলোতে যখন মাদরাসায় যেতাম, কুরআন মাজিদের সাথে একটা অকৃত্রিম আত্মার বন্ধন গড়ে ওঠে সেই সময়। আমার কচি মনে এই ভাবনা খেলত যে, আমাকে এই বন্ধন আরো দৃঢ় করতে হবে। এই ভাবনা থেকেই আব্বাকে সাহস করে একদিন বলে বসলাম, আমি আর স্কুলে যেতে চাচ্ছি না। পড়লে আমি মাদরাসাতেই পড়ব। দু-বছর তো বাড়ির কাছে পড়লাম। এখন একটু ভালো মাদরাসায় পড়তে মন চাচ্ছে। আসলে আমার মধ্যে এই স্পৃহা এসেছিল বাড়ির পাশের মাদরাসার সম্মানিত উসতাদবৃন্দের স্নেহদৃষ্টির বরকতে। কাকতালীয়ভাবে আমার কায়দা, আমপারা ও নাজেরা[১০] বিভাগের তিনজন উসতাদই ছিলেন হজরত মাদানির[১১] সরাসরি শিষ্য। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল

---

[১০]. দেখে দেখে কুরআন মাজিদ পাঠের প্রশিক্ষণ।

[১১]. আল্লামা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি একইসঙ্গে ভারতবর্ষের মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশক ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের 'সদরে মুদাররিস' (পরিচালক) ছিলেন।

সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. ১৯ শাওয়াল ১২৯৬ হিজরিতে (১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতের উত্তরপ্রদেশের 'উন্নাও' জেলার 'বাঙ্গারমৌ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইয়েদ হাবিবুল্লাহ তার নাম রাখেন হুসাইন আহমদ। তবে তাঁর পারিবারিক নাম ছিল 'চেরাগে মুহাম্মদ'। তিনি ছিলেন হুসাইন রা.-এর বংশধর। ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর পূর্বপুরুষরা মদিনা থেকে তিরমিজ হয়ে লাহোরে আসে এবং সেখান থেকে ভারতের ফয়জাবাদ জেলার এলাহাবাদে বসতি স্থাপন করে। পারিবারিক পরিমণ্ডলেই শাইখুল ইসলাম মাদানির শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বাবা-মায়ের কাছেই তিনি হিফজ সম্পন্ন করেন। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষকদের ভেতর শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ.-এর প্রভাবই তার ওপর সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। ১৯২০ সালে শাইখুল হিন্দের নির্দেশে তিনি কলকাতার একটি মাদরাসার প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ==

নলদিয়াবি। উনি আমার কায়দায়ে বোগদাদীর উসতাদ। সম্পর্কে আমার চাচা। বাল্যসাথি (মাওলানা) ইয়াকুবের বাবা। আমরা দুজন একইসাথে কুরআনে মাজিদের নাজেরা শেষ করেছিলাম। আমাদের সাথে অনেক পুরোনো সহপাঠী ছিল, যারা দু-বছরেও আম্মাপারার গণ্ডি পেরোতে পারেনি। অপর দুজন উসতাদ ছিলেন মাওলানা আবদুস সুবহান (বখতিয়ারপুরি)। উনি ছিলেন আমার আমপারার উসতাদ। উনি জিরি[১২] মাদরাসা থেকে পড়াশোনা সমাপ্ত করে দেওবন্দে[১৩] পড়ে এসেছিলেন। মাদরাসা থেকে দশ-বারো মাইল দূরে ছিল তাঁর বাড়ি। প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে আসতেন। বাজারে তাঁর একটি কুতুবখানা ছিল। বিকেলবেলা সেখানে সময় দিতেন।

==১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১ 'ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করা হারাম' ফতোয়া দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। দুই বছর কারাবাসের পর ১৯২৩ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং মুহাদ্দিস হিসেবে সিলেটে আগমন করেন। পাঁচ বছর সিলেটে অবস্থানের পর ১৯২৮ সালে তিনি দেওবন্দের সদর মুদাররিস পদে যোগদান করেন। এরপর আজীবন এই পদে বহাল ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানির আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষক ছিলেন মুফতি রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গাঙ্গুহি রহ.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাছ থেকেই খেলাফত লাভ করেন। তবে তিনি হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর সান্নিধ্যও লাভ করেন। মাদানি রহ.-এর শিক্ষা আন্দোলন ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল। তাঁর প্রচেষ্টায় আসাম ও সিলেট অঞ্চলে অসংখ্য দীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯২৮ সালে দারুল উলুম দেওবন্দের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সিলেট ত্যাগ করলেও ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের আগ পর্যন্ত প্রতি রমজানে সিলেটে ইতেকাফ করতেন এবং এই অঞ্চলের দীনি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানা কর্মসূচিতে যোগদান করতেন। তাঁর সেই শ্রম ও প্রচেষ্টার প্রভাব এখনো সিলেট ও আসাম অঞ্চলের দীনচর্চায় বিদ্যমান। বাংলাদেশে শাইখুল ইসলাম মাদানি রহ.-এর ৫০ জন খলিফা রয়েছেন, যাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশই বৃহত্তর সিলেটের।

৫ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে বরেণ্য এই মনীষীর মৃত্যু হয়। শাইখুল হাদিস জাকারিয়া রহ. তাঁর জানাজার নামাজের ইমামত করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দের ঐতিহ্যবাহী 'কাসেমি' কবরস্থানে প্রিয় শিক্ষক মাহমুদ হাসান দেওবন্দির পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

[১২]. আল-জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি সংক্ষেপে জিরি মাদরাসা। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার জিরিতে অবস্থিত বিখ্যাত কওমি মাদরাসা। বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম কওমি মাদরাসা এটি। দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় প্রতিষ্ঠানটি।। মুজাহিদে মিল্লাত শাহ মাওলানা আহমদ হাসান ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

[১৩]. দারুল উলুম দেওবন্দ। ভারতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি জ্ঞানের মৌলিক একটি কেন্দ্র। এখান থেকেই ইংরেজ খেদাও-সহ বহু দীনি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থান। ১৮৬৬ সালে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব এটি প্রতিষ্ঠা করেন। কাসেমুল উলুমি ওয়াল খায়রাত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবি তাদের প্রধান ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ও হাজি সাইয়েদ আবিদ হুসাইন। পরবর্তী দেওবন্দ পৃথিবীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

নিসাবের[১৪] প্রাথমিক কিতাবগুলো তাঁর দোকানে পাওয়া যেত। আরেকজন উসতাদ ছিলেন মাওলানা আহমদ হাসান আনোয়ারি। উনি ছিলেন মাদরাসার মুহতামিম। তিনি প্রথমে পটিয়া[১৫] ও পরে দেওবন্দে পড়াশোনা করেছেন। আমাদের এলাকা থেকে তিন-চার মাইল দূরে উনার পৈতৃক নিবাস ছিল। কিন্তু সেখানে বসবাসে কিছুটা সমস্যা হওয়ায় তিনি আমাদের এলাকায় এসে এক টুকরো জমি কিনে নেন। এজন্য লোকে তাকে 'নতুন জমিওয়ালা' মৌলবি সাহেব নামে চিনত। পটিয়ার মুফতি আযিযুল হক রহ. এর[১৬] শাগরেদ ও মুরিদ ছিলেন। দুধকুমড়া গ্রামে ছিল তার বাড়ি। পরবর্তীতে

---

[১৪]. শিক্ষা সিলেবাসকে নিসাব বলা হয়।

[১৫]. আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া সংক্ষেপে পটিয়া মাদরাসা চট্টগ্রামের পটিয়ায় অবস্থিত একটি কওমি মাদরাসা বা বেসরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কওমি মাদরাসা। দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতিকে ভিত্তি করে পরিচালিত হয় মাদরাসাটি। মুফতি আজিজুল হক ১৯৩৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

[১৬]. এই মহান সাধক ১৩৩২ হিজরিতে পটিয়া থানার অন্তর্গত চরকানাই গ্রামে মুন্সিবাড়ির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রা. এর বংশধর মরহুম মাওলানা নুর আহমদ হলেন তার সম্মানিত পিতা। এগারো মাস বয়সে তিনি এতীম হন।

১৩৩৩ হিজরি। দাদা তাকে প্রাচীন দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া আরাবিয়া জিরি মাদরায় ভর্তি করান। তার মাঝে খোদাপ্রদত্ত বিস্ময়কর মেধা দেখে মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস আল্লামা আহমদ হাসান রহ. অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন সহকারে তার শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই বালক আযিযুল হক অসাধারণ মেধাবী হিসাবে মাদরাসায় পরিচিতি লাভ করেন।

১৩৪৩ হিজরি। দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করে আরো উচ্চশিক্ষার জন্য ভারত গমন করেন। উপমহাদেশের অন্যতম দীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাযাহেরে উলুম সাহারানপুর মাদরাসায় হাদিস, দর্শন, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। ১৩৪৪ হিজরিতে বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. এর সাহচর্যে প্রায় নয় মাস আধ্যাত্মিকতা চর্চা করে দেশে ফিরে আসেন।

১৩৪৫-১৩৫৯ হিজরি পর্যন্ত মাদারে ইলমি জিরি মাদরাসায় মুফতি ও মুফাসসিরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতো মধ্যে ১৩৫৭ হিজরিতে স্বীয় মুরশিদ শাইখুল মাশায়েখ আল্লামা জমিরুদ্দীন রহ. (হাটহাজারির বড় মাওলানা সাহেব রহ.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় পটিয়ায় 'জমিরিয়া কাসেমুল উলুম' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তী সময়ে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় রূপ ধারণ করে। বর্তমানে এই নামেই মাদরাসাটি সারাবিশ্বে পরিচিত। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি আজীবন মাদরাসাটি পরিচালনা করেন।

মুফতি সাহেব রহ. একাধারে ফিকাহবিদ, আরবি, উরদু ও ফারসি ভাষার সুদক্ষ লেখক ও কবি, ইলমে দীনের মহীরুহ এবং আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি বক্তৃতার ময়দানে ছিলেন আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা, লেখালেখির ময়দানে ছিলেন সফল লেখক, পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিলেন অভূতপূর্ব দক্ষ সংগঠক। আধ্যাত্মিক জগতের এ মহান ব্যক্তি ১৩৮০ হিজরি মোতাবেক ১৯৬১ ইংরেজি সনের ১৫ রমজান মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাকে মাকবারায়ে আযিযীতে দাফন করা হয়।

তাঁর ব্যাপারে আরো জানতে পড়ুন- https://bit.ly/2PQpVKO

মুফতি সাহেবের খেলাফত লাভ করেছিলেন। বৈষয়িক অবস্থা তাঁর ভালোই ছিল, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতে আমি এসকল গুণী উসতাদের সুনজর কাড়তে সক্ষম হই।

আব্বাজান আমার স্কুলত্যাগের ইচ্ছা জানার পর কিছুটা নাখোশ হন। উনার চাওয়া ছিল আমি আরো কিছুদিন স্কুলে পড়ি। এরপর চাইলে মাদরাসায় যেতে পারি। কিন্তু স্কুলের পরিবেশ আমাকে একদমই টানত না। আমি আব্বাজানের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আমার ইচ্ছার উপর অটল থাকি (একটু মেধাবীরা সামান্য জেদি হয় কিনা)। আব্বা আমার জেদের কারণে আমাকে একটু শায়েস্তা করতে চাইলেন। উনি বললেন তুমি যদি স্কুলে না যাও, তাহলে আমাদের সাথে জমিনদারির[১৭] কাজ করো। আমাদের কিছু চাষাবাদযোগ্য জমি ছিল। সেখানে দিনমজুররা কাজ করত। আব্বা আমাকে তাদের তদারকি করতে আদেশ দিলেন। আমি জেদের কারণে স্কুল না গিয়ে এই কষ্টকর কাজটিই করতে লেগে গেলাম। মজুরদের কাজ দেখা, কখনো তাদের পানি এগিয়ে দেওয়া, লাঙল ঠিকমতো রাখা হলো কি না লক্ষ রাখা, গোয়াল দেখাশোনা করা; এসব কাজই আমার নিত্যদিনের কর্মসূচিতে পরিণত হয়। এভাবে চার বছর একাধারে আমি আব্বাজানের সাথে জমিতে কাজ করে গেছি। এর মাঝেও সকালবেলা কখনো কখনো মাদরাসায় চলে যেতাম। কিছু নাজেরা পড়তাম। সময়মতো আবার ফিরে এসে জমিতে চলে যেতাম।

মাদরাসায় এই সময় আমি কিছু উরদুও পড়ে নিয়েছিলাম। মক্তবের ছাত্র হলেও অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক মেধাবী হবার কারণে আমার উসতাদবৃন্দ স্নেহবশত প্রাথমিক কিছু উরদু কিতাব পড়িয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর এই ধারাও বন্ধ হয়ে যায়। আমি সম্পূর্ণরূপে জমির কাজে লেগে যাই। মাদরাসা ছেড়ে দেওয়ার সময় আমার বয়স ছিল আট বছর। এরপর প্রায় চার বছর আমি চাষাবাদের কাজে সময় দিই। সে হিসেবে বারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি জমিজমার কাজে লেগে ছিলাম।

বাল্যসাথি ইয়াকুব

এদিকে আমার চাচাতো ভাই ইয়াকুব—যার বাবা ইসমাইল সাহেব আলিম ছিলেন—মাদরাসায় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তাকদিরের লিখন খণ্ডান যায় না! হঠাৎ একদিন মাওলানা ইসমাইল সাহেব ইনতেকাল করেন। স্বামীর আকস্মিক বিদায়ে ইসমাইল সাহেবের বিধবা বেগম ভীষণ শোকাহত হন। ইদ্দত চলা অবস্থাতেই

---

[১৭]. নিজেদের জমিজমায় কৃষিকাজ পরিচালনা ও তদারকিকে মুফতি সাহেবের এলাকায় জমিনদারি বলা হয়।

তার মায়ের বাসা থেকে আত্মীয়রা এসে তার ছোট ছোট তিনটি বাচ্চাসহ (দুই ছেলে এক মেয়ে) বেগমকে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু ইয়াকুবকে তারা আমাদের উসতাদ মাওলানা আহমদ হাসান সাহেবের কাছেই রেখে যান। যেহেতু তাঁর বৈষয়িক অবস্থা ভালো ছিল; তাই তিনিও আর না করেননি। এদিকে মাওলানা আহমদ সাহেবের এক বোন একটি বাচ্চা প্রতিপালনের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন; এই আশায় যে, সে ঘরদোড় দেখাশোনা করবে। এভাবে পরিস্থিতি ইয়াকুবকে এখানেই রেখে দেয়। আহমদ সাহেবের বোনের বাসায় দেখতে দেখতে তার দু-বছর কেটে যায়। হঠাৎ একদিন কোনো এক মুরুব্বি ইয়াকুবকে দেখে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। ভদ্রমহিলাকে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, এই ছেলেকে এভাবে বসিয়ে রেখে লাভ কী! ও তো দিনমজুর হয়ে যাবে। একে পড়াশোনা করানো হোক। এ তো এক সময় ভালোই পড়াশোনা করত। আহমদ হাসান সাহেবও এ ব্যাপারে একমত হন। এই সময় ভাই ইয়াকুবকে পাশের একটি মাদরাসায় ভর্তি করানো হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে এর নাম ছিল মাদরাসায়ে হোসাইনিয়া বোয়ালিয়া, আনোয়ারা। আমাদের আনোয়ারা[১৮] থানাতেই অবস্থিত ছিল প্রতিষ্ঠানটি।

বাল্যভূমি

আমাদের বাড়ি ছিল নলদিয়াতে। বুরুমছড়া[১৯] ইউনিয়নে। আমার সম্মানিত আব্বুর নাম জনাব খলিলুর রহমান। দাদার নাম আবদুল খালেক। পরদাদার নাম রওশন আলি। উনারা সবাই জমিদার ছিলেন। প্রায় ৩২ কানি[২০] জমি ছিল আমার দাদাজানের। দাদাজানের ছিল ছয় ছেলেমেয়ে। সবার বড় ছিলেন আমার ফুফু। উনার নাম ছিল আইনা। আরবি হরফ আইন দিয়ে। সবাই তাই দাদাজানকে 'আইনার বাপ'

---

[১৮]. আনোয়ারা থানা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আনোয়ারা উপজেলার একটি থানা। আনোয়ারা উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি ইউনিয়নের আংশিক এলাকার প্রশাসনিক কার্যক্রম আনোয়ারা থানার আওতাধীন।

[১৯]. বরুমছড়া বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন। বরুমছড়া ইউনিয়নের আয়তন ৫,৯২৭ একর (২৩.৯৯ বর্গকিলোমিটার)। এটি আনোয়ারা উপজেলার সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন।

[২০]. কানি : কানি দুই প্রকার। (ক) কাচ্চা কানি (খ) সাই কানি

কাচ্চা কানি : ৪০ শতকে এক কাচ্চা কানি। কাচ্চা কানি ৪০ শতকে হয় বলে একে ৪০ শতকের কানিও বলা হয়। ১ কানি=১৭২৮০ বর্গফুট

সাই কানি : এই কানি কোথাও ১২০ শতকে ধরা হয়। আবার কোথাও কোথাও ১৬০ শতকেও ধরা হয়।

বলে ডাকত। চাচাদের মধ্যে একজন হাফিজ ছিলেন। একজন ছিলেন আলিম। চাচাদের নাম যথাক্রমে শহর মুল্লুক, আমার আব্বা খলিলুর রহমান, মোহাম্মাদ দলিলুর রহমান, হাফেজ হামিদুর রহমান, হাফেজ আহমদ এবং সিদ্দিক আহমদ সাহেব। মজার ব্যাপার হলো, আমার নানাবাড়ি ছিল একদম পাশেই। মূলত আমার দাদা এবং নানা দুজন ছিলেন চাচাতো ভাই। এজন্য উনাদের জমিজমা ছিল একই জায়গায়। আজও সেই অবস্থাতেই আছে। বড় খালার নাম আফিয়া। আরো কিছু খালা ছিলেন। এখন সেদিকে যাব না। আমার নানাজান এবং দাদাজান দুজনই মাওলানা মুখলিসুর রহমান সাহেবের মুরিদ ছিলেন। উনি হজরত গাঙ্গুহির[২১] খলিফা। এই হিসেবে তারা পিরভাইও ছিলেন।

যা বলছিলাম, আমার সাথি ইয়াকুবকে আহমদ হাসান সাহেবের বোনের বাসায় দু-বছর প্রতিপালনের পর মাদরাসায় পাঠানো হয়। আসলে এটা ওর সুপ্রসন্ন ভাগ্য ছিল বলতে হবে। ইসমাইল সাহেবের শ্যালিকাকে বিয়ে করেছিলেন আমার চাচা মাওলানা দলিলুর রহমান সাহেব। এ হিসেবে ইয়াকুবের খালাবাড়ি হয়ে যায় আমাদের বাড়ি। প্রতি সপ্তাহের শেষে নিয়মিত সে মাদরাসা থেকে তার খালাবাসায় আসত। আমাকে নানারকম গল্প শোনাত। কিন্তু আমার তো উপায় ছিল না। আমি ছিলাম মাঠের বালক। ওর গল্পগুলো শুধু শুনতাম। আর মনের মধ্যে পুরোনো স্বপ্ন নতুন করে পেখম মেলত।

ফেরারি মনের ভাবনা

এভাবে কেটে যায় আরো দুটো বছর। ইয়াকুবকে দেখে আমার মাঝে ইলম অর্জনের স্পৃহার পারদ যেন তার চূড়ায় উঠত। এক ছুটিতে ওকে বলে ফেললাম, দোস্ত, আমাকে একটু সাহায্য করো। আমিও তোমার সাথে মাদরাসায় যেতে চাই। সে আমার ইচ্ছা ও স্বপ্নের কথা আগে থেকেই জানত। কিন্তু এই দফা কিছুটা ভয় পেয়ে গেল সে। না বাবা, তোমার আব্বা আমাকে বকা দেবেন। আর তোমাকে প্ররোচিত করার

[২১]. আবু মাসুদ রশিদ আহমেদ ইবনে হিদায়াত আহমাদ আইয়ুবি আনসারি রামপুরি গাঙ্গুহি (১০ মে ১৮২৯-১১ আগস্ট ১৯০৫) ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের পুরোধা পুরুষ। তিনি দেওবন্দ মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবির মৃত্যুর পর তিনি দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম নিযুক্ত হন। হজরত মাওলানা মুফতি রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি ও মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবি দুজনেই দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা এবং হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কির কাছে তাসাউফের ইজাজত লাভ করেন। তিনি ফিকহ ও তাসাউফের উপর প্রায় ১৪টি বই লিখেছেন। এর মধ্যে ফতোয়া রশিদিয়া ও হিদায়াতুশ শিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁর জীবনী পড়ুন- https://bit.ly/37TR8q2

জন্য খালাজানের হাতে মারও খেতে হতে পারে। ভাই, তুমি তোমার সিদ্ধান্ত নিজেই নাও। আমি সর্বোচ্চ মাদরাসায় পৌঁছানোর সাহায্যটুকু করতে পারব।

ইয়াকুবের জবাবে কিছুটা হতাশ হলেও ভেতরে ভেতরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। গভীর রাতে মহান রবের দরবারে দু-হাত উঠিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে চাইলাম, 'ইয়া রব, দুনিয়ায় কত এতিম-অসহায় ইলম অর্জন করে চলেছে। তুমি যদি তাদের অভিভাবক হতে পারো, তা হলে আমারও অভিভাবক হয়ে যাও। আমাকে তোমার নবীজির দীন শেখার সুযোগ করে দাও।' কয়েকদিন ধরে দোয়ার এই আমল চলতে থাকে। এতে করে আমার মনোবল ও আত্মবিশ্বাস মজবুত হয়ে যায়।

আমাদের এলাকায় চল ছিল যে, মওসুমের শেষে মজুর ও খেটে-খাওয়া-মানুষদের বাৎসরিক কাপড়চোপর দেওয়া হতো। সাথে বাড়ির লোকজনও হাদিয়া পেত। আমাদের বাসায় দুজন মজুর সারা বছর আর কয়েকজন শুধু ফসল কাটার সময় এসে কাজ করত। প্রথা অনুযায়ী সেই মওসুমের শেষে আব্বাজান সবাইকে কাপড়চোপর দিতে চাইলেন। যে যা নিতে চায় তাকে তাই কিনে দেওয়া হতো। আব্বাজান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এবার কী নিতে চাও? আমার আগে থেকেই দুটো পাঞ্জাবি ছিল। তাই পাঞ্জাবি না চেয়ে আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা গেঞ্জি আর একটা ছাতা আবদার করি। আব্বা খুশি হয়ে আমার জন্য অতিরিক্ত আরো কিছু জিনিস ও কাপড়চোপর নিয়ে আসেন। আমিও আনন্দের সাথে আমার ব্যাগ গোছানো শুরু করি। আর অপেক্ষা করতে থাকি মোক্ষম সময়ের জন্য।

মওসুম শেষে ছুটিতে ইয়াকুব বাড়ি এলে আমি ওকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাই। এবার সে আমাকে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। আমরা দুজন শলাপরামর্শ করে এভাবে পরিকল্পনা সাজাই—হাট থেকে একটু দূরে একটি বড় পুকুর ছিল। আমি আগামী শনিবার বাজারের দিন সকাল সকাল সেখানে পৌঁছে যাব। একদম একা। সাধারণ রাস্তা ধরে না এগিয়ে একটি মেঠোপথ ব্যবহার করব। সাথে নেব প্রয়োজনীয় ব্যাগপত্র। আর ওদিকে ইয়াকুব আগে থেকেই সেই পুকুরের ধারে আমগাছের নিচে অপেক্ষা করবে। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে আমি পৌঁছাতে না পারলে সে মাদরাসার পথ ধরবে। ভেবে নেবে যে আমি বের হতে পারিনি।

বিসমিল্লাহয় শুরু পথচলা

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি শনিবার সকাল সকাল পান্তাভাত খেয়ে অপেক্ষায় ছিলাম। যখনই আব্বাজান বাজারের উদ্দেশে বের হয়ে গেলেন, আমি আস্তে করে পোটলাটা পিঠে ঝুলিয়ে আর হাতে ছাতা নিয়ে বাড়ি থেকে

বের হয়ে পড়লাম। ধরলাম সাধারণ মেঠোপথ। বাজারের ভেতর দিয়ে না গিয়ে ঘুরপথে প্রায় দুই কিলোমিটার অতিরিক্ত হেঁটে আমি পুকুরের কাছে পৌঁছে যাই। আমার চিরকল্যাণকামী সাথি ইয়াকুব দেখি আমগাছের ছায়ায় বসে আমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ও লাফ দিয়ে উঠল। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি জানো না অনেক চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। যদি তুমি ধরা পড়ে যেতে, আমাকে অনেক বকুনি শুনতে হতো। হয়তোবা পিটুনিও খেতাম। এখন তাহলে পথ চলা যাক। এভাবেই শুরু হলো ইলমের পথে আমার বিরামহীন সফর। হাঁটতে হাঁটতে আমরা সকাল দশটার মধ্যে মাদরাসায় পৌঁছে গেলাম।

বোয়ালিয়া হোসাইনিয়া মাদরাসার সেসময়ের নাজিম[২২] সাহেব ছিলেন মাওলানা কারি আহমাদুল্লাহ সাহেব। উনি আবার আমাদেরই এলাকার বাসিন্দা। ইয়াকুব আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, 'হুজুর, আমার ছোটবেলার সাথি। ওকে ভর্তি করে নিন।' ইয়াকুবের তো আর জানা ছিল না যে উনি আমার আব্বাজানেরও সাথি। নাজিম সাহেব তো আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী পালিয়ে এসেছ, তাই না? আমি হ্যাঁসূচক মাথা নাড়লাম। উনি ইয়াকুবকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, দেখো, তোমরা ভালো ছেলে। নিজ আগ্রহে দীন শিখতে এসেছ, আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু এখানে তো একটা নিয়ম আছে। আমরা তো চাইলেই কাউকে ভর্তি নিতে পারি না। অভিভাবকের অসম্মতিতে ভর্তি হলে পরে সমস্যা কে সামলাবে? তা ছাড়াও ওর পড়াশোনার যে খরচ, সেসব বহন করবে কে? তার উপর ওর আব্বা আমার সাথি মানুষ। ওকে নিয়ে ওর আব্বার ভাবনার কথা আমি সবটাই জানি। আমি জেনে-শুনে ওকে ভর্তি নিলে ব্যাপারটা ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে, বাবা! তোমরা আরো ভেবে দেখো। আর আপাতত আমাকে মাফ করো!

নাজিম সাহেবের কথায় আমি হতাশ হয়ে পড়ি। এক কোনায় সরে এসে কাঁদতে লাগলাম। দীন শিখব বলে এত আশা করে পালিয়ে এলাম, আর এখানে এসে দেখি আরেক বিপত্তি। ইয়াকুব আমার অবস্থা বুঝতে পারছিল। সে এগিয়ে এসে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝাতে লাগল, দেখো, এত জলদি হতাশ হওয়া যাবে না। উনি তো নাজিম সাহেব। একটু পর মুহতামিম[২৩] সাহেব হুজুর আসবেন। তখন আমরা সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলব। দেখবে ঠিকই উনি তোমাকে ভর্তি নেবেন।

ওর কথায় আবার আশায় বুক বেঁধে বসি। কিছুক্ষণ পর মুহতামিম সাহেব এসে গেলেন। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। চওড়া কাঁধ। উনি হলেন মাওলানা আলি আহমদ

---

[২২]. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। কওমি মাদরাসার ঐতিহ্যবাহী একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ।
[২৩]. প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্বশীল।

সাহেব। পটিয়ার মুফতি আযিযুল হক সাহেবের খলিফায়ে মুজায[২৪]। আমাদের দারুল মাআরিফের সুলতান জওক সাহেবের[২৫] সম্মানিত শ্বশুর। আমি উঠে এগিয়ে সালাম মুসাফাহা করলাম। উনি স্নেহবশত আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে (মুফতি সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে যান এসময়) বললেন, মাশাআল্লাহ! দীন শিখতে মানুষ এখনো ঘর ছেড়ে আসে! আজব ব্যাপার হলো, উনিও আমার আব্বাকে চিনতেন। আসলে আমার আব্বা দীনদার মানুষ ছিলেন। তিনি আলিমদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। সেই সুবাদে এই অঞ্চলের মোটামুটি সকল আলিমের সাথে আব্বাজানের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ঘটনাবশত মুহতামিম সাহেবও জানতেন, আমার আব্বা আমাকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়ে তারপর মাদরাসায় দেওয়ার পক্ষপাতী; কিন্তু আমি স্কুলে আর যেতেই চাইনি। তাই মাদরাসাতেও আর যেতে দেননি তিনি। মুহতামিম সাহেব হুজুর কার থেকে যেন এসব কথা জেনেছিলেন। নাজিম সাহেবের সাথে সাক্ষাতের কথা জানালাম উনাকে। উনি আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। অনুরোধ করে বললেন, এর আব্বাকে আমি চিনি। খুব ভালো মানুষ। একে ভর্তি করে নিন। পরে দেখা যাবে কী হয়! নাজিম সাহেবে একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'হজরত, ওর আব্বাকে আমিও বলেছিলাম মাদরাসায় দিতে। কিন্তু তিনি তো রাজি নন।' মূলত

---

[২৪]. আত্মশুদ্ধির মেহনতে উন্নীত একটি স্তরকে বোঝায়। শায়েখের অনুমতিক্রমে এসময় খলিফা উত্তরসূরি হিসেবে উম্মতের সাধারণ সদস্যদের আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

[২৫]. আল্লামা সুলতান জওক নদবি একজন ইসলামি চিন্তাবিদ এবং জামিয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। আরবি ভাষায় দক্ষতা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য তার পরিচিতি রয়েছে। সুলতান জওক নদবি ১৯৫৯ সালে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়াহ পাটিয়া থেকে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে, ১৪০৪ হিজরি সালে ভারতের নদওয়াতুল উলামা থেকে ফারেগ হন।

সুলতান জওক ১৯৫৯ সালে চন্দনাইশ উপজেলার মাদরাসা রাশিদিয়াতে যোগদানের মধ্যদিয়ে শিক্ষকতা পেশা শুরু করেন। ১৯৬০ সালে তিনি জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে মাওলানা হাজি ইউনুস সাহেবের আহ্বানের জবাবে তিনি জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

তার উদ্যোগে ১৯৮৪ সালে রাবিতায়ে আদাব আল-ইসলামি অধীনে জামিয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিতে আবুল হাসান আলি নদবির সভাপতিত্বে পূর্ব এশিয়ার ভাষা ও সাহিত্যের উপর একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে মুসলিমবিশ্বের সেরা কবিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আল্লামা সুলতান জওক নদবি তার হাতেগড়া প্রতিষ্ঠান জামিয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ার মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। —আমার জীবনকথা তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

পরিস্থিতি আমাকে একটু পরখ করে এই সময়। অবশেষে মুহতামিম সাহেবের অনুরোধে এই দফায় আমার ভর্তি সম্পন্ন হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ।

বলেনি কেউ কিছুই!

শুরু হলো আমার নতুন জীবন। খুব ভালোমতো ক্লাস করতে থাকলাম। আমরা এসেছিলাম শনিবার। বৃহস্পতিবার বিকেলে শুনলাম আগামীকাল সাপ্তাহিক ছুটি। সবাই বাড়ি যাবে। আমি তো শুনেই ভাবনায় ডুবে গেলাম। এখন কী হবে! আমি কোথায় যাব! বাড়ি গেলে কোন মুখে যাব! সবাই না-জানি এই এক সপ্তাহে আমাকে কত জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছে! ভাই ইয়াকুবকে জানালাম আমার চিন্তার কারণ। সে অভয় দিয়ে বলল, 'সমস্যা নেই। চলো তো! কিছু হবে না। উনারা বুঝে গেছেন তুমি কোথায় এসেছো। একবার গেলেই ঠিক হয়ে যাবে।' ওর কথা শুনে আমি আশায় বুক আর কাঁধে পোটলা বাঁধলাম।

শুক্রবার সকালে ভাই ইয়াকুবের সাথে রওনা দিলাম বাড়ির পথে। বাড়ি পৌঁছে বকুনির ভয়ে চুপটি মেরে গিয়ে বসলাম নিজের ঘরে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে কেউ কিছুই বলল না। এমনকি কেউ জিজ্ঞাসাও করল না তুমি কোথায় গিয়েছিলে! আমি হতবাক হয়ে সবার আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। আম্মাজানকে একবার জিজ্ঞাসা করতে যেয়েও আর করা হলো না। দুপুরে খেতে বসে আব্বা আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। পরে আমি নিজেই সবকিছু আম্মাকে বললাম। উনি শুনে মুচকি হেসে দিলেন। আমি বুঝলাম যে সবাই আসলে জেনে গেছে। এবং আলহামদুলিল্লাহ খুশিও হয়েছে। সন্ধ্যায় আব্বা বাজারে গেলেন। রাতেই আমাকে চলে যেতে হবে আম্মাকে জানালাম। মাদরাসা থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে সবাই এক সপ্তাহের জন্য চার কেজি চাল নিয়ে আসবে। আম্মাকে বললাম আমাকে চার কেজি চাল দিতে। কিন্তু আম্মা বললেন তোমার আব্বা তো আমাকে অনুমতি দেননি। আমি এই কথা শুনে এতই ভারাক্রান্ত হলাম যে চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে এল। আম্মাকে জমিদারি ধাঁচে ছোটখাটো বয়ান শুনিয়ে দিলাম। আম্মা শোনেন, দুনিয়াতে হাজারো-লাখো এতিম বালক আছে। তাদের দেখার কেউ নেই। কিন্তু তারাও ইলমে দীন হাসিল করছে। আমিও নিজেকে আজ থেকে তাদের মতো মনে করব। ভাবব, আমার আব্বা-আম্মা থেকেও নেই (কাঁদতে কাঁদতে)! আম্মা আমার এমন স্পৃহা ও উদ্দীপনা দেখে কয়েক সের চাল আমাকে একটা পোটলায় বেঁধে দিয়ে দিলেন। আর বললেন সাবধানে যাবা। আর তোমার আব্বার উপর রাগ করো না। তোমার ব্যাপারে কী করবেন, এই নিয়ে উনি একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছেন!

আমি আম্মাকে জানিয়ে দিলাম, আমি মাদরাসা ছাড়া কোথাও যাব না। তাই দয়া করে আমাকে নিয়ে 'অন্য কিছুর' পরিকল্পনা আপনারা করবেন না। বের হয়ে যাচ্ছি এমন সময় পর্দাঘেরা আঙিনা থেকে আম্মা আমাকে বিদায় দিলেন। চার কেজি চালের পুঁটলির সাথে পাঁচটি রুপিও আম্মা আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। অশ্রুসজল চোখে আম্মার দিকে তাকালাম। কিন্তু আম্মা কিছু বলতে না দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। মায়েদের মন আজও বুঝলাম না! ভেতরে কত আবেগ উনারা চেপে রাখেন, বাইরে থেকে সত্যিই বোঝা দায় হয়ে পড়ে! ভাবতে ভাবতে আমি ভাই ইয়াকুবের বাড়ির সামনে চলে এলাম। সে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েই ছিল। আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। আবার একসাথে শুরু হলো পথচলা!!

মনোযোগী মন

আমি আর ভাই ইয়াকুব ধীরে ধীরে মাদরাসায় পৌঁছে গেলাম। মেজাজ ছিল দারুণ ফুরফুরে। আমার অবস্থা শুনে নাজিম সাহেব, মুহতামিম সাহেবও, খুব খুশি হলেন। আব্বার জন্যও খুব দোয়া করলেন তারা। উসতাদবৃন্দের স্নেহছায়ায় পড়াশোনা ভালোই হতে লাগল। ওখানে আমি দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হয়েছিলাম। ফারসিখানায়। এখানে আমি মোট সাড়ে তিন বছর ছিলাম। উরদুখানায় তো আগেই পড়েছিলাম; তাই উসতাদরা ফারসিখানায় দিয়ে দিয়েছিলেন। দেখতে দেখতে ষাণ্মসিক পরীক্ষার সময় এসে গেল। আমার প্রস্তুতি ভালোই ছিল। ষাণ্মসিক পরীক্ষায় বেশ ভালো ফল করলাম। এখানে থাকতে আমি সবসময় প্রথম অথবা দ্বিতীয় হতাম। কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন ভাই ইয়াকুব আমাকে বলল, তুমি প্রতি সপ্তাহে বাড়ি না গিয়ে এখানেই থেকে যাওয়ার চেষ্টা করো। তাহলে আরো ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারবে। আমিও ভেবে দেখলাম, মন্দ বলেনি ভাই ইয়াকুব। কিন্তু প্রশ্ন হলো জায়গির পাব কোথায়! সাহায্যের আশায় আল্লাহর কাছে খুব দোয়া করলাম। এ ছাড়া তো কোনো উপায় ছিল না আমার!

মুহতামিম সাহেবের চাচাতো ভাই হাবিবুর রহমান ছিলেন দীনদার নামাজী মানুষ। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তার হৃদয়ে কীভাবে যেন একজন তালিবে ইলমের কাফালতের (দেখভালের) বাসনা জেগে ওঠে। তিনি বিষয়টি মুহতামিম সাহেবকে জানান। মুহতামিম সাহেব ভেবেচিন্তে আমার ফয়সালা তাঁর ভাইয়ের বাসাতেই করলেন। হাবিব সাহেবের বড় ভাইয়ের ছেলে সুলায়মান থাকত তাদের বাসায়। আমি ওকে পড়াতাম। এভাবে মুহতামিম সাহেবের সাথে আরো গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। হাবিব সাহেবের বাসায় আমি দীর্ঘ দুই বছর জায়গির পদ্ধতিতে অবস্থান করি। উনাদের সাথেও খুব হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বোয়ালিয়া থেকে বিদায় : কিছু ঘটনা

যখন আমরা হোসাইনিয়া মাদরাসায় তৃতীয় বছরে পড়ি, তখন একটা বড় ঘটনা আমাদের পড়াশোনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ঘটনাটি ছিল এমন- আমাদের পাশের মাদরাসায় সরকারি সহায়তা দেওয়া হতো। সহায়তা বলতে বড় বড় টিনের কৌটায় দুধ, কখনো চাল-ডাল। পটিয়ার মুফতি আযিযুল হক রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমাদের মুহতামিম সাহেবকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন সরকারি সহায়তা গ্রহণ না করতে। কিন্তু উসতাদবৃন্দ ও কমিটির অনেকেই সরকারি সহায়তা নেওয়াটা পরিচিতির মাধ্যম মনে করে এই পথে এগোনোর সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্ররাও বহুদিন ধরে খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছিল। তাই সকলের অনুরোধের মুখে মুহতামিম সাহেবও সহায়তাগ্রহণে সম্মতি প্রদান করেন। সহায়তা হিসেবে সেসময় প্রতিমাসে বেশকিছু দুধের কার্টন আমাদের দেওয়া হতো। প্রতি কার্টনে থাকত ছয়টি টিন। প্রতিটি টিনে থাকত প্রায় পাঁচ কেজি করে গুঁড়োদুধ। এই সরকারি অনুদান পেয়ে ছাত্র-উসতাদ সবাই খুব খুশি হলো। গুঁড়োদুধ প্রতিদিন বিকেলে নাশতা হিসেবে দেওয়া হতো। কিন্তু দুধে থাকত না চিনির কোনো মিশ্রণ। এ ছাড়া অন্য কোনো নাশতাও দেওয়া হতো না। স্বভাবতই ছাত্ররা শুধু দুধ পান করতে পারত না। অনেকে কষ্ট করে ঢোক গিলে নিলেও অধিকাংশই দুধের কাপ অধরা রেখে উঠে যেত। এই তালিকায় আমিও ছিলাম। নাজিম সাহেবকে বিষয়টি জানানো হলে উনি চিনিমিশ্রণে অপারগতা প্রকাশ করলেন। যা কিছু এসেছে তা তো সরকারি সহায়তা হিসেবে। সেখানে মাদরাসা কমিটি অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করার সামর্থ্য বর্তমানে রাখে না। কিছুদিন এভাবে যাওয়ার পর বড় কিছু ছাত্র বুদ্ধি বের করল যে আমাদের যদি উপাদেয়ভাবে দুধ না-ই দেওয়া সম্ভব হয় তা হলে আমাদেরকে দুধ বিক্রয় করে মাথাপিছু হাতখরচ দিয়ে দেওয়া হোক। আমাদের পাশের মাদরাসার কিছু উসতাদ ও ছাত্র যে দুধ বরাদ্দ হতো, সেগুলো না এনে বিক্রয় করে দিয়ে আসত। আমাদের সাধারণ ছাত্ররা শুরুতে এ খবর জানত না। পরে তারা জানতে পারে। ফলে তাদের মাঝেও এমন হাতখরচ লাভের বাসনা জোরালো হয়ে ওঠে। কিন্তু মাদরাসার পরিচালকদের এত সময় ছিল না যে তারা এই মুফতে পাওয়া দুধ বিক্রিতে সময় বের করবেন। তবু কিছু কিছু উসতাদ ও বড় বড় ছাত্র যারা একটু বেশিই স্বাধীনচেতা ছিল, তাদের এক কার্টন বা এক টিন করে দুধ ফ্রিতে দিয়ে দেওয়া হতো। এগুলো তারা নিজেদের মতো করে বিক্রয় করে ফেলত। বিক্রয়মূল্য চলে যেত তাদের পকেটে। কিছুদিন পর এই বিষয়টিও জানাজানি হয়ে যায়। একে কেন্দ্র করে কয়েকদিনের

মধ্যেই ছাত্রদের মাঝে দুটি দলের উদ্ভব হয়। ছাত্রভাইদের একদল নবীন উসতাদদের সিদ্ধান্ত অনুসরণের পক্ষে, অপরদল এমন আচরণের ন্যায়নিষ্ঠ বিচারের দাবি তোলে। ক্রমেই এটি হাতাহাতি ও মারামারির পর্যায়ে চলে যায়। কিছু ছাত্র মারাত্মক আহতও হয়। ধীরে ধীরে বিষয়টি মাদরাসার মুহতামিম সাহেব এবং সেখান থেকে মাদরাসা কমিটির কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মাওলানা আলি আহমদ সাহেব খুবই নরমদিল ও সাদাসিধা বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। স্থানীয় রাজনীতিও তেমন বুঝতেন না। উনার সরলতার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। বিদ্রোহী হয়ে ওঠা ছাত্রভাইয়েরাও এই সুযোগটি কাজে লাগায়। এভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য একটি দিন ধার্য করা হয়। নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হন সকলেই। মুহতামিম সাহেব ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সালিসি বসে। কিন্তু উসতাদদের পক্ষাবলম্বনকারী ছাত্ররা এই সময় হঠাৎ দাবি তোলে যে, মাদরাসার মুহতামিম সাহেব বা সিনিয়র উসতাদ ছাড়া অন্য কারও সমাধান তারা মেনে নেবে না। পঞ্চায়েতে একজন রাজনৈতিক দলের নেতাও ছিল। তার কর্মকাণ্ডের জন্য ছাত্ররা তাকে খুবই অপছন্দ করত। এই লোক থাকলে তারা কোনোভাবেই সালিসি মেনে নেবে না, স্পষ্ট জানিয়ে দিল ছাত্ররা। তাই সেদিন আর সমাধান হলো না। পরবর্তীতে বিচার হয় মাদরাসাতেই; কিন্তু অদৃশ্য একটি হাত এখানেও কাজ করেছিল। বিচারে অবশেষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়। এক. দোষী ছাত্রদের বিদায় করে দেওয়া হবে। দুই. তাদের গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর এলাকাজুড়ে তাদের ঘোরানো হবে। তিন. আহত ছাত্রদের চিকিৎসা খরচ বাবদ জনপ্রতি ৫০০/- রুপি জরিমানা দেবে। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এই সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নেয়। এরা সংখ্যায় বেশি ছিল। ফলে উসতাদবৃন্দ পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছিলেন না। স্ট্রাইক চালানো ছাত্ররা নিরপেক্ষ ছাত্রদেরও তাদের দলে টানতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি হাতে নেয়। প্রতিটি জামাতে ও কক্ষে গিয়ে গিয়ে তারা এই স্বাক্ষর গ্রহণ করতে থাকে। আমাদের কক্ষেও কিছু বড় ভাই এসে পড়ে। আমাদের সবাইকে স্বাক্ষর করতে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আমি সরাসরি অস্বীকৃতি জানাই। মুহতামিম সাহেবের ভাইয়ের বাসায় থেকে কীভাবে তাদের নিমকহারামি করব, যেখানে আমি কোনো পক্ষেই নেই! তারা আমার জবাবে সন্তুষ্ট হলো না। আমাকে স্বাক্ষর করতেই হবে অথবা তারা আমাকে পেটাতে পারে, এমন একটা মনোভাব ফুটে উঠল তাদের কথাবার্তায়। কিছুটা বিরক্ত হয়েই আমি তাদেরকে সরাসরি এবং রাগতস্বরে জানিয়ে দিই—আমার পক্ষে আপনাদের সহযোগিতা করা সম্ভব না। প্রয়োজনে মাদরাসা ছেড়ে চলে যাব। ভাই ইয়াকুবসহ উপস্থিত কয়েকজন সাথি আমার সাথে একমত পোষণ করল। ফলে উত্তেজিত ছাত্ররা

আর কথা না বাড়িয়ে রাগতস্বরে কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। আমি আর ভাই ইয়াকুব পরিস্থিতি বুঝতে পারি। পরামর্শ করে অনতিবিলম্বে মাদরাসা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। শিক্ষাকার্যক্রম সে বছর প্রায় ছ'মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। বছরের বাকি সময় তাই বাড়িতে বসে থাকা ছাড়া বিদায় নিয়ে চলে আসা ছাত্রদের কোনো গতি ছিল না। তবু সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা বাড়ি চলে আসি। বিদায় জানাই প্রিয় প্রতিষ্ঠানকে।

বাড়িতে এসে আমরা শুয়ে-বসেই সময় কাটাচ্ছিলাম। স্মৃতির জানালায় ইলমি মজলিসগুলো ভেসে উঠত। মন কথা বলত আমার সাথে। জিজ্ঞাসা করত, আবারও কি আমাকে আশাভঙ্গের করুণ বেদনা বহন করতে হবে! আবারও কি আব্বার সাথে লজ্জাবনত মুখে মাঠে ফিরে যেতে হবে! শুয়ে-বসে এসবই ভাবতাম। কিন্তু কোনো উত্তর ছিল না আমার কাছে। মনকে তবু প্রবোধ দিতাম। কল্পনার রাজ্যে জ্বেলে রাখতাম নিভু নিভু আশার আলো। আর নামাজ পড়ে অন্তরের গহীন থেকে মালিকের দরবারে হাত উঠাতাম! সে বছর আমাদের অঞ্চলে একটা ঐতিহাসিক জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কারণে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। প্রাণহানি ঘটে বহু মানুষের।

ঘোর অমানিশায় পথের দিশা

দেখতে দেখতে রমজান মাস এসে পড়ে। পরবর্তী বছর কোথায় যাওয়া যায়- এ নিয়ে আমি ও ভাই ইয়াকুব প্রায়ই আলোচনা করতাম। কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তেও স্থির সিদ্ধান্ত তখনো নেওয়া হয়ে ওঠেনি—এমন অবস্থায় আমাদের সামনে আল্লাহ তায়ালা একটি পথ খুলে দিলেন। মাওলানা হারুন বাবুনগরী[২৬] সাহেব—বাবুনগর

---

[২৬]. বিংশ শতাব্দীর আলোকোজ্জ্বল উদ্ভাসিত প্রদীপ্ত নক্ষত্র, গাঙ্গুহি সিলসিলার আলোকিত ব্যক্তিত্ব, কালজয়ী, ক্ষণজন্মা, মহাপুরুষ, আরিফে রব্বানি, মুরশিদে আজম আল্লামা হারুন বাবুনগরী রহ.।

তিনি ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম, ফটিকছড়ি, বাবুনগর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাফল্যমণ্ডিত বর্ণাঢ্য জীবনের বিশালত্ব এতই বিস্তৃত, যা লিখে বলে শেষ করা মুশকিল। তিনি শাইখুল মাশায়িখ হজরত জমিরুদ্দীন রহ.-এর সুযোগ্য শাগরেদ ও মুরিদ এবং হজরত মুফতি আজিজুল হক সাহেব রহ.-এর বিখ্যাত ও প্রথম খলিফা। তিনি দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারি মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুফি আজিজুল হক রহ.-এর গর্বিত সুযোগ্য পুত্র। তাঁর বংশ জ্ঞানগরিমা ও মর্যাদা-সম্মানের দিক দিয়ে অত্যন্ত উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত। আল্লামা হারুন বাবুনগরী রহ. তাঁর আধ্যাত্মিক অভিভাবক জমিরুদ্দীন রহ.-এর বিশিষ্ট মুরিদ হওয়ার ফলে সে যুগে তাকে 'বড়পির ও আধ্যাত্মিক অভিভাবক ও বাগ্মী বক্তা ' নামেই ডাকত সবাই। নামের চেয়ে এই উপাধিই বেশি প্রসিদ্ধ ছিল তাঁর। হজরত বাবুনগরী সাহেব রহ.-এর সন্তান, ভাইয়ের সন্তান, নাতি-নাতনি, জামাতাগণের প্রায় সবাই-ই বিজ্ঞ তেজস্বী আলিম ছিলেন।

তিনি ১৮ আগস্ট ১৯৮৬, সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় চট্টগ্রাম মেডিকেয়ার ক্লিনিকে ইনতেকাল করেন। পরদিন মঙ্গলবার সাড়ে ১১টায় তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।==

মাদরাসার[২৭] প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম—আমাদের এলাকায় প্রায়ই ওয়াজ করতে আসতেন। বাড়ির সাথেই একটি ছোট পুকুর ছিল। আব্বাজান মেহমানদের জন্য খনন করে রেখেছিলেন। সম্ভবত আগেও এর কথা আলোচনা করেছি। পরবর্তীতে যখন দেখা করতাম, আল্লামা হারুন সাহেব এই পুকুরের কথা বারবার জিজ্ঞাসা করতেন! একবার মাওলানা হারুন সাহেব রমজানের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিনে আমাদের এলাকায় এলেন। পূর্বপরিচয়ের সুবাদে আমাদের দুজনের খোঁজখবর নিলেন। আমরা সবকিছু খুলে বলার পর উনি আফসোস করে বললেন, মুফতি সাহেবের বারণ সত্ত্বেও উনারা কেন যে সরকারি সহযোগিতা নিতে গেলেন!! এই ঝরে-যাওয়া-ছেলেগুলোর দায়িত্ব এখন কে নেবে! এসময় আফসোসের করুণ সুর উনার কণ্ঠে ভেসে ওঠে। আমাদের দুজনের মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে মসজিদের এক কোণে এনে বসালেন। এরপর জেনে নিলেন বিগত বছরগুলোর পড়াশোনার আদ্যোপান্ত। আমার আব্বাকে হুজুর খুব মহব্বত করতেন। আব্বা জাকের ছিলেন। মধ্যরাতে উঠে জোরে জিকির করতেন। হারুন সাহেব হুজুর, সুলতান সাহেব নানুপুরি[২৮] হুজুর মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িতে এলে তারাও আব্বার শোগল[২৯] দেখতেন। ফলে আব্বার ব্যাপারে তাদের একটা নেক ধারণা ছিল। গল্পের মাঝে

== নামাজের ইমামত করেন তাঁর বড় পুত্র জামিয়া বাবুনগরের বর্তমান মুহতামিম আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী। জামেয়ার দক্ষিণপার্শ্বে মাকবারায়ে হারুনীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

[২৭]. আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর সংক্ষেপে বাবুনগর মাদরাসা। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার বাবুনগরে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী ও সুপরিচিত বৃহত্তর কওমি মাদরাসা। আল্লামা হারুন বাবুনগরী ১৯২৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

[২৮]. বাংলাদেশের ইতিহাসে মহাপুরুষদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন হজরত সুলতান আহমদ নানুপুরি রহ.।

হজরত নানুপুরি সাহেব রহ. প্রাথমিক দীনি শিক্ষা স্বদেশে বিখ্যাত লাল মিয়া সাহেবের নিকট কাফিয়া পর্যন্ত অর্জন করে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন। দেওবন্দে তাঁর ওস্তাদবৃন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শাইখুল ইসলাম হজরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানি রহ. (মৃত্যু- ১৩৭৭ হিজরি)।

লেখাপড়া শেষ করে প্রথমে নাজিরহাট মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এরপর দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর জামিয়া বাবুনগরে শিক্ষকতা করেন। এরপর পটিয়ার হজরত মুফতি সাহেবের রহ. ইঙ্গিতে নানুপুরি সাহেব হুজুর নানুপুর মাদরাসায় তাশরিফ নিয়ে যান। তাঁরই ইখলাস, রুহানিয়াত, অক্লান্ত সাধনা এবং সুদক্ষ পরিচালনার বদৌলতে সেদিনের মাদরাসাটি আজ জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নামে দেশের একটি প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ দীনি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত হজরতের একটি অবিস্মরণীয় অবদান এবং সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বাকি থাকবে ইনশাআল্লাহ।

১৬ আগস্ট ১৯৯৭ ইং, রোজ শনিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে তাঁর প্রতিষ্ঠানের নিজ কক্ষে ইনতেকাল করেন।

[২৯]. তাসাওউফের জগতে নানারকম আমলের ব্যস্ততাগুলো এই পরিভাষায় পরিচিত।

হারুন সাহেব হুজুর আমাকে হঠাৎ বাবুনগরে এসে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমরা তো খুশিতে আটখানা; যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! কিন্তু আব্বার কথা ভেবে পরক্ষণেই আবার আমার মুখ শুকিয়ে গেল। হুজুর আঁচ করতে পেরে বললেন, তোমার আব্বাকে আমি বুঝিয়ে বলব। ছেলে দীন শিখবে, এ তো মহা আনন্দের কথা। বাঁধ সাধবে কেন! তোমরা শাওয়ালে না এসে রমজানেই এসে যাও! জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। এখন কীভাবে যাব! গিয়ে করবই-বা কী! আমাদের চাহনিতে জিজ্ঞাসা লক্ষ করে হুজুর বললেন, তোমাদের তো পড়াশোনার অনেক ঘাটতি হয়ে গেছে। এই মাসে পরিশ্রম করে একটু এগিয়ে নাও। ছুটির পর বোঝা যাবে, তোমরা কোন শ্রেণিতে পড়ার উপযুক্ত। সে হিসেবেই আমরা তোমাদের ভর্তি নিয়ে নেব। এখন এই অবস্থাতেই চলো তোমরা!

সংক্ষেপে এই ছিল আমার বোয়ালিয়া হোসাইনিয়া মাদরাসা থেকে বিদায় নেওয়ার পেছনের গল্প!

বাবুনগরের সফর

আব্বাজানকে সবিস্তারে জানানো হলে আব্বা সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি প্রদান করেন। আমরা অত্যন্ত খুশিমনে আব্বাজানের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে হুজুরের সাথে বাবুনগরের[৩০] পথ ধরলাম। তখন রেলে চলাফেরা করতে হতো। নাজিরহাটে[৩১] নেমে আবার ভ্যানে বা হেঁটে বাবুনগর। হুজুরের সাথে মাদরাসায় পৌঁছতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল।

পরদিন সকালে হুজুর আমাদের দুজনকে নিয়ে নাজিম সাহেবের কাছে গেলেন। আব্বাকে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সাথি হিসেবে পরিচয় দিয়ে বললেন, এদের দুজনকে ভর্তি করে নিন। এই মাস এরা এখানেই থাকবে। এদের ভালো খাওয়াবেন। ভালো ঘরানার ছেলে এরা। হুজুরের এই কথার পর সেই মাসে আমরা খুব ভালো খাতির পেতে লাগলাম। একদম খাঁটি ঘি, মধু ও দুধ দিয়ে সাহরি-ইফতারি ভালোই চলে যেত।

---

৩০. চট্টগ্রামের নাজিরহাট পৌরসভার একটি অঞ্চল।

৩১. নাজিরহাট বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটি পৌরসভা। হালদা নদীর পাড়ে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরটি উত্তর চট্টগ্রামের অন্যতম প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ১৯৩০ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃক নাজিরহাট ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রেল লাইনের সাথে সংযুক্ত হয়। আঞ্চলিক মহাসড়ক R১৬০ (৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ) হাটহাজারি পৌরসভা থেকে নাজিরহাট পৌরসভা এবং ফটিকছড়ি পৌরসভার উপর দিয়ে খাগড়াছড়ি গিয়ে পৌঁছেছে। ২০১৪ সালের ২ জুন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর ১০৯তম বৈঠকে এ পৌরসভার অনুমোদন দেওয়া হয়।

হুজুর নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন আমাদের। নাজিম সাহেবের নাম ছিল হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান (হাটহাজারি)। উনি হাট-বাজার, বোর্ডিং ও ক্যাশের দায়িত্ব পালন করতেন। আর পড়াশোনার জন্য হারুন সাহেব হুজুর আমাদের জন্য তার সুযোগ্য পুত্র আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীকে নির্ধারণ করে দিলেন।![৩২]

আমার পরম শ্রদ্ধেয় উসতাদ! উনি সে বছরই দেওবন্দ থেকে উচ্চতর পড়াশোনা সমাপ্ত করে ফিরে এসেছিলেন। তরুণ উদ্যমী মাওলানা তখন তিনি। আমাদেরকে হিদায়াতুন নাহু[৩৩] পড়াতেন। সারা মাসে প্রায় অর্ধেকের মতো পড়া হয়ে যায়। রমজানের ২৯তম সন্ধ্যায় আমরা দুজন হারুন সাহেব হুজুরের কামরায় গেলাম। ঈদের ছুটিতে বাসায় যেতে চাচ্ছি, কাচুমাচু হয়ে জানালাম। হুজুর হেসে পড়াশোনার

---

৩২. আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী (জন্ম ১৯৩৫) একজন বাংলাদেশি ইসলামি পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ, হানাফি সুন্নি আলিম এবং বাংলাদেশে দেওবন্দি আদর্শ প্রচারকদের অন্যতম। তিনি আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগরের বর্তমান মুহতামিম।তিনি ১৯৩৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী বাবুনগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহাসিক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

হজরতের শৈশব কাল কাটে সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে। দেশের খ্যাতিমান বুজুর্গ এবং বিজ্ঞ আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণের সুবাধে বেশিরভাগ সময় তিনি পিতার সাথে মাদরাসায় কাটাতেন। তিনি নাজেরা খানা থেকে জামাতে চাহারুম পর্যন্ত জামিয়া বাবুনগরে পড়াশোনা করেন। অতঃপর তিনি দারুল উলুম হাটাহাজারিতে ভর্তি হয়ে তথায় হিদায়া আওয়ালাইন সম্পন্ন করেন। উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের উদ্দ্যেশ্যে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে গমন করেন এবং দেওবন্দে পুনরায় হিদায়া আওয়ালাইনের জামাতে ভর্তি হন এবং মধ্যবর্তী সময়ে ১ বৎসর ফুনুনাতের কিতাব পড়েন এবং হাদিস প্রভৃতির শিক্ষা অর্জনের পর ১৯৫৯ ইংরেজীতে কৃতিত্বের সহিত দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন।

সেখানে তিনি হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. এর নিকট হিদায়া আখেরাইনের সর্বশেষ দরস গ্রহণ করেন এবং সৈয়দ মাওলানা ফখরুদ্দীন রহ. এর কাছে বুখারি শরিফ, আল্লামা ইবরাহিম বালইয়াবীর নিকট মুসলিম শরিফ ও তিরমিযী শরিফ এবং আল্লামা ফখরুল হাসান সাহেবের নিকট আবু দাউদ শরিফ, মাওলানা জহির আহমদ সাহেবের নিকট তহাবি শরিফ ও মাওলানা বশির আহমদ সাহেবের নিকট মুওয়াত্তা মুহাম্মদ পড়েন।

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আপন পিতা আরেফে রব্বানি আল্লামা শাহ হারুন বাবুনগরীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া বাবুনগরে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

মুফতি আমিনী রহ. জীবদ্দশায় তিনি ইসলামি ঐক্যজোট এবং ইসলামি আইন বাস্তবায়ন কমিটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। হাজার হাজার আলিম ওলামার শিক্ষক, দেশের শতাধিক মসজিদ মাদরাসার সদরে মুহতামিম এবং মোতাওয়াল্লি সহ বাংলাদেশের ইসলামি অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী।

৩৩. আলিম সিলেবাসে আরবি ব্যাকরণের একটু গুরুত্বপূর্ণ ক্ল্যাসিক্যাল গ্রন্থ।

অগ্রগতির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সব শুনে বললেন, শাওয়ালের আট তারিখে চলে আসবে। কথামতো আমরা ঈদের ছুটি কাটিয়ে আবার মাদরাসায় এসে গেলাম। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবার পরীক্ষা নেওয়া হলো আমাদের। সার্বিক দিক বিবেচনায় আমাদেরকে আরো এক বছর হিদায়াতুন নাহু পড়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিলাম উনাদের মূল্যবান পরামর্শ। পরবর্তীতে আরবি ভাষার কঠিন কঠিন সব কিতাব অধ্যয়নের সময় এই একবছর অতিরিক্ত পড়ার যে উপকারিতা, তা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমার উসতাদবৃন্দকে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী বিনিময় দান করুন। আমিন।

বাবুনগরে আনুষ্ঠানিক যাত্রা

বাবুনগরে এটা ছিল আমাদের প্রথম বছর। আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ সাহেবেরও এটি প্রথম বছর ছিল। আমাদের ছাত্র হিসেবে, উনার উসতাদ হিসেবে। আমাদের ঘণ্টা উনিই নিতেন। আমি উনার সব আলোচনা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারতাম। খুব জলদি উনার আব্বাজানের মতো উনার সাথেও আমার একটা আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। এদিকে ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অর্জন করি। বড় মাদরাসাতেও আমি ভালো করতে পারব, এমন একটা আত্মবিশ্বাস এ সময় অন্তরে গেঁথে যায়। বছরের বাকি সময়টা আরো ভালোভাবে পড়াশোনা করলাম। এই পরিশ্রমসাধ্য পড়াশোনার ফল পেলাম বার্ষিক পরীক্ষায়। আল্লাহর মেহেরবানিতে আমার শ্রেণিতে তো বটেই, সারা মাদরাসার মেধাতালিকায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। ফল ও পুরস্কার ঘোষণার দিন আব্বাজানকেও দাওয়াত করা হলো। আব্বা তাঁর এক সাথির সাথে মাদরাসায় বেড়াতে এলেন। তখন পর্যন্ত আব্বাজান আমাকে তেমন খরচাদি দিতেন না। লুকিয়ে-ছাপিয়ে আম্মাই দিতেন। ফল ঘোষণার সময় দেখা গেল প্রায় সকল মারহালা ও বিষয়ে ছেলে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, আব্বা একটু আশ্চর্যই হলেন। জানতেন আমি মেধাবী; কিন্তু এত আগ্রহ নিয়ে আমি পড়াশোনা করি, এটা হয়তো তিনি ভাবেননি। অনুষ্ঠানের পর উসতাদবৃন্দও আমার মেধা ও আখলাকের প্রশংসা করলে আব্বা খুব খুশি হন। এরপর থেকে আমার মাসিক খরচসহ বাড়তি কিছু হাতখরচাও আব্বাজানের পক্ষ থেকে পেতে শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ!

বাবুনগরে সময় ভালোই কাটছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি সাথিদের সাথে অবসরটুকু ব্যয় করতাম। আমাদের সময় রেওয়াজ ছিল, ভালো ফলের অধিকারীই সবসময় নাশতা খাওয়াবে। এই কারণে আমার পকেট খরচ অনেক বেশি হয়ে যেত।

কখনো কখনো আমাকে কর্জও করতে হতো। প্রথমবার যখন ভালো ফল করি, বিকেলে সাথিরা আমাকে নিয়ে ফকিরহাট বাজারে নাশতা খেতে চলে যায়। এরই মধ্যে আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ সাহেব রহ. কোত্থেকে যেন সেখানে এসে পড়েন। আমাদের এভাবে একসাথে বসে নাশতা খাওয়ার কারণ শুনে উনি খুব খুশি হয়ে বলেন, আমি বিল দিয়ে দেব। তোমরা যা ইচ্ছা খেয়ে চলে যাও। আমার এই হজরত আমাকে খুব মহব্বত করতেন। জাযাহুল্লাহ।

অব্যক্ত বোঝা

একপর্যায়ে এসে আমার এই অতিরিক্ত খরচ আমাকে কিছুটা বিপদেও ফেলে দেয়। বাড়তি খরচ আমার উপর বোঝা হয়ে যাচ্ছিল। ভাবতে থাকি বিষয়টা নিয়ে। এক ছুটিতে এসে সিদ্ধান্ত নিই আমাকে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে হবে। আব্বার সাথেও পরামর্শ করি। আব্বাও কিছুটা একমত পোষণ করেন। সামনে থেকে সতর্কতার সাথে পকেট খরচ চালানোর কথা বলেন। সাথে এও বললেন যে, কাছেই জিরি মাদরাসা। তুমি মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ সাহেবের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে জিরিতে এসে ভর্তি হও। বাড়ির কাছেই থাকতে পারবে। আব্বার সম্মতির ফলে তাই সিদ্ধান্ত নিয়েই নিলাম। জিরি মাদরাসাতেই যাব। আমার বাড়ি থেকে দূরত্বের হিসেবেও এটি নিকটেই হয়। আবার অবস্থানের দিক থেকে দেশের অন্যতম বৃহৎ ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। মাদরাসায় এসে হারুন সাহেব হুজুরকে জানালাম। উনি বললেন, দেখো! যেতে চাইলে যাও। আসলে মাদরাসাগুলো তো কবুতরের বাসার মতো। কবুতর আসবে যাবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু পড়াশোনা ঠিকভাবে করবে। কোনোরকম গাফলতি করবে না। আমাদের দোয়া আছে তোমার সাথে।

খুশিমনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম নতুন প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য; কিন্তু আমার মুহসিন উসতাদ মুহিব্বুল্লাহ সাহেব খবর জানার পর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছিলেন না। আমি যেখানে জায়গির থাকতাম উনি সেই এলাকায় জুমা পড়াতেন। বিদায়ের জন্য একদিন দেখা করতে গেলাম। উনি জুমার পর আমাকে নিয়ে বসলেন। নারাজি প্রকাশ করলেন। কেন যাবে তুমি? কী সমস্যা আমাকে বলো! ভালোই তো ছিলে এখানে। তুমি যেতে চাইলে যাও। কিন্তু আমার অনুমতি নেই। থাকলে ভালো লাগত। এই ধরনের কিছু আবেগি কথা বলে গেলেন। হতবিহ্বল আমি নীরব থাকি। মূলত উনি আমাকে খুবই মহব্বত করতেন। এজন্য আমার চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। যা হোক, কিছুটা অসন্তুষ্টির সাথেই হজরত আমাকে বিদায়ী দোয়া দিলেন।

স্নেহময় ভালোবাসা

আমার প্রতি আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী সাহেবের বিশেষ সুনজর ও মহব্বতের অনেক ঘটনা আছে। দুয়েকটি উল্লেখ করছি। একবার বাড়ি থেকে ট্রেনে বাবুনগর যাচ্ছিলাম। ভিড় ছিল প্রচণ্ড। বেখেয়ালে আমার ব্যাগ চুরি হয়ে যায়। ব্যাগে থাকা জামা, ছাতি, চাদর সবই একসাথে খোয়া গেল। আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি। মাদরাসায় এসে চুপটি মেরে থাকি। জামাতের সাথিরা বুঝতে পেরে চাপাচাপি করে ঘটনা জেনে নেয়। কীভাবে যেন মুহিব্বুল্লাহ সাহেবও বিষয়টি জেনে যান। উনি আমাকে ডেকে সবকিছু শোনেন। এরপর উঠে গিয়ে একটা ছোট্ট পয়সাভর্তি ব্যাংক এনে আমার হাতে ধরিয়ে দেন। বলেন, এটা নাও। হারানো সবকিছু আবার কিনে নিয়ো। পয়সা কিছু বাঁচলে ওটা হাদিয়া! আহ! কত মহব্বত করতেন! আমি পয়সা গুনে দেখলাম, সেই এতটুকু থলেতে বেশ কয়েকটি আট আনা, চার আনা রয়েছে। পঞ্চাশ রুপির মতো হয়েছিল সব মিলিয়ে। অথচ আমার হারানো জিনিসগুলোর মোট মূল্য এত বেশি ছিল না।

আমার উপর উনার ভরসাও ছিল বেশ। যখন আমাদের কুতবি পড়াতেন, তখন ক্লাসে আমি ইবারত পড়তাম। উনি কিছুক্ষণ শুনে বলতেন, ‘বুঝে এসেছে আবদুস সালাম?’

জি উসতাদজি।

আচ্ছা ঠিকাছে, ওদের বুঝাও তাহলে।

সহপাঠীরা হয়রান হয়ে বলত, ‘উসতাদজি! আপনি তো নিজে কিছু বললেনই না। সে আমাদের কী বুঝাবে?’

কিন্তু তারাও জানত, আবদুস সালাম পড়া বুঝেছে বলেই উসতাদজি তাকে একক তাকরারের অনুমতি দিয়েছেন!

আজও হুজুর আমাকে সেই ছোটবেলার মতো মহব্বত করেন। এখনো দেখা হলে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। বুরুমছড়ার মাদরাসাটা আমাকে এক উসতাদ দিয়েছেন আমানতের জিম্মাদারিতে। সেখানে প্রতিবছর হুজুর আসেন। এবারও এসেছিলেন। আমার অসুস্থতা নিয়ে একটু মজাও করলেন। বললেন, ‘দেখো অবস্থা! ছেলে আমার বুড়ো হয়ে গেছে। বাপ হয়ে আমি এখনো জওয়ান আছি।’

আলহামদুলিল্লাহ, আমার সাথে তাঁর এমনই সম্পর্ক! আল্লাহ তায়ালা উনাকে আমৃত্যু সুস্থ রাখুন। আমিন।

যাদের মাধ্যমে দুনিয়ায় আসা

টুকরো স্মৃতিগুলো নিয়েই যেহেতু খণ্ডিত আলাপ করে যাচ্ছি, আমার পূর্বপুরুষদের নিয়েও বলি একটু!

আসলে আমার নানা-দাদা দুজন সম্পর্কে চাচাত ভাই ছিলেন। একসাথেই থাকতেন। জমিজমাও পাশাপাশি ছিল। ২ কানি জমি কেনা হলে তারা প্রত্যেকে এক কানি করে ভাগ করে নিতেন। আমাদের সব জমিজমা আজও এমন অবস্থাতেই রয়ে গেছে।

নানার পরিবার নিয়ে একটু বলি। আমার তিন মামু আর চার খালা ছিলেন। বড় মামু মাওলানা ফজলুর রহমান আলিমে দীন ছিলেন। মাওলানা শফিক সাহেব পুকুরিয়বীর[৩৪] মুরিদ। বড় মামু পটিয়ার নায়েবে মুহতামিম বোয়ালি হজরতের সাথি ছিলেন। দুজনে একসাথে আমাদের এখানে আসতেন। দাওরার বছর মামু বিয়ে করেছিলেন। অত্যন্ত মুত্তাকি মানুষ ছিলেন তিনি। বছরের শেষভাগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুখেই মারা যান মামু। মামী তখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। পরে তার গর্ভে এক ভাগ্নে হয়। এই ভাগ্নেও এক বছর পর মারা যায়। এরপর অন্যখানে বিয়ে হয়ে যায় মামীর।

আম্মা সে-সময় এগারো বছরের বালিকা। অন্য খালারও বিয়ে হয়নি তখন। আম্মার মুখে মামুর মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই শুনতাম। আম্মা বলতেন, যখন মামাজান অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন, তখন সবাই তাকে দেখতে আসে। মামু শয্যাশায়ী ছিলেন। একদিন আম্মা মামুকে মধুপানি খাওয়াতে যান।

মামু জিজ্ঞাসা করেন, কী এনেছ?

মধুপানি!

কেন?

মনে চাইল আপনাকে খাওয়াব।

আমাকে এগুলো খাইয়ে কী হবে এখন! আমি তো জান্নাতি শরাব পান করতে যাচ্ছি। এই তোমরা সবাই পর্দা করো। আমার মেহমান এসে পড়েছে। উনারা সবাই সুন্দর পোশাক, সুগন্ধী মেখে এসেছেন। তোমরা আমার কথা কেন শুনছ না!

আসলে উনি আখেরাতের জীবনের শুরুটা দেখতে পাচ্ছিলেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই শুরুর দিকে সেভাবে কেউ মানছিল না উনার কথা। পরে

---

[৩৪]. মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব খলিফা ছিলেন মাওলানা মুখলিসুর রহমান সাহেব ডলুকুলীয়বির। বাইয়াতের বিশেষ অনুমতিও ছিল তার।

উনি তাগাদা দেওয়ায় সবাই সরে পড়ে। শুধু আমি (আম্মাজান) ছোট মেয়ে হওয়ায় তাঁর কাছে যাই। তিনি আমাকে ডেকে দোয়া দেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। এরপর বলেন, যাও! আমার কাছে সম্মানিত মেহমান আছেন। কাউকে আসতে মানা করো। কিছুক্ষণ পর মামু সবাইকে আসতে বলেন। মাথার কাছে একজনকে সুরা ইয়াসিন পড়তে আদেশ করেন। আশপাশের সবাইকে আর-রহমান, আল-ওয়াকিয়া, আল-মুলক পড়তে নিজ থেকে বলে দেন। এভাবে ধীরে ধীরে কালামে পাক শুনতে শুনতে মামুজানের ইনতেকাল হয়। রহিমাল্লাহু আবদাহু!

মেজো মামু খুব দীনদার ছিলেন। উনিও শফিক সাহেবের মুরিদ ছিলেন। আমার আব্বা-আম্মাও সম্পর্কে চাচাত ভাইবোন ছিলেন। সে হিসেবে এই মামু আমাকে খুব মহব্বত করতেন। যেহেতু বড় মামুকে দেখিনি, এই মামুর স্মৃতিই আমার মানসপটে বেশি ভেসে আছে। আমার জন্মের সময়েও আমার আম্মা এই মামুর পক্ষ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছিলেন। আমাদের রেওয়াজ অনুযায়ী বোনের সন্তান জন্মদানের সময় ভাইয়েরা বড়সড় হাদিয়া দিত। সাধারণত কোমরে চাঁদির চেইন দেওয়া হতো, অথবা এই ধরনের হাদিয়াই দেওয়া হতো বেশি। আমার আম্মা মামুকে জিজ্ঞাসা করেন আমার ছেলেকে কী হাদিয়া দিবা, ভাইয়া? উনি বলেন, তুমিই বলো। আম্মা একটা গাভীর আবদার করে বসেন। সাধারণ দামি হাদিয়া কতদিন ব্যবহার্য থাকে, তা তো বলা যায় না। কিন্তু গাভী দিলে সেটা আমার ছেলের সাথে বড় হবে। আপনার কথা বেশিদিন মনে পড়বে। পরে বড় হলে একে আমরা বিক্রি করে দেব। তখন আমার প্রয়োজনীয় কিছু উপকারও হবে।

মামু আম্মার এই আবদারে খুব খুশি হন। তুমি ভালো একটা আবদার করেছ! এরপর একটি সবল গাভী মামু আমাদের বাড়িতে দিয়ে যান। মামুর দেওয়া সেই গাভীও আমার জন্মের পর থেকে আমার সাথে বড় হতে থাকে!

এই মামুকে আমরা নাগুর বাপ নামে ডাকতে শুনেছি। উনার ভালো নাম আমার মনে নেই। আমার বয়স যখন ছয় কি সাত বছর, তখন এই মামুও ইনতেকাল করেন।

আরেকবারের ঘটনা। উনার এক ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে সবার জন্য কাপড় কিনে আনলেন। সেই কাপড়ের বিরাট পোটলা নিজের বাড়িতে না এনে রাখলেন আমাদের বাড়িতে। আমাকে কোলে বসিয়ে পোটলা খুলে বললেন, নাও! পছন্দ করো। তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা নিয়ে নাও। এরপর অন্যরা নেবে। এতে আমি বড্ড খুশি হয়েছিলাম। যেহেতু ছোট মানুষ ছিলাম, খুশির সীমাটা সত্যিই অনেক বেশি ছিল। আসলে জানেন কি ভাই, কাউকে গুরুত্ব দিলে মানুষের কাছে তা বড় বিষয় হয়ে ওঠে।

আরেকবারের ঘটনা। আব্বা রুস্তম হাটের বাজারে যাচ্ছিলেন। আমিও যাওয়ার বায়না ধরেছিলাম। কিন্তু কাজের চাপ থাকায় নিয়ে যাননি। কিন্তু আমি ঠিকই পিছে পিছে চলে যাই। বাজারে যাওয়ার পথে একটা বাঁশের সাঁকো পড়ত। ওটা দুহাতে বাঁশের রেলিং ধরে ধরে পার হতে হয়। কিন্তু আমি ছোট ছিলাম বিধায় অত উঁচুতে হাত দিতে পারছিলাম না। তবু সাহস করে সামনে এগিয়ে যাই। মাঝপথে এসে নিচে তাকিয়ে দেখি অনেক নিচ দিয়ে নদী বয়ে যায়। বালকমনে স্বভাবতই ভয় ঘিরে ধরে। এরই মধ্যে আমার মেজো মামু বাজার থেকে এসে পড়েন। আবদুস সালাম থামো! চিৎকার শুনে মাথা তুলে তাকাই। দেখি মামু হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। উনার মাথায় একটা টুকরির মতো ছিল। সেটি নামিয়ে উনি দৌড়ে এসে আমাকে কোলে তুলে নেন। মৃদু স্বরে বকা দেন। তুমি একা এসেছ কেন? যদি কিছু হয়ে যেত! চলো বাড়ি যাই।

কোথায় যাচ্ছিলা?

আব্বুর কাছে।

আব্বু তো বাজারে।

এই দেখো তোমার জন্য তরমুজ কিনেছি। চলো! এই বলে আমাকে নিয়ে আমাদের বাসায় গেলেন। আম্মাকে বকা দিলেন, কোথায় তোমার ছেলে? ওকে একা ছেড়ে দিয়েছ! ও তো বাজারে চলে যাচ্ছিল। এই নাও তরমুজ খাও বলে অর্ধেক তরমুজ আমাদের কেটে দিলেন। আর বাকিটুকু নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। আম্মাকে মামু বলতেন, এই ভাগিনাকে মাদরাসায় দিও। আমরা তো বেশিদূর পড়তে পারিনি। একে তোমরা পড়াইও। আজও তাদের স্মৃতি দুচোখে ভেসে ওঠে। জাযাহুল্লাহ আহসানাল জাযা!

আরেকজন ছোট মামু ছিল। এই মামু আরেক পক্ষের নানির সন্তান। উনিও আমাদের এখানে বড় হয়েছিলেন। পরে বিয়ে করেন দূর এলাকায়। তাকে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। বড় মামুর ভাগের অংশও উনি পেয়েছিলেন। কারণ বড় মামুর কোনো সন্তান বেঁচে থাকেনি।

নানার নাম তো বলা হয়নি। উনাকে সবাই চান মিয়াঁ বলে ডাকত। নানির নাম মনে নেই। একজন বড় খালা ছিলেন। আমার ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত উনি জীবিত ছিলেন। উনার দুই মেয়ে ছিল। আরেক খালার ছিল দুই মেয়ে তিন ছেলে। খালু খুব দীনদার ছিলেন। বাবরি ছাঁটে সুন্নতি চুল রাখতেন। খালাও আমাকে খুব মহব্বত করতেন। আমি ছুটিতে উনাদের বাসায় গিয়ে গিয়ে থাকতাম। সকালে শুধু আমার জন্য বিশেষ নাশতা হতো। মূলত ওই এলাকায় সকালে নাশতার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু খালাজান আমার জন্য সকালে উঠে সুস্বাদু নাশতা তৈরি করতেন।

করাচিতে মরহুম আব্বাজান ও খালুজানের বারযাখি সফর

আব্বা আর খালু ততদিনে ইনতেকাল করেছেন। আমি নিয়ম করে উনাদের জন্য ঈসালে সওয়াব[৩৫] করতাম। কিন্তু মাঝেমধ্যে মনে হতো, উনাদের অবস্থা একটু যদি জানতে পারতাম! করাচিতে[৩৬] থাকতে আমি একটা স্বপ্ন দেখি। এক রাতে আব্বা আর খালুজান আমার স্বপ্নে এলেন। পরিধানে সাদা ধবধবে জামা। মাথায় পাগড়ি। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে আমার ঘরে। আমি উঠে বসে উনাদেরও বসতে দিই। অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করলাম। উনারা জানালেন আমরা ভালো আছি। তোমার হাদিয়া আমরা নিয়মিত পেয়ে থাকি। আজ ভাবলাম তোমার সাথে আমরা একটু দেখা করব। তাই রওনা দিলাম। কিন্তু মাঝখানে হিন্দুস্থান পেরোতে একটু দেরি হয়ে গেল। কাফেরদের গর্তগুলোতে এত আজাব হচ্ছে যে পাশ কাটিয়ে একেবেঁকে আসতে হলো। নাহলে দ্রুত এসে যেতাম। আমি তো হয়রান হয়ে তাকিয়ে ছিলাম! উনারা বলেন কী! মাটির নিচ দিয়ে উনারা বাংলাদেশ থেকে করাচিতে কীভাবে এলেন? সব রাস্তাই তো এখন বন্ধ![৩৭] উনারা আমার অবস্থা আঁচ করতে পেরে বললেন, এটা অনেক দ্রতগামী পথ। তুমিও একদিন আসবে এখানে। যা হোক! তোমাকে দেখে আমাদের ভালো লাগল। আমি চারপাশে তাকিয়ে দেওয়ার মতো কিছু না পেয়ে চা বানিয়ে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু উনারা হেসে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এর থেকেও অনেক ভালো রিজিক আমাদের আছে। তুমিই পান কোরো এই চা। এই বলে উনারা আমাকে সালাম দিয়ে বিদায় নিলেন। সেই মুহূর্তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি উঠে বসে খুবই প্রশান্তি অনুভব করি। আবার হিন্দুস্থানের খবরে খুব কষ্ট পেলাম এই ভেবে যে, মানুষগুলো বারযাখি[৩৮] জীবনে কত আজাবে রয়েছে!

আমি নিজে হজ করার পর আম্মার জন্য হজ করেছি। আম্মাকেও একবার স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি আমার পাঠানো হাদিয়াগুলো নিয়মিত পাও? মা হেসে জানিয়েছিলেন, হ্যাঁ বাবা! তুমি যা যা পাঠাও আমি সবই পাই। রহিমাহুমুল্লাহ!

---

৩৫. আখেরাতের জীবনে চলে যাওয়া মানুষদের জন্য সুন্নাহ সম্মত উপায়ে আমলের হাদিয়া প্রেরণ।

৩৬. কর্মজীবনে যখন আমি করাচিতে থাকতাম। (১৯৬৭-২০০০)

৩৭. তখন মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময় চলছে। সে সময় বেশ কয়েক বছর দুদেশের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বন্ধ ছিল।

৩৮. মৃত্যু পরবর্তী জীবন যেখানে সকলেই কেয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। ঈমান ও আমলের উপর নির্ভর করে মানুষের সাথে সেখানে আচরণ করা হবে।

মদিনায় আব্বাজান

আরেকবার আমি হজের সফরে মদিনায় অবস্থান করছিলাম। আমার সাথে দেওবন্দের মাওলানা মুহাদ্দিস (আল্লামা) নেয়ামতুল্লাহ আজমী[৩৯] সাহেবও ছিলেন। মদিনার জ্বরে পড়ে অসুস্থ ছিলাম ক'দিন। একদিন স্বপ্নে আব্বাজানকে দেখলাম। আব্বাও মদিনায় এসেছেন। আমার সাথে গল্প করার জন্য হাঁটতে বের হলেন। মদিনার রাস্তায় আমরা দুজন হাঁটছিলাম। আব্বা এহরামের কাপড়ে ছিলেন। আমিও। এক হোটেলের সামনে এসে ভাবলাম আব্বার সাথে চা পান করব। দুটো চায়ের জন্য বলতেই আব্বা বললেন, একটা নাও। আমি এখন পান করব না। হোটেল থেকে বের হতেই আজানের আওয়াজ কানে আসে। আব্বাকে বললাম চলুন নববিতে[৪০] নামাজ পড়ি। আব্বা বললেন আমি অন্যখানে পড়ব। তুমি এখানে পড়ো। সাক্ষাতের ইচ্ছা ছিল। হয়ে গেল। ভালো থেকো। এই বলে আব্বা চলে গেলেন। আমারও নিদ্রাভঙ্গ হলো পরক্ষণেই।

আব্বা জাকের ছিলেন। জোরে জিকির করতেন। নাওয়াফিল একটাও ত্যাগ করতেন না। বৈঠকখানায় নিয়মিত জিকিরের আয়োজন হতো। আব্বার সাথি ভাইয়েরাও আসতেন এখানে। বরেণ্য আলিম-ওলামা আঞ্চলিক ওয়াজ মাহফিলে এলে আমাদের এখানেই রাত যাপন করতেন। এর যে কী বরকত, আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি।

থাক সেসব কথা এখন!

বাবুনগর থেকে জিরির পথে

বাবুনগর থেকে জিরিতে চলে যাওয়ার জন্য আমি বাসায় এসে পড়েছিলাম। প্রথমে আব্বা উৎসাহ দিলেও শেষ মুহূর্তে এসে আব্বা একটু নারাজ হয়েছিলেন। বড় মাদরাসায় পড়ার শখে এই কাজ করেছিলাম কিনা! বাবুনগরী সাহেবকে কী জবাব দেবেন, এই সংকোচে আব্বা আমাকে জিরির শুরুভাগে টানা কয়েকমাস কোনো খরচ দেননি। পরে পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করার পর থেকে খরচ দেওয়া শুরু করেন। ততদিনে হারুন সাহেব ও মুহিব্বুল্লাহ সাহেবও আমার উপর রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর আব্বা পেছনের কয়েক মাসের খরচও দিয়ে দেন একসাথে! এই যে শুরু, আর কখনো বন্ধ হয়নি। করাচিতেও নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। অথচ আমার

---

[৩৯]. ভারতের বিখ্যাত দেওবন্দ মাদরাসার স্বনামধন্য উস্তাদ। উঁচুদরের মুহাদ্দিস ও ফকিহ।

[৪০]. নবীজির মসজিদ। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক মসজিদ। এখানে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ সওয়াবের কথা সহিহ হাদিসে এসেছে। এক হাজার রাকাত নামাজের সওয়াবের কথা এসেছে হাদিসে। —মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়াইদ।

তেমন প্রয়োজন হতো না তখন। এমনকি আমি যখন বেতন পাওয়া শুরু করি, তখনো সামান্য হলেও অর্থ পাঠাতেন। কখনো পরিবারের জন্য আমার থেকে পার্থিব কিছু প্রত্যাশা করেননি। দীনের জন্য যাকে ওয়াকফ করেছেন, তার থেকে দুনিয়াবি কিছু আশা করা অনুচিত—এটা আব্বা খুব ভালোভাবে বুঝতেন! এখন অবশ্য এই ধরনের ভাবনা ও অনুভূতি অভিভাবক মহল থেকে হারাতে বসেছে বলেই মনে হয়।

আবার ঘুরে দাঁড়ানো

এরপর জিরিতে আমার পড়াশোনা ভালোভাবে শুরু হয়। বোয়ালিয়া হোসাইনিয়া মাদরাসায় সাড়ে তিন বছর পড়ার পর বাবুনগরে চার বছর কাটাই। এরপর চলে আসি জিরিতে।

বাবুনগরের উসতাদবৃন্দ

এখানে আমি দেশের ও সময়ের সেরা উসতাদবৃন্দের সাহচর্য পেয়েছিলাম। আমার জন্য এটি ছিল অনেক বড় পাওয়া। এখানে আমার উসতাদদের মধ্যে সবার চেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী সাহেব। উনি শুরু থেকেই আমাদের খুব যত্ন নিয়েছিলেন। রোজার মাসেই হিদায়াতুন নাহু পড়ান। রোজার পরেও উনি একই কিতাব পেয়েছিলেন নতুন বছরের জন্য। ফলে আরেকবার কিতাবটি পড়া হয় উনার কাছে। অত্যন্ত ফায়দা পেয়েছিলাম এই দরসের ফলে। পরবর্তীকালে আরবি ভাষার উপর একটা দক্ষতা এসে যায় শুধু এই দুবছরের পরিশ্রমের ফলে।

বাবুনগরে প্রথম বছর

হিদায়াতুন নাহু পড়ি আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী সাহেবের কাছে। মানতিক আর নুরুল ইজাহ পড়া হয় মাওলানা কাসেম নানুপুরি হুজুরের কাছে। নানুপুরি সাহেবের কামরায় থাকতাম আমরা। মাওলানা কাসেম সাহেবের কামরা ছিল সুলতান নানুপুরি সাহেবের কামরার ঠিক পাশেই। সুলতান সাহেব বাবুনগরে পনেরো বছর দরস দিয়েছেন। বাবুনগরের সোনালি দিনগুলোয় উনি এখানে ছিলেন। শেষের দিকে উনি বুখারি-মুসলিম পড়াতেন। উনার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আমার। আমাদের বাড়িতেও আসতেন। থাকতেন। খুব জিকির করতেন। মাঝরাতে উঠে যেতেন। কিছুদিন উনার সাথে থাকার ফলে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আবদুস সালাম, উঠে যাও! এই মৃদু ডাক শুনেই উঠে যেতাম আমরা। আমাদের দেখাদেখি আমাদের কামরায় থাকা উসতাদদ্বয়ও উঠে যেতেন। ইবাদতে মনোযোগ হতো খুব। পড়াশোনাও

হতো খুব ভালোভাবে। কিন্তু নানুপুরি সাহেব চলে যাওয়ার পর অবস্থা আবার আগের মতো হয়ে যায়। আল্লাহওয়ালা মানুষদের সঙ্গ আসলে আমাদের জীবনভর প্রয়োজন হয়, যদি আপনি সত্যিই নিজেকে পরিবর্তন করতে চান।

ইলমুস সিগাহ, উসুলুশ শাশি, ফুসুলে আকবরি ও দিওয়ানে আলি আমরা পড়ি নুরুল হক সাহেব মারুফ দুওম সাহেব হুজুরের কাছে। উনি কাসেমি[৪১]। হাজি ইউনুস সাহেবের সাথি ভাই।

কাফিয়া পড়া হয় ইমামুন নাহু-খ্যাত মাওলানা সুলতান আহমদ ধর্মপুরি সাহেবের কাছে। মাওলানা মুসা সাহেবের জামাতা ছিলেন তিনি। মাওলানা মুসা সাহেব ছিলেন মাওলানা হারুন সাহেবের ভাই। আল্লামা জমিরুদ্দীন[৪২] সাহেবের খলিফা। উনাকে আমরা বুজুর্গ সাহেব বলতাম। উনার কাছে কানযুদ দাকাইক পড়ার সুযোগ হয়। কানযের কিছু অংশ পড়া হয় সুফি আবদুল জাব্বার ইমামনগরী সাহেবের কাছে। উনি

---

[৪১]. দেওবন্দ থেকে পড়াশোনা সমাপনকারীদের কাসেমি বলা হয়ে থাকে।

[৪২]. শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা জমিরুদ্দীন চাটগামি রহ.। দেশের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল ইলমি নক্ষত্র। জন্মেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর (১৮৭৮ সাল মোতাবেল ১২৯৬ হিজরি) শেষভাগে। চট্টগ্রাম জেলায় ছিল তাদের আদিনিবাস। কিংবদন্তি অনুযায়ী, তার পূর্বপুরুষ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় দিল্লি থেকে এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। দরিদ্র পিতার তৃতীয় সন্তান ছিলেন তিনি।

শিক্ষাজীবন আরম্ভের পূর্বেই জীবনের ব্যস্ততা তাঁকে ঘিরে ধরে। বেছে নেন প্রবাসের পথ। পাশের দেশ রেঙ্গুনে (বর্তমান মিয়ানমার) কর্মসূত্রে হিজরত করেন। কিন্তু মহামহিম যাকে সময়ের বুজুর্গ হিসেবে তৈরি করবেন, তিনি কেন এভাবে পড়ে থাকবেন! স্বপ্নযোগে একের পর এক সুসংবাদ আসতে থাকায় আপন উস্তাদের পরামর্শে একসময় পাড়ি জমান হিন্দুস্তান অভিমুখে। উপস্থিত হন গাঙ্গুহে, আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহির চরণতলে। হজরতেরই আদেশে এসময় তিনি তাসাউফের পাঠগ্রহণ মুলতবি করে দেওবন্দ চলে আসেন। গ্রহণ করেন ইলমে দীনের পাঠ। এরপর আবারো ফিরে আসেন গাঙ্গুহির দরবারে। দীর্ঘদিন সেখানে সাধনার পর অবশেষে শাইখ তাঁকে চারটি সিলসিলাতেই অনুমতি প্রদান করেন। এরপর দীনের আলো প্রচারে ধরেন মাতৃভূমির পথ।

দেশে ফিরে তিনি ধীরে ধীরে ইলম ও মারেফাতের আলো প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিবাহশাদির ইচ্ছা না থাকলেও সুন্নতের অনুসরণে পরবর্তী জীবনে পর্যায়ক্রমে সাতটি বিবাহ করেছিলেন! এই কারণে তার বংশও বিস্তৃত হয় বেশ! কর্মজীবনে অত্যন্ত সফল শিক্ষক ও পির হিসেবে খ্যাতি পান তিনি। নিজেকে গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সিলসিলার নুর লুকিয়ে রাখতে পারেননি। দলে দলে জ্ঞানপিপাসু তলাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে মারেফাতপিপাসু ওলামা, আমজনতার স্রোত বহমান ছিল তার দরবারে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইলম ও মারেফাতের সুধা বিলিয়ে গেছেন। তৈরি করেছেন অসংখ্য যোগ্য ও বিখ্যাত শাগরেদ। এজন্য তিনি শায়খুল মাশায়েখ উপাধিতে ভূষিত হন। আজ অবধি তাঁকে এই নামেই স্মরণ করে অত্র অঞ্চলের মানুষ।

শায়েখের শাগরিদদের মাঝে রয়েছেন আল্লামা মুফতি আযীযুল হক সাহেব, আলহাজ মাওলানা ইউনুস সাহেব, মাওলানা মুসা সাহেব বাবুনগরিসহ অসংখ্য বিখ্যাত ও আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ আলিম।

মহান এই জ্ঞানতাপস, শায়খুল মাশায়েখ ১৯৪০ সাল মোতাবেক ১৩৫৯ হিজরিতে রফিকে আলার নিকট গমন করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করেন।

দেওবন্দের বিখ্যাত উসতাদ আল্লামা এ'জাজ আলি সাহেবের[৪৩] শিষ্য ছিলেন। শুধু তাই নয়; বরং খুব নিকটতম শাগরেদ ছিলেন তার। শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি সাহেবের কাছে বুখারি ও তিরমিজি শরিফের পাঠ নিয়েছেন।

নাফহাতুল আরব আর শরহে তাহজিব পড়া হয় ইয়ার মুহাম্মদ হুজুরের কাছে। উনি মাওলানা হারুন বাবুনগরী সাহেবের জামাতা ছিলেন। দেওবন্দ ও নিউটাউন[৪৪] উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সৌভাগ্যবান ফারেগ তিনি।

আখলাকে মুহসিনি আমরা পড়ি মাওলানা মুহাম্মদ সাহেবের কাছে। কুদুরিও কিছু পড়া হয় হজরতের কাছে। কুতবি পড়েছি আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী সাহেবের কাছে।

শরহে বেকায়া পড়ি হাকিম মাওলানা উবাইদুর রহমান সাহেবের কাছে। তরজমাতুল কুরআনও উনার কাছে পড়া হয়। উনি মুফতি ফয়জুল্লাহ[৪৫] সাহেবের খলিফা ছিলেন। অত্যন্ত যশস্বী মুহাক্কিক আলিম ছিলেন তিনি।

---

[৪৩]. ইজাজ আলি আমরুহি (মৃত্যু ১৯৫৫) ছিলেন একজন হিন্দুস্তানি ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে দুবার প্রধান মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন : ১৯২৭ থেকে ১৯২৮ এবং তারপরে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। তাঁর 'নাফহাতুল আরব' বইটি দারুল উলুম দেওবন্দসহ অন্যান্য মাদরাসার সিলেবাসে পড়ানো হয়।

দারুল উলুমে তাঁর একাডেমিক জীবন ৪৪ বছর ধরে স্থায়ী হয়েছিল।

আমরুহি ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ এবং ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত দুইবার প্রধান মুফতির দায়িত্ব পালন করেন, তার অধীনে প্রায় ২৪,৮৫৫টি ফতোয়া লিপিবদ্ধ হয়েছে।। তিনি হুসাইন আহমদ মাদানির অনুপস্থিতিতে সহিহ আল-বুখারি পড়াতেন এবং জীবনের শেষ পর্বে তিনি বেশ কয়েক বছর তিরমিজির দ্বিতীয় খণ্ডও পড়াতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ শফি দেওবন্দি, মুহাম্মদ সেলিম কাশ্মিরি এবং রাশেদ আহমদ লুধিয়ানবি, মাওলানা মুফতি নুরুল হক সাহেব চাটগামী- মুফতিয়ে আজম, জিরি, বাংলাদেশ।

আমরুহি ১৯৫৫ সালে মারা যান এবং দারুল উলুম দেওবন্দের কাসেমি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আনজার শাহ কাশ্মিরি তার জীবনী তাজকিরাতুল ইজাজ লিখেছেন।

[৪৪]. জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া পাকিস্তানের করাচি, বানুরিটাউন শহরে অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। দারুল উলুম দেওবন্দ-এর আদলে সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে এই প্রতিষ্ঠানটি আল্লামা ইউসুফ বানুরি প্রতিষ্ঠা করেন। জামিয়াহ এবং এর শাখার বিভিন্ন বিভাগে প্রায় বারো হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে, যার মধ্যে ষাটটিরও বেশি দেশের বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে।

[৪৫]. মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ (১৮৯২-১৯৭৬) বাংলাদেশের ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। তিনি হাটহাজারির প্রধান মুফতি (মুফতিয়ে আজম) ছিলেন। মুফতি ফয়জুল্লাহ 'হামিউস সুন্নাহ মেখল' মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। মুফতি ফয়জুল্লাহ হাটহাজারি মাদরাসায় লেখাপড়া শেষে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ==

শরহে জামি পড়া হয় পটিয়ার নুরুল ইসলাম জাদিদ সাহেব হুজুরের কাছে।

প্রথমে জিরিতে তো আসলে যাওয়া হয়েছিল পরিবেশ দেখার জন্য, ভর্তির জন্য নয়। সেখানে এক সাথির সাথে সাক্ষাত করতে গেছিলাম। আমার বড় প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনে সে জিরির ব্যাপারে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এখানকার তালিম দেশের সেরা তালিম। উসতাদগণ সমকালের সেরা। সনদও[৪৬] সবচেয়ে উঁচু। সবদিক থেকে জিরিই আমার জন্য উপযুক্ত হবে বলে সে জানায়। গল্প করতে করতে অজুখানায় যাচ্ছিলাম। বারান্দায় মুফতি নুরুল হক সাহেবের সাথে দেখা। সাথিভাইটি তাকে আমার ব্যাপারে জানায়। উনি সাগ্রহে বলেন, তাহলে ভর্তি হচ্ছেন না কেন! অবশ্য বাবুনগরও ভালো ছিল। আপনার যেখানে মন চায় ভর্তি হয়ে যান। উনার এই আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমি জিরির ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। ভর্তির জন্য ফরম তুলে পূরণ করে জমা দিই। পরীক্ষা নিলেন আমাদের আনোয়ারা থানারই একজন উসতাদজি। পরীক্ষায় আমাকে ৪৯ নম্বর দেন। আমিই প্রথম ভর্তি হলাম সেবার।

এভাবে দেখতে দেখতে কয়েক বছর এখানে কাটিয়ে ফেলি। মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ সাহেব সন্দ্বীপী[৪৭] ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। উনাকে মাজমাউল বাহরাইন[৪৮] বলা হতো। উনি শাইখুল হিন্দের[৪৯] শেষ বছরের শাগরেদ। আবার শাহ

==দেওবন্দ থেকে ফিরে আসার পর হাটহাজারি মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সকল ধরনের ফতোয়া দিতেন বলে তাকে 'মুফতিয়ে আজম' খেতাব দেওয়া হয়। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত হাটহাজারি মাদরাসায় খেদমত করেন। এরপর মেখল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

মুফতি ফয়জুল্লাহ আরবি, ফারসি ও উরদু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই কাব্যচর্চা করতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি পান্দে ফায়েজ নামে একটি ফারসি কাব্য রচনা করেন। কবিতা ও আলোচনা মিলে তার গ্রন্থসংখ্যা অসংখ্য। ফারসি ভাষায় কবিতা লেখার পাশাপাশি মুফতি ফয়জুল্লাহ আরবি ও ফারসি ভাষায় অসংখ্য বই লিখেছেন।

তার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ফয়জুল কালাম, ফতোয়ায়ে ফয়যিয়্যা, হিদায়াতুল ইবাদ, পান্দেনামায়ে খাকি ইত্যাদি।

[৪৬]. হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিকতা নবীজি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াকে হাদিসশাস্ত্রে সনদ বলা হয়।

[৪৭]. আবদুল ওয়াদুদ সন্দ্বীপী – জিরি মাদরাসার দীর্ঘ ৬০ বছরের মুহাদ্দিস।

[৪৮]. দুই সাগরের মিলনস্থল

[৪৯]. মাহমুদুল হাসান (১৮৫১ -১৯২০) হলেন (১৮৫১- ৩০ নভেম্বর ১৯২০) ছিলেন উপমহাদেশের ইলমি প্রাণপুরুষ। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তার প্রচেষ্টা ও পাণ্ডিত্যের জন্য কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি তাকে 'শাইখুল হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করে। মাহমুদুল হাসান ১৮৫১ সালে ভারতের সাহারানপুর জেলার বেরেলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল মাওলানা যুলফিকার আলি। ==

==মিয়াজী মঙ্গলোরী ও মাওলানা মাহতাব আলির নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র হিসেবে তিনি সেখানে লেখাপড়া শুরু করেন। ১৮৭১ সালে শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর দারুল উলুম দেওবন্দের সহকারী শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। কিছুকাল পরে চতুর্থতম শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৮৭৫ সালে তিনি প্রধান শিক্ষক পদে সমাসীন হন এবং ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য কর্মজীবনের শুরু থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী কর্মসূচির অংশ হিসেবে তার নির্দেশে দিল্লি জামে মসজিদে ১৯১৩ সালে নাযযারাতুল মাআরিফ নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে কুরআনের প্রশিক্ষণ দান ও কুরআনের জীবন আদর্শের সাথে পরিচিত করে তোলা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা গড়ে উঠেছিল তা দূর করে তাদেরকে আন্দোলনের পক্ষে সহযোগী শক্তি হিসেবে লাগানো। এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে মাওলানা মাহমুদুল হাসান-এর সহযোগী ছিলেন হাকিম আজমল খান, নবাব ওয়াকারুল মুলকসহ আরো অনেকেই। এসময় মাওলানা মাহমুদুল হাসান তার শাগরেদ উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে দিল্লির যুব শক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে ড. আনসারি ও তার মাধ্যমে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা মোহাম্মদ আলির সাথে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এভাবে সিন্ধি উচ্চপর্যায়ের ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেন এবং সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। মাহমুদুল হাসান মূলত কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি 'আজাদ হিন্দ মিশন' নামে একটি বিপ্লবী পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন এর সর্বাধিনায়ক। এর সদর দপ্তর ছিল দিল্লিতে। এ পরিষদের মাধ্যমে তিনি ভারত স্বাধীন করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষের সহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ মুক্ত হতে না পারলে মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। তাই তিনি ভারতসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যাতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে তৎপর হয়ে ওঠে এজন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাই তিনি অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে গোপন সামরিক অভ্যুত্থানের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তুর্কি ও আফগান সরকারের সাথে এই ঐকমত্যে উপনীত হন যে, তুরস্কের বাহিনী নির্ধারিত সময়ে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে এসে ব্রিটিশ ভারতে আক্রমণ করবে এবং একই সময়ে ভারতবাসীও একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। এভাবে ব্রিটিশদেরকে উৎখাত করে তুর্কি বাহিনী বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মাহমুদুল হাসান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির একটি মিটিং দেওবন্দে মাহমুদুল হাসানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিংয়ে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারিতে পূর্বপরিকল্পিত গণঅভ্যুত্থান ঘটানো হবে। এসময় মাওলানা মোহাম্মদ আলি জওহার, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা শওকত আলি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ গ্রেফতার হন। এ সময় মাওলানা সিন্ধি ধরপাকড়ের আওতায় পড়বেন এই অনুমান করে মাহমুদুল হাসান সিন্ধিকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে তুমি কাবুলের পথ ধরো আর আমি হিজাযের পথে রওনা হয়ে যাচ্ছি। ==

সাহেবেরও[৫০] প্রথম বছরের শাগরেদ। পাকিস্তানে যাওয়ার সময় আমি উনার চিঠি নিয়ে যাই হজরত আল্লামা বানুরির[৫১] কাছে। আমার জন্য আরেকটি চিঠি দিয়েছিলেন মুহতামিম মুফতি নুরুল হক সাহেব রহ.। যাক, সেসব কথা আরেকদিন বলব!

==দুজনের দুটি বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশে ১৯১৫ সালে দু'দেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। মাহমুদুল হাসান এর উদ্দেশ্য ছিল হিজাদের পথে তুরস্কে পৌঁছা এবং তুরস্ক কর্তৃক ভারত আক্রমণের চুক্তিকে চূড়ান্ত করা। আর ওবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে কাবুলে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, কাবুল সরকারকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা। তাছাড়া আফগানিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাহমুদুল হাসানের ছাত্র ও ভক্তদের সংগঠিত করে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা। আফগানিরা স্বাধীনচেতা জাতি হলেও উপজাতীয় অঞ্চলসমূহে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাদেরকে সংগঠিত করার জন্য মাহমুদুল হাসান সিন্ধিকে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেছিলেন। মাহমুদুল হাসান মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীকে সঙ্গে নিয়ে ১৯১৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তুরস্কের উদ্দেশ্যে বোম্বাই থেকে রওনা করে জাহাজে জিদ্দা হয়ে অক্টোবরে গিয়ে মক্কায় পৌঁছান। মক্কা-মদিনা তথা হিজায ছিল তখন তুরস্কের শাসনাধীন। মক্কা পৌঁছে তিনি তুর্কি সরকারের নিযুক্ত হিজাজের গভর্নর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। এসময় মাহমুদুল হাসান গালিব বাসার কাছ থেকে আরো দুটি চিঠি লিখে নিয়েছিলেন। এই চিঠিতে আফগান সরকারকে এই মর্মে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল যে তুর্কি বাহিনী আফগানিস্তানের কোনো অংশে হস্তক্ষেপ করবে না। ইতিহাসে একে 'গালিব চুক্তিনামা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তী ইতিহাস সকলেই জানেন। রেশমি রুমাল পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। তারা গ্রেফতার হন। পাঠানো হয় তাদের কুখ্যাত মাল্টায়। ব্রিটিশ বন্দিত্বের সূত্র ধরে মাল্টা থেকে ফেরার পর তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় কয়েক মাস কেটে যায়। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি ইনতেকাল করেন।

[৫০]. সৈয়দ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ ইবনে মুয়াজ্জাম শাহ কাশ্মিরি ২৭ অক্টোবর ১৮৭৫ – ২৮ মে ১৯৩৩)। তিনি একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত ধীমান এই বালক পরবর্তীতে উম্মতের ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হন। আলিম উলামাদের কাছে এই নাম একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। শাইখুল হিন্দের ইলমি উত্তরাধিকারী। পরবর্তীতে তিনি দেওবন্দের প্রধান মুহাদ্দিস নিযুক্ত হয়েছিলেন। সমকালীন বিশ্বে তার মত হাদিস বিশারদ আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না।

সামসময়িক সকল ফিতনার অপনোদনে তিনি সর্বোচ্চ একাডেমিক জবাব প্রদান করেছিলেন। এই মহান মনীষী ১৩৫২ হিজরিতে ইনতেকাল করেন।

তার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখতে পারেন- https://bit.ly/3py6LJJ

[৫১]. মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরি (মে ১৯০৮-১ অক্টোবর ১৯৭৭) একজন পাকিস্তানি ইসলামি চিন্তাবিদ, বিখ্যাত হাদিস শাস্ত্রবিদ, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং পাকিস্তানের বেফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার সাবেক সভাপতি এবং সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি আলমী মজলিস তাহাফফুজ খাতম-এ-নুবুওয়াত-এর আমির হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইউসুফ বানুরি তার প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর পিতা ও মামার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি উচ্চতর ইসলামি শিক্ষার জন্য ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে গমন করেন। ==

উসতাদদের কাছে পঠিত প্রাথমিক কিতাবের তালিকা

পঠিত কিতাব	উসতাদের নাম
হিদায়াতুন নাহু, কুতবি	মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী সাহেব
মানতিক এবং নুরুল ইজাহ	মাওলানা কাসেম নানুপুরি সাহেব
ইলমুস সিগাহ, উসুলুশ শাশি, ফুসুলে আকবরি আর দিওয়ানে আলি	নুরুল হক কাসেমি সাহেব (দুওম হুজুর হিসেবে পরিচিত)
কাফিয়া	মাওলানা সুলতান আহমদ সাহেব ধর্মপুরি। (বুজুর্গ সাহেব হজরতের জামাতা)
কানযুদ দাকাইক	মাওলানা মুসা সাহেব, সুফি আবদুল জাব্বার সাহেব
শরহে তাহজিব, মিরকাত, নাফহাতুল আরব	মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ হুজুর
আখলাকে মুহসিনি, কুদুরি	মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব
শরহে বেকায়া, তরজমাতুল কুরআন (প্রথম পনেরো পারা)	হাকিম উবায়দুর রহমান সাহেব
শরহে জামি (সম্পূর্ণ)	নুরুল ইসলাম জাদীদ সাহেব

==অসাধারণ প্রতিভাধর এই আলিমে দীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ইলমি ব্যক্তিত্ব ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরির সুদীর্ঘ সান্নিধ্য লাভ করেন। অর্জন করেন অনন্য ইলমি উত্তরাধিকার। তাঁরই হাত ধরে হাদিস শাস্ত্রের উপর বিশেষ গবেষণার যুগ শুরু হয়।

করাচির একটি আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উপশহর, যার মূল নাম 'নিউটাউন'। বানুরির সম্মানে এর নামকরণ করা হয় আল্লামা বানুরিটাউন। তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত এই ইলমি কানন এখন সমগ্র বিশ্বের একটি সুপ্রসিদ্ধ ইসলামি গবেষণার আধার। যুগের প্রতিথযশা আলিমরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ অর্জন করেছেন। সমকালীন বিশ্বের আলিমসমাজে আল্লামা বানুরি ও বানুরিটাউন মাদরাসাকে ভিন্নভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই।

ইসলামাবাদে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে ১৯ অক্টোবর ১৯৭৭ তিনি সফর করেন। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখানেই তাঁর ইনতেকাল হয়ে যায়। করাচিতে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইলমি কাননে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে।

স্মৃতিতে জিরি

জিরিতে যে চার বছর ছিলাম, তখন খুব ভালো সময় কেটেছে। ওখানে কয়েকজন খুব মেধাবী ছাত্রভাই ছিলেন, যাদের মেধার প্রশংসা আমি আজও করি। এদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ফুজাইলুল্লাহ খাগড়িয়বী। উনি সবসময় ক্লাসে প্রথম হতেন। সকল উসতাদের প্রিয় পাত্র ছিলেন। অপরজন মাওলানা ইসামুদ্দীন মহেশখালী। উনি হতেন দ্বিতীয়। আর মাওলানা যায়নুল আবিদীন বরিশালী হতেন তৃতীয়। আমি যখন ভর্তি হই, তখন এই সিরিয়াল একটু ভেঙ্গে যায়। প্রথম পরীক্ষায় আমি দ্বিতীয় হলাম; কিন্তু বার্ষিকে হই তৃতীয়। তবে ফুজাইলুল্লাহ সাহেবকে কখনোই পেছনে ফেলা যেত না। পরবর্তী বছরগুলোয় তাই আমি সবসময় দ্বিতীয় হয়ে এসেছি।

দাওরার বছর হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে। ফুজাইল ভাইয়ের উপর জামায়াতে ইসলামির সদস্য হবার অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হতেই উনাকে বিদায় করে দেওয়া হয় মাদরাসা থেকে। অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে উনি জিরি থেকে চলে যান। এরপর গিয়ে ভর্তি হন পটিয়ায়। সেখানেও উসতাদবৃন্দ তাকে খুব মহব্বত করতেন। উনার আব্বাজান হজরত থানবির[৫২] মুরিদ ছিলেন। পটিয়ায় মাওলানা

---

[৫২]. আশরাফ আলি থানবি (জন্ম আগস্ট ১৯, ১৮৬৩; মৃত্যু জুলাই ৪, ১৯৪৩) ছিলেন একজন তেজস্বী আলিম, সমাজ সংস্কারক, ইসলামি গবেষক এবং পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতের থানাভবনের নিবাসী হওয়ার কারণে তার নামের শেষে 'থানবি' যোগ করা হয়। ভারত উপমহাদেশ এবং এর বাইরেরও অসংখ্য মানুষ তার কাছ থেকে আত্মশুদ্ধি এবং তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে তিনি 'হাকিমুল উম্মত' (উম্মাহর আধ্যাত্মিক চিকিৎসক) উপাধিতে পরিচিত। মুসলমানদের মাঝে সুন্নাতের জ্ঞান প্রচারের সংস্থা দাওয়াতুল হক তারই প্রতিষ্ঠিত।

তাঁর জন্ম ১২৮০ হিজরি (১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের থানাভবনে। হজরত হাফেজ হোসাইন আলি রহ.-এর কাছে তিনি কুরআন মাজিদ হিফয করেন। ফারসি ও আরবির প্রাথমিক কিতাবগুলো নিজ গ্রামে পাঠ করেন হজরত মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ থানবি রহ.-এর কাছে। ১২৯৫ হিজরিতে ইলমে দীনের উচ্চস্তরের পাঠ গ্রহণের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম যুগের ফারেগদের মাঝে তিনি ছিলেন অন্যতম। কেরাত ও তাজভীদের মশক করেন মক্কায়। শৈশব থেকেই তিনি মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে আসছিলেন। ১৩০০ হিজরিতে প্রথমে কানপুরের মাদরাসায়ে ফয়যে আমে মুদাররিস নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে জামেউল উলুমের প্রধান পরিচালকের আসন অলংকৃত করেন। তারপর থানাভবনের খানকাহে ইমদাদিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেই তাবলিগে দীন, তাযকিয়ায়ে নফস এবং রচনা ও লিখনির এমন বিশাল ও মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন সমকালে যার কোনো তুলনা পাওয়া যায় না।==

সিদ্দিক সাহেব হুজুর[৫৩] ফুজাইল ভাইকে খুব বেশি মহব্বত করতেন। উনি বলতেন, আমি ক্লাসে একজনের উদ্দেশেই তাকরির করি। এদিকে আমি ফুজাইল ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে দাওরার বছর প্রথম হয়ে যাই।

==এই বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ছিলেন হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ.। হজরত থানবি রহ.-এর ইলম ও দীনি প্রজ্ঞা ছিল অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃত। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এ কথার প্রমাণ বিদ্যমান। হজরত থানবি রহ.-এর রচনার পরিমাণের এই বিশালত্ব এবং মানুষের উপকার গ্রহণের এই ব্যাপকতার দিক থেকে উপমহাদেশে তাঁর নজীর খুব বেশি নেই। তাঁর ছোট বড় গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশ। তাঁর একটি রচনা 'বেহেশতি জেওর'-এর চাহিদাই এমন যে, প্রতি বছর বিভিন্ন স্থান থেকে তার হাজার হাজার কপি ছাপা হয় এবং মানুষের হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর লিখিত কুরআন তরজমা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও ইলমদীপ্ত। একই সঙ্গে বয়ানুল কুরআন তাঁর লেখা এক মহান তাফসির। ভারত উপমহাদেশ এবং এর বাইরেরও হাজার হাজার মানুষ তাঁর কাছ থেকে ইসলাহ ও তারবিয়ত গ্রহণ করেছেন। এসব কারণেই তাঁর 'হাকিমুল উম্মত' (উম্মাহর আত্মিক চিকিৎসক) উপাধিটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মূল নামের চেয়ে এই উপাধিতেই মানুষ তাঁকে বেশি দ্রুত চিনতে পারে। তাঁর রচনা ও মাওয়ায়েজ (ওয়াজ ও বয়ানের সংকলন) থেকে লাখ লাখ মানুষ ইলমি ও আমলি কল্যাণ লাভ করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল ইলম, হিকমত, মারিফত ও তরিকতের এমনই এক ঝর্নাধারা যে, তা থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত উপমহাদেশের মুসলমানরা সরাসরি হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন এবং পরিতৃপ্ত হয়েছেন। তাঁর ওফাতের পরও তাঁর অগণিত গ্রন্থাবলির মধ্য দিয়ে সেই ঝর্নাধারা থেকে এখনও বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। হজরত হাকিমুল উম্মতের জীবন ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিভিন্ন কাজের জন্য তাঁর সময় থাকত পূর্ব নির্ধারিত এবং প্রতিটি কাজ তিনি সময় ধরে সম্পন্ন করতেন। প্রতিদিন বহু চিঠি তাঁর কাছে আসত এবং তিনি সময়মতো প্রতিটি চিঠির জবাব লিখে পাঠাতেন। ১৬ রজব ১৩৬২ হিজরি (১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) রাতে তিনি থানাভবনেই ইনতেকাল করেন এবং বুজুর্গ মুজাহিদ হাফেজ জামেন শহিদ রহ.-এর মাযারের পাশে নিজ বাগানেই তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাআলা এই মহান খাদেমে দীনকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

[৫৩]. মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব ১৯০৫ সালে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার অন্তর্গত বরইতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এদেশের ইতিহাসে তিনি অবিসংবাদিত এক নক্ষত্র। আলিম সমাজে তাঁর নামেই তাঁর পরিচয়। প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করে তিনি দারুল উলুমে গমন করেন। সেখানে সমকালীন সকল বুজুর্গের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন তিনি।

কর্মজীবনের শুরুতে মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেবের ইনতেকাল পর্যন্ত হাটহাজারি মাদরাসার উস্তাদ ছিলেন। দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে ঘণ্টা নিতেন। এরপর সুদীর্ঘ ২৭ বছর তিনি পটিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে খেদমত করেছেন। ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যও কাজ করে গেছেন তিনি। আলোচনার ময়দানে খতিবে আজম নামে খ্যাতি ল্যাভ করলেই সারাজীবন হাদিসের দরস দিয়ে গেছেন তিনি। খতিবে আজম হজরত মওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব ১৯৮৭ সালের ১৮ ই মে মোতাবেক ১৯ শে রমজান এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

ভাবনার সমুদ্রে

পরীক্ষার পর অনেক ছাত্রভাই উচ্চশিক্ষার জন্য দেওবন্দে চলে যান। আমিও ভাবতে থাকি। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল দীনি ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা নেব। কিন্তু কোথায় যাব এ নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধায় ছিলাম। জিরির সনদ সে-সময় উপমহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মানসম্পন্ন ছিল। সুতরাং দেওবন্দে গিয়ে আরেকবার দাওরা পড়ার খুব একটা যুক্তি আমার কাছে ছিল না। এখানকার উসতাদদের মধ্যে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর এবং মুহতামিম সাহেব হুজুর চাইতেন, আমি এখানেই থেকে যাই। মন দিয়ে খেদমত শুরু করি। মুহতামিম সাহেব তো জাহেদ[৫৪] মানুষ ছিলেন। তিনি মুয়াজ্জেম হোসাইন সাহেবের খলিফা ছিলেন। আর মুয়াজ্জেম সাহেব ছিলেন গাঙ্গুহির খলিফা। মুহতামিম সাহেবের রক্তে-মাংসে তাই দুনিয়াবিমুখতা মিশে ছিল।

আরেক উসতাদ ছিলেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। সম্পর্কে উনি পটিয়ার মুফতি সাহেবের ভায়রা। উনাদের শ্বশুরের ছিল সাত জামাই। সাতজনই মাশাআল্লাহ বড় বড় আলিম। মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব ফারেগে দেওবন্দ ছিলেন। উনি সেখান থেকে সাহারানপুরে[৫৫] চলে যান। আরো দুবছর সেখানে নানা ধরনের ফুনুন[৫৬] বিষয়ে পড়াশোনা করেন। উনি আমাদের বলতেন—'আমি প্রতি তিন হরফে এক রুপি করে খরচ করেছি।' জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। মাশাআল্লাহ ইলম অর্জনে খরচও করেছেন। সবক যে কিতাব থেকেই পড়াতেন, কিতাব বন্ধ রেখে পড়াতেন। কিতাব কখনো খুলে দেখতে হতো না। আমরা উনার কাছে হিদায়া আখেরাইন, সুল্লাম, মাইবুজি, দিওয়ানে হামাসা, সাবআ মুআল্লাকা ইত্যাদি পড়েছি। মাওলানা সালেহ সাহেব উচ্চতায় খাটো ছিলেন। কিন্তু ছিলেন খুবই রসিক। ক্লাসের সবাইকে বোগদাদী বলে সম্বোধন করতেন।

আরেক উসতাদ ছিলেন মাওলানা আবুল খায়ের সাহেব। পশ্চিম পটিয়ার দৌলতপুর নিবাসী। গ্রামের মানুষ। বয়সে প্রবীণ। সাহারানপুরের ফারেগ। উনি

---

[৫৪]. তাসাউফের পরিভাষায় দুনিয়াবিমুখতার একটি উচ্চ পর্যায়কে জুহদ বলা হয়।

[৫৫]. ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি জেলা।

[৫৬]. অন্যান্য শাস্ত্র

মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি[৫৭] এবং শাইখুল হাদিস[৫৮] সাহেব উভয়েরই শাগরেদ। উনার কাছে আমরা ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, মুখতাসারুল মাআনীর ফন্নে আওয়াল সানী, জালালাইন শরিফ, মিশকাত সানি পড়েছি।

মুফতি নুরুল হক সাহেব হুজুর ছিলেন আমাদের খুব প্রিয় উসতাদ। উনার কাছে মিশকাত আওয়াল, হিদায়া আওয়ালাইন, জালালাইন প্রথম অংশ, তহাবি শরিফ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়ি।

মাওলানা ইসহাক গাজি সাহেবের কাছে পড়েছি বায়যাবি শরিফ।

মুহাদ্দিস সাহেবের (মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ সাহেব) কাছে পড়ি পূর্ণাঙ্গ তিরমিজি আর বুখারি শরিফ।

এভাবে জিরিতে চার বছরের ইলমি জীবন বুজুর্গদের সান্নিধ্য ও পরশে অতিবাহিত করি।

---

[৫৭]. আবু ইবরাহিম খলিল আহমদ (১৮৫২-১৯২৭) ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত হাদিসবিশারদ, যিনি হাদিসের প্রামাণ্য গ্রন্থ সুনানে আবু দাউদের ১৮ খণ্ডবিশিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাজলুল মাজহুদ রচনা করেছিলেন। তিনি শাইখ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহির উত্তরসূরি ছিলেন। পারিবারিকভাবে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বংশের ছিলেন। সাহাবিদের সাথে তাঁর বংশের সম্পর্ক ছিল। দেওবন্দের প্রথম সারির আকাবিরদের সকলের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি। সামান্য পরিসরে তাঁর জীবনের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর জীবনী তাজকিরাতুল খলীল দেখা যেতে পারে।

১৯২৭ সালের ১৩ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার এই ক্ষণজন্মা আকাবির ইনতেকাল করেন।

[৫৮]. মুহাম্মদ জাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইয়াহিয়া সিদ্দিকি কান্ধলভি শাহারানপুরি মুহাজির মাদানি (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ - ২৪ মে ১৯৮২) ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত হানাফি বিশেষজ্ঞ। তিনি হাদিসের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার চাচা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দীনি আন্দোলন তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নির্দেশে শাইখুল হাদিস ফাজায়েলে আমল গ্রন্থের সংকলন করেন। এটি উরদুতে লিখিত হলেও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শাইখুল হাদিস মুহাম্মদ জাকারিয়া ১৮৯৮ সালে দিল্লির কান্ধলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া রহ.। গাঙ্গোহ নামক স্থানে তিনি তার পিতার মাদরাসায় দশ বছর পড়াশোনা করেন। ১৯১০ সালে তিনি মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর মাদরাসায় শিক্ষালাভের জন্য আসেন। তিনি তার পিতা ও মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট থেকে হাদিস শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৫ সালে ফারেগ হওয়ার পর তিনি এখানেই শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

শাইখুল হাদিস হিসেবে বিশেষভাবে তাঁকেই বোঝানো হয় এই উপমহাদেশে। জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি মদিনাতেই কাটিয়েছিলেন। আওজাযুল মাসালিক নামে মুয়াত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থের ১৯ খণ্ডের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করে তিনি আরব বিশ্বে খ্যাতি পেয়েছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আপবীতি তাঁর লিখিত অত্যন্ত বিখ্যাত আত্মজীবনী। পাঠকদের এটি অবশ্য অধ্যয়নের অনুরোধ রইল।

জিরিতে দাওরার উসতাদদের কাছে পঠিত কিতাবের তালিকা :

তিরমিজি, বুখারি শরিফ (পূর্ণাঙ্গ)	মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর
হিদায়া আখেরাইন, সুল্লাম এবং সাবআ মুআল্লাকা ইত্যাদি	মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব
ইবনে মাজাহ, আবুদাউদ শরিফ, মুখতাসারুল মাআনি, জালালাইন শরিফ, মিশকাত সানি	মাওলানা আবুল খায়ের সাহেব
মিশকাত আওয়াল, হিদায়া আওয়ালাইন, জালালাইন আওয়াল, তহাবি শরিফ	মাওলানা মুফতি নুরুল হক সাহেব
বায়যাবি শরিফ	মাওলানা ইসহাক গাজি সাহেব

তাকমিলি জুনুন নাকি তাকমিলি ফুনুন

দাওরার পর যখন সব ছাত্রভাই বিভিন্ন জায়গায় উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে শুরু করলেন, আমি তখন আমার উসতাদদের কাছে পরামর্শের জন্য দেখা করি। অনেকে দেওবন্দ, অনেকে সাহারানপুর যেতে পরামর্শ দিচ্ছিল। আবার অনেকে দেশেই থেকে যেতে বলেন। মুহাদ্দিস সাহেবের কাছে গেলাম এক সন্ধ্যায়। উনি এই উচ্চশিক্ষা বিষয়টা একদম পছন্দ করতেন না। 'তাকমিলি ফুনুন করতে চাও তোমরা, এটা আসলে তাকমিলি জুনুন!' এভাবেই তিনি উচ্চশিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতেন। আমার ব্যাপারে উনি একটা চূড়ান্ত পরামর্শ দেন এই বলে যে-তোমার বিদেশ গমন আমি কোনোভাবেই পছন্দ করছি না। কিন্তু যদি তুমি এই জুনুন পূরণ করতে কোথাও যেতেই চাও, তা হলে আল্লামা সাইয়েদ ইউসুফ বানুরির কাছে যাও। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি সাহেবের ইলম আছে তাঁর বুকে। এ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া আমি তোমার জন্য মুনাসিব মনে করি না।

মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ সাহেবের সাথে দেখা করলাম। উনিও এই ধরনের পরামর্শ দিলেন। হাদিস পড়তে চাইলে ইউসুফ বানুরির কাছে যাও। আর ফিকহ পড়তে চাইলে মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেবের[৫৯] কাছে যাও। এ ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে খুব বেশি ফায়দা হবে না তোমার। নিজের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেন উনি। আমি

---

[৫৯]. পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম। জামিয়া বানুরিটাউনে দীর্ঘদিন প্রধান মুফতি ছিলেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থ সাওয়ানেহে ওয়ালি হাসান নামে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্যপাঠ্য একটি কিতাব। সেই কিতাবে মুফতি সাহেবকে তুলে ধরতে গিয়ে মুফতি আবদুস সালাম সাহবের জবানী বেশ অনেকবার উঠে এসেছে। মুফতিয়ে আজমের সাথে হজরতের গভীর আত্মিক সম্পর্ক থাকায় তাঁর আলোচনা আসবে আলোচ্য কিতাবে। তাই বিস্তারিত জীবনি এখানে দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম।

দেওবন্দ সাহারানপুরের অনেক শায়েখের দরবারেই ছিলাম। কিছুদিন অবস্থানের পর প্রায় সবারই ইলমের একটা চূড়ান্ত অবস্থা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আল্লামা ইউসুফ বানুরির কাছে অনেক দিন অবস্থান করেও আমি তার ইলমের শেষ সীমানা খুঁজে পাইনি। এজন্য কোথাও যেতে চাইলে এই আল্লামার কাছেই যাও।

স্বপ্নের পুরুষ বাস্তবে

এই ব্যাপারে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ হুজুরের সাথে বাজারে ছিলাম। হুজুর বললেন, আমার উসতাদকে দেখবেন?

আমি বললাম কে উনি?

আল্লামা ইউসুফ বানুরি!

সত্যি উসতাদজি?

জি। উনাকে দেখতে চাইলে আজ দারুল উলুম হাটহাজারির জলসায় চলে যাবেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম বড় ইসলামি মহাসম্মেলন হবে। পাকিস্তান থেকে বড় বড় আলিমগণ এসেছেন। মুফতি মাহমুদ মুলতানি[৬০] সাহেবও এসেছেন। আমি কিছু সাথিকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরের পর হাটহাজারির পথে রওনা হয়ে গেলাম। এশার পূর্বে বয়ান করলেন স্থানীয় আলিমগণ। এশার পর বয়ান শুরু করলেন খতিবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ সাহেব। পুরো দুই ঘণ্টা বয়ান করলেন তিনি। এরই মধ্যে স্টেজে এসে গেলেন সম্মানিত মেহমানবৃন্দ। দেখলাম খুব সুন্দর চেহারার একজন

---

৬০. মুফতি মাহমুদ (১৯১৯–১৯৮০) ছিলেন পাকিস্তানের ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠন জামিয়াত উলামায়ে ইসলাম-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ছিলেন সীমান্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি একজন বিখ্যাত আলিমে দীন।

১৯১৯ সালের জানুয়ারীতে তিনি ডেরা ইসমাইল খান জেলায় জন্ম নেন। ভারতের মুরাদাবাদে জামিয়া কাসিমিয়া থেকে সর্বোচ্চ দীনি সনদ অর্জন করেন। এরপর ১৯৪১ সালে তিনি মিয়ানওয়ালিতে একজন শিক্ষক হিসেবে প্রাথমিকভাবে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯৫০ শতকের শুরুর দিকে তিনি পাঞ্জাবের মুবারান প্রদেশের একটি মাদরাসা কাসিমুল উলুমের একজন শিক্ষক হিসেবে পাকিস্তানের কর্মজীবন করেন। পরবর্তীকালে তিনি তার অসাধারণ মেধার সুবাদে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রধান মুদাররিস, প্রধান মুফতি, শাইখুল হাদিস ও মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার জীবদ্দশায় প্রায় ২৫,০০০ এর মতো ফতোয়া লিখেছেন। ১৯৭৪ সালে কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলনে তিনি পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। এজন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

১৯৮০ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাকে তার নিজ শহর আবদুল খেল, পানিয়ালা, ডেরা ইসমাইল খান জেলার কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মেহমান এসে বসলেন। পরিধানে আবাকাবা। মাথায় পাগড়ি। শুনলাম উনিই আল্লামা ইউসুফ বানুরি। পাশেই বসে ছিলেন মুফতি মাহমুদ মুলতানি। উনিও দেখতে পাঠানদের মতো। পেশিবহুল শরীর। শক্তপোক্ত চেহারা। মাথায় হলুদাভ রুমালের পাগড়ি। সিদ্দিক সাহেবের বয়ান চলাকালে তারা মাথা নিচু করে মনোযোগ দিয়ে বয়ান শুনছিলেন। সিদ্দিক সাহেব বারোটার দিকে বয়ান শেষ করলেন। এরপর বয়ানে এলেন আল্লামা বানুরি সাহেব। আমার এখনো চোখে ভাসছে। উনি কী সুন্দর করে অত্যন্ত ভদ্রোচিতভাবে শুরুতেই শ্রোতাদের কাছে মাফ চেয়ে নিলেন। কিছু কথা আজও মনে আছে। উনি বলছিলেন– আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু আমি আপনাদের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারি না। এজন্য আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। তবে আমি একথা জোর গলায় বলতে পারি যে, আপনারা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে মূল আলোচনা বুঝে নিতে পারবেন। এই যে দেখুন, আমি এতক্ষণ মাওলানা সিদ্দিক সাহেব হুজুরের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। আলহামদুলিল্লাহ অনুমতি দিলে আমি আপনাদের খেদমতে উনার আলোচনার মূল অংশ শুনিয়ে দিতে পারব।

এই বলে উনি তার আলোচনা শুরু করলেন। যেহেতু উনি খতিব[৬১] ছিলেন না, তাই সামান্য সময় কথা বলেই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনের গভীরে তাঁর এই বিনয়াবনত চিত্রটি একদম গেঁথে গিয়েছিল। উনার সাথে প্রচুর স্মৃতি থাকার পরেও সেদিনের স্মৃতিই আমার মানসে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটে আছে।

এরপরে আলোচনায় এলেন মুফতি মাহমুদ সাহেব। উনি ছিলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে পারতেন। ইসলামি হুকুমতের প্রতিষ্ঠা নিয়ে অনেকক্ষণ বয়ান করেছিলেন সেদিন। মাদরাসা মসজিদ কিছুই বাকি থাকবে না, যদি না ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ছিল তার মূল আলোচ্য বিষয়। এভাবেই তার আলোচনার মধ্য দিয়ে সেদিনকার সম্মেলন শেষ হয়।

মুফতি মাহমুদ সাহেবের ইনতেকালের সময় আমি করাচিতে উপস্থিত ছিলাম। আরেক সময় সেই ঘটনা বলব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা বানুরির প্রতি আমার আবেগ শুরু থেকেই হৃদয়মাঝে সুপ্ত ছিল। মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর উনার ব্যাপারে স্মৃতি রোমন্থন করার পর থেকে হৃদয়ের ঝোঁক আরো

---

[৬১]. বাগ্মী বক্তা

বেড়ে যায়। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আমি করাচিতেই যাব। মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর তো সে সময় বাড়িতে গিয়েছিলেন। সন্দ্বীপে। আমি পোস্টকার্ডে হজরতকে লিখে জানালাম, আমি করাচি যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করছি। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন।

সফরের প্রস্তুতি

আব্বাকে যখন আমার ইচ্ছার কথা খুলে বললাম, তিনি খুশিমনে সম্মতি প্রদান করলেন। যেতে চাচ্ছ ভালো কথা। কিন্তু ফিরবে তো? আব্বার মনে এই শংকাটাই কাজ করত। যখন আম্মাকে জানালাম, আম্মা তো কেঁদে দিলেন। কেন যাবি বাবা এতদূর? এখানে কি থাকা যায় না? এটা সত্য কথা, আম্মাদের কখনো বোঝানো যায় না। আমিও চুপ থাকলাম। নীরবে শুরু হলো সফরের প্রস্তুতি। কাপড়চোপর যা ছিল আয়রন করে নিলাম। একটা সিন্দুকের মতো বাক্স ছিল। ওটা ধুয়েমুছে সাফ করলাম। এবার শুরু হলো বাহনের খোঁজ নেওয়া। প্রথমত উপায় ছিল আকাশপথ। কিন্তু পথখরচ অনেক বেশি হওয়ায় আমি এই পথে যাওয়ার ইচ্ছা বাদ দিই। আরেকটি পথ হলো পানিপথ। জাহাজে চেপে যাওয়া। এক সাথি ছিল। বন্দরে কাজ করত। তার সাথে যোগাযোগ করলাম। সে জানাল, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কয়েকটি জাহাজ চলাচল করে। চট্টগ্রাম-টু-করাচি। সাফিনায়ে হুজ্জাজ। শামসি। এগুলো ছিল জাহাজের নাম। সাফিনাতে গেলে পনেরো দিন লাগবে। খরচ একটু কম। সম্ভবত থেমে থেমে যাবে। আর শামসিতে গেলে আট দিন লাগবে করাচি পৌঁছতে। তবে টিকিটমূল্য সামান্য বেশি। অবশ্য সুবিধাও আছে বেশ। আমি ভেবেচিন্তে শামসিতেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করি।

এদিকে বাড়িতে আব্বা আমার পথখরচের জন্য ভাবছিলেন। কীভাবে কী করবেন! হুট করে বড়সড় একটা খরচ। আম্মার পরামর্শে আব্বা আমাদের প্রিয় গাভীটি বিক্রি করে দেন। ৪০০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল লালী! সবটাই আব্বা আমাকে দিয়ে দেন। অনেক খারাপ লাগছিল লালীর জন্য।[৬২] কিন্তু ইলম সাধনায় আলিমদের ত্যাগ-তিতীক্ষার কথা মনে পড়ায় সাহস ফিরে পাই। শেষদিনগুলো আব্বা-আম্মার সাথে ভালোই কাটে। ছোট ভাইকেও অনেক আদর দিই। দেখতে দেখতে শনিবার এসে পড়ে। আমি আম্মা-আব্বাকে সালাম জানিয়ে বন্দরের পথে রওনা দিই। দিনটি ছিল সোমবার।

---

[৬২]. ঘটনা বর্ণনার সময় অত্যন্ত আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন মুফতি সাহেব।

বন্দরে পৌঁছে সেই সাথির কাছে রাত কাটাই। সকালে উঠি ফুরফুরে প্রাণবন্ত মেজাজে। জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরুর পথে ছিলাম। সাথিও আমাকে অনেক শুভেচ্ছা জানায়। জোহর নামাজের পরে জাহাজে উঠে বসি। বিদায় জানাই প্রিয় মাতৃভূমিকে। শামসি তিনতলা বিশাল জাহাজ ছিল। প্রতিতলায় ছিল নামাজের ব্যবস্থা। তখন যেহেতু বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল, তাই প্রচুর যাত্রী পানিপথে পূর্ব-পশ্চিমে যাতায়াত করত। আমি জায়গা পেয়েছিলাম দ্বিতীয়তলায়। আশপাশে কাউকে চিনতাম না। খুব বেশি পরিচিত হতেও চাচ্ছিলাম না। কারণ আমি সেখানে গিয়ে মাদরাসাতেই থাকব। ফলে পরিচয় বৃদ্ধি করে তেমন লাভ হবে না। এর চেয়ে বরং সফর উপভোগ করি, এটাই ভালো।

আস-সাফারু ফিল বাহর

সমুদ্রভ্রমণ! এই শব্দটিই কারো মনে রোমাঞ্চ জাগিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পৃথিবীর তিনভাগের উপর দিয়ে ভেসে চলার যে অসীম কৌতূহল থাকে সবার হৃদয়ে, তা আজকাল তো আর সহজে পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিমানের যুগ সাধ্যের নাগালে আসার আগ পর্যন্ত মানুষ এই কৌতূহল বেশ ভালোভাবে মিটিয়েছে। আমার সময়টিও ছিল তেমন এক যুগ। সেকালে বিমানে সফর ছিল শুধু উচ্চবিত্তদের ভ্রমণপথ। যা হোক, আমি কখনো এর পূর্বে জাহাজ তো দূরের কথা, লঞ্চেও ভ্রমণ করিনি। তাই জাহাজ চলা শুরু হতেই মনে হলো আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। ভাসমান অবস্থায় এমন বহু ধরনের অনুভূতি হয় সমুদ্রভ্রমণে। কখনো মনে হয় নীলাকাশ আর সমুদ্র একই সমতলে অবস্থিত। ওই দিগন্তে গেলে হয়তো আকাশের ছোঁয়া পেয়ে যাব। জাহাজের দুলুনি আপনাকে এভাবে নানা রকমে ভাবতে বাধ্য করবে। রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন আপনি তারা গুনবেন, তখন মনে হবে পৃথিবীটা যেন স্থির হয়ে গেছে। আমি মাঝেমধ্যে খোলা ডেকে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম আল্লাহর কুদরতের কথা। কী নিপুণতা এই সৃষ্টিজগতে! চেষ্টা করেও কোনো ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। ভোরে যখন সূর্য উঠত, মনে হতো সমুদ্রের ভেতর থেকে জেগে উঠছে জ্বলন্ত রবি। মোটের উপর বলতে গেলে, সমুদ্রভ্রমণের অনুভূতি আর ভাবনাগুলো স্থলপথের ভ্রমণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনাকে এটি করেই অভিজ্ঞতা নিতে হবে। শুনে বা পড়ে আপনি এই অনুভূতি ধারণ করতে পারবেন না।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার সম্ভবত দুদিন অথবা তিনদিন পর আমরা কলম্বো (মূলত জাফনা হবে) পৌঁছলাম। এটি শ্রীলঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ শহর। আবার আন্তর্জাতিক বন্দরনগরীও। এখানে আমাদের জাহাজ প্রায় ছয় ঘণ্টা থেমে ছিল। এর মধ্যে জাহাজের কিছু প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ পূরণ করে নেয়। কিন্তু সাধারণ যাত্রীদের জাহাজ থেকে নামার অনুমতি ছিল না। এই সময় তারা তাদের প্রয়োজন পূরণে কাছে পেত স্থানীয় হকারদের। তারা জাহাজের কাছাকাছি এসে নানা ধরনের পণ্য নিয়ে হাঁক দিত। যাত্রীরা তাদের প্রয়োজনমাফিক জিনিসপত্র বা খাবার তাদের থেকে চেয়ে নিতে পারত। কিন্তু পণ্য গ্রহণের সময় সৃষ্টি হতো কিছু জটিলতা। এত উপর থেকে কীভাবে পণ্য গ্রহণ করবেন তারা? এই সমস্যার এক অভিনব সমাধান দেখলাম জাফনাতে। বড় বড় বালতির মতো পাত্রে দড়ি বেঁধে ডেকে লাগানো আছে। যাত্রীরা যে যখন কেনাকাটা করতে চায়, তখন নিচে বন্দরের হকারের সাথে দামাদামি করে এরপর ওই দড়ির সাহায্যে তাঁর পণ্যটি উঠিয়ে তাতে পয়সা ছেড়ে দেয়। এভাবে করে ভিসা ছাড়াই শ্রীলঙ্কায় কেনাকাটা করে ফেলত জাহাজের যাত্রীরা! আমারও খুব ইচ্ছা হচ্ছিল কিছু কেনাকাটা করার। আমি এক হকারকে ডেকে বললাম, এখানে বিশেষ কী জিনিস পাওয়া যায়? সে দুহাত গোল করে মুখে হাত রেখে জোরে চেঁচিয়ে বলল, নারিকেলের বিশুদ্ধ তেল। শ্রীলঙ্কা তো নারিকেল গাছের জন্য বিখ্যাত। তাই এক বোতল তেল কিনে নিলাম। কিছুক্ষণ পর সাইরেন বেজে উঠল। যাত্রীরা তাড়াতাড়ি সতর্ক হয়ে বেচাকেনা বন্ধ করে কেবিন অথবা ডেকে ফিরে গেল। এরই খানিক পরে জাহাজ ছেড়ে দিল। আবার করাচির উদ্দেশে রওনা দিলাম আমরা।

আরবসাগর

শ্রীলঙ্কা ও ভারতকে ডানপাশে রেখে আমাদের জাহাজ এবার পকপ্রণালির প্রান্তভাগ দিয়ে আরবসাগরে প্রবেশ করতে লাগল। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে সমুদ্রের মাঝে অদৃশ্য বিভাজনরেখার কথা বলেছেন, তা স্বচক্ষে না দেখলে কল্পনা করা কঠিন। আমরা যখন পকপ্রণালি ছেড়ে ভারতের উপরের দিক দিয়ে আরবসাগরে প্রবেশ করতে লাগলাম, তখন আজব ধরনের কুদরত লক্ষ করলাম। প্রণালিতে বেশ কিছু নদী এসে মিলিত হয়েছে। এখানকার পানি ছিল একটু ঘোলাটে। আর স্বাদ মিঠা। জাহাজের কর্মচারীরা নদীগুলো থেকে আগামী কদিনে জন্য বেশি করে পানি তুলে রাখল, কাছাকাছি থাকায় বিষয়টি লক্ষ করলাম। ঢেউগুলোও খুব ছোট ছোট। কিন্তু যখন আরবসাগরে প্রবেশ করছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমরা কাগজের নৌকায় আছি। বিশাল বিশাল একেকটি ঢেউ এসে একবার জাহাজকে তিনতলা পরিমাণ উপরে উঠিয়ে আবার নামিয়ে দিচ্ছিল। প্রতিটি ঢেউয়েই মনে হতো এবার বুঝি

আমাদের আর রক্ষা হবে না। কিন্তু ঠিকই আবার আমাদের সমুদ্র সমতলে এনে নামিয়ে দিত পাহাড়সম উঁচু ঢেউতরঙ্গ।

সমুদ্রের পানি ছিল একদম নীল এবং স্বচ্ছ। অনেক গভীর পর্যন্ত দেখা যায়। আমি তো প্রায় সারাদিনই জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পানির ভেতরে তাকিয়ে থাকতাম। হরেক রকমের বিশাল বিশাল সামুদ্রিক প্রাণী দেখতাম। মনে মনে ভাবতাম, পৃথিবীতে কত সৃষ্টি আছে, যা আমরা কখনো দেখিইনি। একবার তো আমাদের জাহাজ কোনো একটি প্রাণীর শরীরে আটকেও গেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল একদিন সকালে। জাহাজ চলতে চলতে হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করে থেমে গেল। সবাই তো পেরেশান! মাঝসমুদ্রে এসে এ কী হয়ে গেল! সারেংরা সবাইকে শান্ত হতে বলে পানিতে নেমে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখি, জাহাজের একপাশের পানি লাল হয়ে গেছে। এরপর সারেংরা উপরে উঠে এলেন। জানা গেল কোনো এক বিরাট সামুদ্রিক প্রাণীর শরীর আটকে গিয়েছিল জাহাজের প্রপেলারে। এতে সে আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে। অনেক চেষ্টার পর তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রপেলার থেকে। আমরা দ্রুত সেদিকের ডেকে গিয়ে দেখি বিরাট আকারের এক সামুদ্রিক প্রাণী পানির ভেতরে তলিয়ে গেল। মনটা বেজায় খারাপ হয়েছিল সেদিন। এত বড় একটা প্রাণী, অথচ কত নিষ্ঠুরভাবে আহত হলো।

বিভাজনরেখার যে কথাটি বলছিলাম, সেটি আমি জীবনে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ করি। একদিকে ঘোলা পানি, আরেক দিকে স্বচ্ছ নীলাভ পানি। একদিকে ধীর প্রবাহ। আরেকদিকের প্রবাহ অত্যন্ত গতিশীল। সাথে বিরাট বিরাট কলজে কাঁপানো ঢেউ। এভাবে চলতে চলতে আরো এক সপ্তাহ। এরপর এক দুপুরে আমরা করাচি বন্দরে এসে পৌঁছলাম।

করাচি বন্দরে নতুন মুসাফির

করাচি বন্দর তখনকার পৃথিবীতে কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারাবিশ্বের বাণিজ্য রুট হিসেবে এটি পরিচিত ছিল। আজকাল গাওয়াদার বন্দর[৬৩] যেই অবস্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছে। জাহাজ বন্দরে নোঙর করামাত্র আমার মতো নতুন মুসাফিররা দৌড়ে ডেকের পারে এসে পড়ল। অবাক চোখে জাহাজের ডেক থেকে বন্দরের ব্যস্ততম কার্যক্রম দেখছিলাম। আমাদের এখানে পৌঁছতে মোট আটদিন

---

[৬৩]. পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের একটি অখ্যাত সমুদ্র বন্দর, এতদিন যা মাছ ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু এখন চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড কার্যক্রমের প্রধান রুট হিসেবে বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দরগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে।

লেগেছে। জাহাজ থামতেই খালাসিরা মাল খালাসের কাজে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে দেখছিলাম শুধু। হঠাৎ জাহাজ থেকে এনাউন্সমেন্ট শুরু হলো। আগামী সাত ঘণ্টা জাহাজের সকল যাত্রীকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। যেহেতু সামুদ্রিক আবহাওয়ায় অনেকেরই সি-সিকনেস হয়েছিল; তাই ডাক্তার সকলকে পরীক্ষা না করে জাহাজ থেকে নামতে দেবেন না। এবার তাই কিঞ্চিৎ বিরক্ত আর কিছুটা বাধ্য হয়ে বন্দরের ব্যস্ততা দেখতে থাকি। ডেক থেকে শহরের কিছু অংশও চোখে পড়ছিল। শহরের দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ল, আমাকে একা একাই নিউটাউন যেতে হবে। কারোই তো নিতে আসার কথা না। দুর্বল মনে ভেসে আসা এই ভাবনা একটু দমিয়ে দিল আমাকে, অন্তত কিছুটা হলেও। কারণ এত বড় শহরে একা একা পথচলা সহজ ব্যাপার নয়। আঞ্চলিক ভাষাও জানি না ঠিকমতো। এখানকার সংস্কৃতির সাথেও তেমন পরিচয় নেই। শুধু আছে কালিমার পরিচয়। এই পরিচয়েই তো আমরা এক দেশ, এক জাতি। আমরা মুসলিম জাতি। পূর্ব-পশ্চিমের মাঝের দূরত্ব নিদেনপক্ষে এক হাজার কিলোমিটার তো হবেই। কিন্তু তবু এক দেশ ছিলাম। দেখা যাক, মুসলিম জাতিসত্তার এই পরিচয় দিয়ে আমরা কতদূর এগোতে পারি! আমাদের পূর্ববর্তীরা তো এই এক পরিচয়েই সারাবিশ্ব জয় করেছেন। আগলে রেখেছেন মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া, ককেশাস থেকে নাইজেরিয়া; এই এক পরিচিয়েই।

জোহরের নামাজ জাহাজেই পড়লাম। খাওয়াদাওয়া সেরে বসে আছি। জাহাজে জোরে এনাউন্স হলো আবদুস সালাম নামে কোনো যাত্রী আছেন? ডেকে আসুন। আপনার মেজবান এসেছে। আমি ভাবলাম অন্যকেউ হবে। এরপর আবার ডাকা হলো। এবার চট্টগ্রামের পরিচয় যুক্ত করে। তখন উঠে পড়িমড়ি করে ডেকের কাছে গেলাম। চেয়ে দেখি, নিচে একজন মৌলবি সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আমি মুখ বের করতেই উনি হাঁক ছাড়লেন, আপনি কি মৌলবি আবদুস সালাম? আমি ইতিবাচক জবাব দিই। উনি জানান, উনি নাকি আমাকে চেনেন। উনার নাম বললেন হাফেজ মুহাম্মদ তাইয়েব। কোনো এক মাধ্যমে জেনেছেন আমি আসছি। তাই আমাকে নিতে এসে পড়েছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, উনি জোহর নামাজের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন মসজিদ থেকে। যেহেতু উনি দায়িত্বশীল ইমাম; তাই আসর নামাজে অনুপস্থিত থাকা ঠিক হবে না। আমাকে নিউটাউনের পথ এবং সাধারণ ট্যাক্সিভাড়া জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নিলেন। না চাইতেই এভাবে পরিচিত মানুষ মিলে গিয়ে বেশ ভালোই লাগল। আমার কথা জানে এমন মানুষ তাহলে আছে এখানে! ভেবে স্বস্তিবোধ করতে লাগলাম।

বিকেলের দিকে কোয়ারেন্টাইন[৬৪] শেষ হলো আমাদের। গাট্টি নিয়ে বন্দর থেকে বেরিয়ে এলাম। জোয়ান মানুষ তাও আবার মৌলবি ধরনের পোশাক গায়ে দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। হতে পারে আমার ভাবসাব দেখে বুঝে ফেলেছেন আমি সুদূর পশ্চিমে নতুন আগন্তুক। কোথায় যাব শুনে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠিয়ে দিলেন। ভাড়া ঠিক হলো দেড় রুপি। যদিও পরে জেনেছিলাম এটা বেশি ছিল। কিন্তু দুঃসময়ে এটা তেমন বেশি ছিল না। ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে দয়া করে (আসলে বেশি ভাড়া পাওয়ার আনন্দে বোধহয়) করাচি শহর একটু ঘুরিয়ে দেখাল। এরপর ঠিকঠিক নিউটাউনের সামনে এনে নামিয়ে দিল। বিনিময়ে আবারও একটু বখশিশ দাবি করছিল। আমি খুশি হয়ে দুই রুপি দিয়ে দিই।

ইলমের রাজপ্রাসাদে রিক্তহস্ত পথিক

ট্যাক্সি থেকে নেমে গাট্টি ঠিকঠাক করে সোজা হয়ে দাঁড়াই। নিউটাউনের সুবিশাল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আমার তো চোখ ছানাবড়া। এতবড় ফটক। ভেতরটা না জানি কতবড়! একহাতে বাক্স আরেক হাতে ব্যাগ নিয়ে ফটকের ভেতরে পা দিলাম। ভেতরে চোখ মেলে মনে হলো স্বপ্নের ভুবনে এসে পড়েছি। চারিদিকে সাদা পোশাকে তালিবে ইলম ভাইয়েরা পায়চারি করছেন। কিন্তু কেউ কারও দিকে তাকানোর সময় নেই। সবাই কেমন যেন একটা ঘোরে চলাফেরা করছেন। ইলমের অন্বেষণ যেন তাদের মস্তিষ্ক সর্বদা ব্যস্ত। ভেতরে পা রাখার সময় আমি খুবই বোকার মতো একটি কাজ করেছিলাম, যা মনে পড়লে আজও লজ্জিত হই। হয়েছিল কী- আমি এত সুন্দর সাজানো-গোছানো লন বা সবুজ চত্বর মাদরাসায় থাকতে পারে ভাবিনি কখনো! আমার মনে হচ্ছিল এত গোছানো পরিবেশে মনে হয় খালি পায়ে চলতে হয়। তাই আমি পায়ের স্যান্ডেল খুলছিলাম! চট করে এক তালিবে ইলম ভাই এসে হাত ধরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, ভাই, আপনি এখানে মেহমান। আপনাকে জুতা খুলতে হবে না। আপনি এমনিই আসুন। আমি তাঁর ব্যবহারে খুবই প্রীত হই। লজ্জা না দিয়ে কী সুন্দর করে তিনি পরিস্থিতি সামলে নিলেন। আমাকেও সম্মানিত করলেন। এরপর তিনি আমাকে মেহমানখানার দিকে নিয়ে যেতে থাকেন। আমি গল্পে গল্পে নিউটাউনে আসার উদ্দেশ্য জানাই। তখন উনি আমাকে নিচতলায় চট্টগ্রামের ইজহার ভাইয়ের ৪নং কামরার সামনে এনে বিদায়

---

[৬৪]. সমকালীন সময়ে বাংলাদেশে এই শব্দটি ব্যবহারের পূর্বেই হজরত এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এখান থেকে এই শব্দের আরবি মূলরূপের (কারান্তিনা) ধারণা পাই।

নেন। এতক্ষণ কিন্তু আমার ব্যাগ এবং বাক্স উনার হাতেই ছিল। কোনোভাবেই আমি উনার হাত থেকে সেগুলো নিতে পারিনি। দীনি তালিবে ইলম ভাইদের তো এমন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দূরদেশে এসে এমন ব্যবহার পেলে সত্যিই অন্তর জুড়িয়ে যায়। আমার সাথে এমনই হয়েছিল।

যেই রুমে আমি মেহমান হলাম, এর চারপাশে আরো কয়েকটি রুমে বাঙলাদেশি ভাইয়েরা থাকতেন। নতুন ভর্তিচ্ছু একজন এসেছে শুনে সবাই এলেন দেখা করতে। কিন্তু এত ছোট মানুষ দেখে উনারা একটু বিস্মিতই হচ্ছিলেন। এক ভাই তো বলেই বসলেন, দাওরা সত্যিই পড়েছেন তো? অনেকে বলছিলেন, এখানে কিন্তু ভর্তিপরীক্ষা অনেক কঠিন হয়। দেশে যদি প্রথম দ্বিতীয় হয়ে থাকেন তাহলেই হয়তো এখানে সুযোগ হবে। তবে সাহস হারাবেন না। বেশি আশাও রাখা যাবে না। অনেকেই এখানে পড়তে এসে অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। তাই খুব বেশি দোয়া কান্নাকাটি করুন। যেন ইনশাআল্লাহ এখানেই দাখেলা হয়ে যায়। নানাদিক থেকে এভাবে ভাইদের মিশ্রপ্রতিক্রিয়া শুনলাম। আশা ও ভয় দুটোই মনের ভেতর জায়গা করে নিল। কিছুক্ষণ পর হাফেজ ইজহার চাটগামী ভাই এসে পড়লেন। খুব মহব্বত পেলাম উনার কাছে। ভর্তির ব্যাপারে সাহস দিলেন। হাফেজ আহমাদুল্লাহর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে জানলাম তিনি রুস্তম জাহাজে চড়ে দেশে গেছেন। তখনই আমার মনে হলো, আরবসাগরে আমরা রুস্তম জাহাজ পাশ কাটিয়েছিলাম। সেখানেই হয়তো তিনি ছিলেন। আমি ইজহার ভাইকে একান্তে নিয়ে জানাই যে, আমার সাথে দুটো চিঠি আছে। হজরত বানুরিকে পৌঁছাতে হবে। বানুরির নাম শুনতেই তিনি কিছুটা ভড়কে গেলেন! পরে জেনেছিলাম, উনি বানুরির নাম শুনলেই ভয় পেতেন! তবু আমাকে উনার সাথে দেখা করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। প্রথম দিন এভাবেই কেটে যায় স্বপ্নের নিউটাউনে।

প্রথম সালাম

পরদিন জোহরের পর বানুরি সাহেবকে নিউটাউনের মসজিদের প্রশস্ত চত্বরে প্রথমবার দেখলাম। ভক্তবেষ্টিত হয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন। আমি ইজহার ভাইকে হাত ধরে বললাম, চলুন না দেখা করি! উনি মাথা চুলকাতে লাগলেন। আমি উনার মনোভাব বুঝতে পেরে নিজেই এগিয়ে গেলাম। সালাম করতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। কী নুরানী চেহারা! হাদিসে নববির যে ফল্গুধারা

তিনি ইমামুল আসর[৬৫] থেকে গ্রহণ করেছেন তাঁর সামান্য নমুনাঝলক এই নুর! হাত বাড়াতেই আমি দু-হাতে মুসাফাহা করে ধন্য হলাম।

কোথা থেকে এসেছেন?

জি, চট্টগ্রাম!

ওহ এতদূর!

আচ্ছা আবার দেখা হবে।

এতটুকু বলে সামনে এগিয়ে গেলেন। আমিও সান্নিধ্যের সৌরভ চোখেমুখে মেখে আর স্পর্শের পরশ দুহাতে সংরক্ষণ করে নিয়ে ইজহার ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। যদিও আল্লামাকে এই দফায় চিঠির কথা আর বলা হলো না। তাতেও আমার তেমন আফসোস ছিল না। চিঠির বাহানায় আরেকটি সাক্ষাত তখন আমার সামনে অপেক্ষমাণ। এই খুশিতেই উলটো আন্দোলিত হই আমি।

পরবর্তী দিন আবার বানুরির অনুসরণ করলাম। দেখলাম উনি নামাজের পর দফতরে যাচ্ছেন। কিছু ভাইকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই সময়ে উনি দফতরে থাকেন। সাহস সঞ্চয় করে দুরুদুরু বুকে দফতরের সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। ভরাটকণ্ঠের জবাব ভেসে এল। আমিও সাহস করে ভেতরে প্রবেশ করি। দেখি আল্লামা বানুরি ডেস্কে বসে আছেন। কাছে যেতেই গল্প শুরু করলেন। মুহাদ্দিস সাহেব কেমন আছেন, কী করছেন, এসব বারবার জানতে চাইলেন!

ওঁরা সত্যিই মুয়াদ্দাব

এই প্রসঙ্গে জিরির ঘটনা মনে পড়ল। বানুরি কীভাবে মুহাদ্দিস সাহেবকে সম্মান দেখিয়েছিলেন। আমরা তো শুধু বিদেশি মেহমান আর বিদেশি সনদের কদর করি। আর উনারা সত্যিকারার্থে ইলম ও তাকওয়ার কদর করতেন। আমরা যখন দাওরা পড়ি তখন একবার বানুরি পূর্বপাকিস্তানে এসেছিলেন। সেই সুবাদে মুহাদ্দিস সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য উনি জিরিতেও আগমন করেন। ছাত্রভাইদের পীড়াপীড়িতে মুহাদ্দিস সাহেব উনাকে একটু বরকতদানের জন্য অনুরোধ করেন। তবে বানুরি এক শর্তে রাজি হন। মুহাদ্দিস সাহেব মজলিসে উপস্থিত থাকবেন না। মুহাদ্দিস সাহেব বানুরিকে বলেন, অনেকদিন আপনার তাকরির শুনি না। একটু বসলে কী সমস্যা হবে! কিন্তু বানুরি নাছোড়বান্দা। উনি ছাত্রদের সামনেই বলতে থাকেন, আপনি তো

---

[৬৫] আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.

মাজমাউল বাহরাইন![৬৬] আপনার সামনে হাদিস পড়া চূড়ান্ত বেআদবি! সুবহানাল্লাহ! শেষ পর্যন্ত মুহাদ্দিস সাহেবকে অনুপস্থিতই থাকতে হয়েছিল।

দফতরে বসেও যখন বানুরি মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের কথা স্মরণ করছিলেন, তখন আমার বুকটা গর্বে ফুলে যাচ্ছিল। আপনার জন্য দুটো চিঠি আছে- একথা জানাতেই উনি কথা না বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি সযত্নে রক্ষিত চিঠি-দুটো তাঁর হাতে তুলে দিই। সাথে সাথেই উনি খুলে পড়তে লাগলেন। আমার ব্যাপারে দুটো চিঠিতেই সুপারিশ ছিল। সেগুলো পড়ে উনি আবার আমার দিকে তাকালেন। এবারের চাহনিতে ছিল পরখ করার তীক্ষ্ণদৃষ্টি। আপনি তাহলে তাকমিল করে এসেছেন? আমি তো ভেবেছিলাম মিশকাতে ভর্তি হবেন![৬৭] মাশাআল্লাহ। তো আপনার ইচ্ছা কী এখন? মুহাদ্দিস সাহেবের কাছে দাওরা পড়ে এখানে কী নিতে এসেছেন? আমি আমতা আমতা করে জানাই, এখানে দাওরা পড়তে এসেছি। আমার এই জবাবে উনি সামান্য সময়ের জন্য ভাবনায় ডুবে গেলেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি চাইলে ভর্তি হতে পারেন। কিন্তু শুধু ক্লাস করবেন। আর হাদিসের শুরুহাত (ব্যাখ্যাগ্রন্থাদি) মুতালায়া করবেন। এই বলে উনি চিঠির উলটো পিঠে নিজে সামান্য কিছু লিখে দিলেন। এরপর বললেন, ভর্তি ফরমের সাথে এটি যুক্ত করে দেবেন।

আমি খুশি মনে বের হয়ে এসে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। এতবড় ব্যক্তিত্বের সাথে একা সাক্ষাত করে এসেছি। বিশাল ব্যাপারস্যাপার বলে মনে হচ্ছিল তখন! জীবনের কত বিচিত্র অনুভূতি!

এরপর ফরম সংগ্রহ করে দাওরার জন্য তা পূরণ করে সাথে বানুরি হজরতের চিঠি যুক্ত করে নিলাম। জমা দেওয়ার জন্য দফতরে গেলাম ফাইল নিয়ে। সেখানে তখন দায়িত্বে ছিলেন হজরত মাওলানা হামিদ মিয়াঁ সাহেব। উনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস বদরে আলম মিরাঠির বড় ভাই। সবাই মুহাজির। বানুরি সাহেব বড় বড় মুহাজির আলিমকে একত্র করেছিলেন নিউটাউনে। এজন্য নিউটাউনের ফারেগদের মাঝে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলোর প্রতি জজবা বেশি থাকে। এটা নিউটাউনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। হামিদ মিয়াঁ সাহেব[৬৮] হুজুরের কাছে সালাম দিয়ে ফরম জমা দিলাম। চশমার মোটা ফ্রেমের ভেতর দিয়ে তাকালেন অভিজ্ঞ এই ব্যক্তিত্ব। আপনি তাহলে সুপারিশওয়ালা ভর্তিচ্ছু! দাওরা পড়ে এসেছেন? যোগ্যতা আছে তো? বানুরির কাছে পার পেয়ে একটু আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। তাই জবাব দিলাম, জি হজরত,

---

[৬৬]. মুহাদ্দিস সাহেব শাইখুল হিন্দ এবং শাহ সাহেব দুজনেরই শাগরেদ ছিলেন।

[৬৭]. হজরতের শারীরিক গঠন খুবই হাল্কা-পাতলা হওয়ায় এমন ধারণা করেছিলেন বোধহয়।

[৬৮]. বদরে আলম মিরাঠীর বড় ভাই তিনি। এতটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট!

চাইলে পরীক্ষা নিন। এতে তিনি হয়তো কিছুটা নারাজ হন। তাই পরীক্ষকের কাছে ফরমে লিখে দেন, 'জারা ছান বিন কারকে ইমতেহান লেনা!' আমি তো ফরমে এমন লেখা দেখে ভয় পেয়ে যাই। হায় আল্লাহ! সুপারিশে না ভর্তি সহজ হয়ে যায়! আমার তো দেখছি কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এ কোন মুসিবতে পড়লাম!

অগ্নিপরীক্ষা

১৫ তারিখ সকালে পরীক্ষার দিন ছিল। ইজহার ভাই আমাকে সাহস দিয়ে বিদায় দিলেন। দরুদ শরিফ পড়তে পড়তে নির্ধারিত ভবনের দিকে গেলাম। গিয়ে দেখলাম প্রথমে আমারই সিরিয়াল পড়েছে। একে একে অনেকেই এসে সিরিয়াল নিল। এক বাঙালি ভাইকে পেলাম। সে জিরিতে আমার এক বছর নিচে ছিল। অর্থাৎ সে মিশকাত পড়ে এসেছে। কিন্তু এখানে দাওরা পড়বে। আমি তাকে মেশকাতের জন্য পরামর্শ দিলাম। কিন্তু সে আমতা আমতা করল। বুঝলাম সে বছর 'নষ্ট করতে চায় না!' এই বছর যাত্রাবাড়ির মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবও[৬৯] এসেছিলেন মেশকাতে ভর্তি হতে। যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু হলো। পরীক্ষা নিলেন মাওলানা ফজল মুহাম্মদ সোয়াতি সাহেব। আমাকে তরজমাতুল কুরআন থেকে (সুরা ইউসুফে বর্ণিত সাবরুন জামিল বিষয়ে) প্রশ্ন করলেন। আর কিছু হাদিসের কিতাব (হাদিসের ভাষ্য- মা লাম ইয়াতাফাররাকা) থেকে। হামিদ মিয়াঁ সাহেব হুজুরের সেই অনুরোধ আমার মাথায় ছিল। তাই ঠিকঠাক জবাব দিলেও ভিন্ন কিছুর আশংকা ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে। আমি কি সুযোগ পাব বানুরির দরসে বসার!

পরীক্ষা দিয়ে এসে খুব দোয়ায় লেগে গেলাম। জোহরের পর ফল এলো। আল্লাহর দয়ায় নিউটাউনে আমার মতো অযোগ্য তালিবের সুযোগ হয়ে গেল। ভর্তি পরীক্ষায় ফজল মুহাম্মদ সাহেব আমাকে ৫০ এর মধ্যে ৪৮ দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! এভাবে আল্লামা বানুরির দরসে বসে হাদিস শোনার সৌভাগ্য আমার হাতে এসে ধরা দেয়। এই দফা সালাতুশ শুকর আদায় করি।

---

[৬৯]. ১৯৫০ সালে, ময়মনসিংহ জেলার সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষণজন্মা এই মনীষী। পড়াশোনা করেছেন দেশের খ্যাতনামা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে। পরবর্তীতে পাকিস্তানে আল্লামা বানুরির কাছে হাদিস পড়ার জন্য গমন করেন।

কর্মজীবনে তিনি যাত্রাবাড়ী মাদরাসার মুহতামিমের দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছেন। গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের জুমার নামাজ পড়িয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে। লিখেছেন বহু গ্রন্থ। দেশের উলামায়ে কেরামের অন্যতম প্রধান মুরুব্বি হিসেবে এখন তাঁর অবস্থান। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনে বরকত দান করেন। আমিন।

তিক্ত ক্ষণগুলো

জিরিতে দাওরার বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে পড়ল। বলে রাখি একটু! অনেকের জন্য শিক্ষার উপকরণ হতে পারে।

আসলে বলার মতো বেশ কিছু ঘটনাই আছে। যখন আমরা জামাতে দোওমে পড়তাম, তখন খুব ভালো একজন ছাত্রভাই যোগ্য এক উসতাদের সাথে বেআদবি করেছিল। উসতাদজি ছিলেন খুব নাজুক স্বভাবের। তিনি এই বেআদবি সহ্য করতে পারেননি। উনি একদিন আমাদের বললেন, তিনি মাদরাসা থেকে বিদায় নেবেন। আমরা শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। এত যোগ্য উসতাদ! উনি চলে গেলে মাদরাসার বিরাট ক্ষতি হবে। আমরা সবাই মিলে উনাকে অনুরোধ করি এবং বলি, আপনি ওই ছাত্রভাইকেই ক্লাস থেকে বের করে দিন, যেন সে আপনার ক্লাসে উপস্থিত না থাকে। এতে আপনার আর কষ্ট হবে না। উসতাদজি আমাদের পরামর্শে তাকে ক্লাস থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলেন, আপনাকে আর এ বছর আমার ক্লাসে উপস্থিত থাকবে হবে না। কিন্তু সেই ছাত্রটি সত্যিই বেআদবপ্রকৃতির ছিল। এর চেয়েও বড় কথা, সে ছিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতার আত্মীয়। ফলে তার মধ্যে একধরনের আত্মম্ভরিতা কাজ করত। অন্য ছাত্রভাইদের সাথেও সে প্রায়শই বেআদবি ও রূঢ় আচরণ করে বসত। তার ব্যাপারে নালিশ খুব একটা কাজে আসবে না ভেবে সবাই তার এসব আচরণ সয়ে নিয়ে চলত। এবার উসতাদজি যখন তাকে এই ঘোষণা শুনিয়ে দিলেন, তখন সে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। অ্যাঁ! আমাদের মাদরাসা আর আমাকেই ক্লাস থেকে বের করবে! হতেই পারে না! বের হলে সে-ই বের হয়ে যাক। একধাপ আগে বেড়ে সে উলটো অন্য এক প্রবীণ উসতাদের কাছে নালিশ করে বসে। সে জানায়, তাকে অকারণে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সাথে সেই উসতাদজির ব্যাপারে আরো উলটাপালটা বলে কানভারিও করে সে। প্রবীণ উসতাদজি যেহেতু বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন, তাই মূল ঘটনা বুঝে ফেলেন তিনি। অত্যন্ত কৌশলে সেই ছাত্রভাইকে একটু বকে দেন। এ সময় সেই ছাত্র তার পছন্দের এই উসতাদকে আমাদের উসতাদজির বরাতে এই কথা বলে যে, তোমার মধ্যে যদি বেআদবি থাকে তাহলে সেটাই হয়তো তোমাকে শেখানো হয়েছে! আদবওয়ালা কামরা থেকে সম্ভবত তুমি আসোনি। এই কথার মাধ্যমে সেই ছাত্রভাই মূলত তার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে অন্য উসতাদের সাথেও যুক্ত করে দেওয়ার পাঁয়তারা করছিল। অথচ বাস্তবে কিন্তু আমাদের উসতাদজি এমন কিছুই বলেননি, যা অন্য উসতাদ বা প্রতিষ্ঠানকে পীড়া দেয়।

কানভারির এই ঘটনায় সেই প্রবীণ উসতাদজিও নারাজ হন। এত বড় স্পর্ধা তার! সে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই দুই উসতাদের মাঝে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আমাদের উসতাদজি মুহতামিম সাহেবকে গিয়ে ঘটনার আদ্যোপান্ত খুলে বলে দাবি জানান, এই বেআদবির বিচার করতে হবে। নাহলে আমিই অব্যাহতি নিয়ে চলে যাব। ওদিকে সেই প্রবীণ উসতাদজিও মুহতামিম সাহেবকে আমাদের উসতাদের ব্যাপারে নালিশ করেন। তাকে অব্যাহতিদানের দাবিও জানান। মুহতামিম সাহেবের জন্য এটি খুবই কঠিন মুহূর্ত ছিল। সকল প্রবীণ উসতাদের উপস্থিতিতে পরামর্শ চাওয়া হয়। সবাই পরিস্থিতির নাজুকতা বুঝতে পেরে প্রবীণ উসতাদের বদলে নবীন উসতাদকে কৌশলে অব্যাহতির ব্যাপারে মত দেন। সদর মুদাররিস সাহেব ছিলেন সালেহ আহমদ সাহেব। উনি সেই নবীন উসতাদজিকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন সবকিছু। দেখুন! আমরা ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখেছি, আপনিই হকের উপর আছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে অনন্যোপায় হয়ে আপনাকে দু-মাসের জন্য অব্যাহতি দিতে হচ্ছে। এরপর যদি পরিস্থিতি অনুকূল হয় আমরা আপনাকে স্মরণ করব ইনশাআল্লাহ! এতে আমাদের উসতাদজি যা বোঝার বুঝে নেন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাদরাসা থেকে বিদায় নেন তিনি। ঘটনাটি আমাদের মনেও গভীর দুঃখের ছায়া রেখাপাত করে।

এই ঘটনার পর থেকে আমাদের ক্লাসে একটা অলিখিত বিভাজন তৈরি হয়। সেই বেআদব ছাত্রভাইয়ের উপর সবাই এতটাই ক্ষিপ্ত ও সংক্ষুব্ধ ছিল যে, তার সাথে সবাই কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিল। কেউ যদি কথা বলতে চাইত, তাহলে সেটাও লুকিয়ে বলতে হতো। সেই প্রবীণ উসতাদজিকেও ক্লাসের সবাই মিলে একটা চিঠি লেখে। সেখানে এই ঘটনার সূত্রপাত থেকে অদ্যাবধি সকল খুঁটিনাটি তুলে ধরা হয়। আমাদের উসতাদজির যে কোনোরকম ভুল ছিল না সেটিও উল্লেখ করা হয়। সবাই আশা করেছিল প্রবীণ উসতাদজি তার ভুল বুঝতে পেরে অন্তত দুঃখ প্রকাশ করবেন। কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে উনি কোনোই জবাব দিলেন না। এতে করে সেই ছাত্রের সাথে আমাদের স্থায়ী বৈরিতা তৈরি হয়।

বড় ছেলের বাড়ামো

এর দু-বছর পর যখন আমরা মিশকাতে উত্তীর্ণ হই, তখনও একটি ঘটনা ঘটে। এগুলো নেতিবাচক হলেও এতে শিক্ষণীয় উপাদান রয়েছে, বিধায় উল্লেখ করছি।

কিতাবি দরসের সময় আপনারা জানেন মতন পড়তে হয়। এক্ষেত্রে ছাত্রভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে একটি শৃংখলা তৈরি করে নেন কে কবে মতন পড়বে। কিন্তু আমাদের ক্লাসে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই শৃংখলা আলোচ্য ঘটনার পর আর টেকেনি। মিশকাত জামাত শুরু হবার পর থেকে মতন পড়ার একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেই ছাত্রভাইকে কোনোরকম সুযোগ না দেওয়ার জন্য আমাদের মধ্য থেকে কয়েক ভাই সবসময় মতন পড়ার জন্য তৈরি থাকতেন। ওদিকে সেই ভাইও তার কয়েকজন সাথিকে এই হিংসাত্মক প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেয়। ফলে প্রতিদিনই মতন পড়া নিয়ে ঘণ্টা শুরুর সময় একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হতো। একসাথে তিন-চারজন কিতাব নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। দৃশ্যটি দেখতে খুবই অস্বস্তিকর লাগত।

একদিন সন্ধ্যায় আমাদের উসতাদ ও আমার শ্বশুর মাওলানা মুফতি নুরুল হক সাহেবের দরসে এমনই এক ঘটনা ঘটে। প্রায় চারের অধিক ভাই কিতাব নিয়ে দাঁড়িয়ে যান মাতিন হিসেবে। কিন্তু কেউই পড়া শুরু করে চালিয়ে যেতে পারছিল না। সবার আওয়াজই একত্র হয়ে একটা গুঞ্জনের সৃষ্টি করে। ফলে লজ্জিত হয়ে সকলেই চুপ হয়ে যায়। মুফতি সাহেব এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন। কিতাব বন্ধ করে দেন তিনি। এরপর পেছন দিকে—যেদিকে একটা জানালা ছিল—ঘুরে যান। দীনি আদব সংস্কৃতিতে এই ভঙ্গি অত্যধিক পরিমাণে ব্যথিত হওয়াকে বুঝায়। আমরা একে অপরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলাম। চোখের ইশারায় একে অপরকে ঠেলতে লাগলাম যেন কেউ একজন সামনে এগিয়ে গিয়ে হজরতের কাছে মাফ চেয়ে নেয়। কিন্তু ভয়ে ও লজ্জায় কেউ সামনে যেতে পারছিল না। অবশেষে আমিই এগিয়ে গিয়ে হজরতের কাছে মাফ চাই। আমাদের ছেলেমানুষির জন্য দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করি। বলি, হজরত, আপনি আমাদের ঘণ্টা না নিলে আমরা কোথায় যাব? ভুল তো আমাদেরই হবে। আপনি যদি মাফ না করেন তাহলে তো আমরা বরবাদ হয়ে যাব। এমন কিছু আবেগঘন কথায় উনি কিছুটা স্থির হয়ে আবার ডেস্কের দিকে ঘুরে বসলেন। 'শুনুন! আপনারা যে এরকম আচরণ করবেন, আমি কখনো আশা করিনি। কিশোরবয়সি ছাত্ররা এমন করলে তাও সওয়া যায়। আপনারা একেকজন নওজোয়ান যুবক। দীনি তালিম অর্জন করছেন। হাদিসে নববির পাঠ নিচ্ছেন। আপনারা যদি দীনের খেদমতের জন্য সামান্য ধৈর্যধারণ করতে না পারেন তাহলে কারা এসব সিফাত ধারণ করবে বলুন! আপনাদের একটা ঘটনা শোনাই। হয়তো কিছুটা অনুপ্রেরণা পাবেন।

আমি যখন দারুল উলুম দেওবন্দে ছিলাম, তখন সেখানে মাদানিযুগ। দেওবন্দের স্বর্ণোজ্জ্বল সময়। আমি তখন দাওরায়ে হাদিসে। আপনাদের মতো মতন পড়ার জন্য আমাদের ক্লাসেও অনেক বাঘা বাঘা ছাত্রভাই, যারা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে জমায়েত হয়েছিলেন, হাদিসে নববি পাঠের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য সিরিয়াল ধরতেন। মাদানি রহিমাহুল্লাহ ক্লাসে এসে বসার পর মাতিনের নাম তার সামনে দেওয়া হতো। তিনি সেই ছাত্রভাইয়ের নাম উচ্চারণ করতেন। এভাবে একদিন হাটহাজারি মাদরাসার সাবেক শাইখুল হাদিস মাওলানা আবদুল আযিয সাহেব, যিনি তখন হজরত মাদানির খেদমতে ছিলেন, মাতিন হিসেবে আমার নাম লিখে দেন। কিন্তু নিয়ম ছিল যিনি মাতিন হবেন, তিনি সেদিনের জন্য হলেও প্রথম সারিতে এবং হজরত মাদানির ডেস্কের সামনে বসবেন। কিন্তু সামনে জায়গা পেতে হলে আপনাকে ক্লাস শুরুর অনেকক্ষণ পূর্বে এসে জায়গা ধরতে হতো। আর সেজন্য খুবই নিয়মানুবর্তী হবার পাশাপাশি কিছুটা শক্তিশালীও হওয়া লাগত। পাঠান আর পাখতুনদের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশাল ক্লাসরুমের প্রথম সারিতে একজন রোগাপটকা বাঙালির জায়গা করে নেওয়া ছিল খুবই কঠিন চ্যালেঞ্জ। বরাবরের মতো তাই আমি পেছনে অথবা যেখানে জায়গা পেতাম, সেখানেই বসে যেতাম। কিন্তু সেদিন মাতিন হিসেবে হজরত মাদানি যখন আমার নাম ঘোষণা করলেন, তখন সাধারণ দিনের চেয়ে আমি আরো পেছনে! নাম শোনার সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে গেলাম। মাদানি কিছুটা বিরক্তির সাথেই জোর গলায় বলে উঠলেন, ভাই, মতন পড়বেন তো পেছনে বসেছেন কেন? এই, আপনারা উনাকে সামনে আসতে দিন। আমি কম্পিত পায়ে সামনে এগিয়ে যাই। ভয়ে ভয়ে ইবারত পড়তে শুরু করি। নির্দিষ্ট পরিমাণ ইবারত পড়া শেষ হলে মাদানি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা দিলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে এই চাঁটগামী সাহেব তিনদিন এবং অন্যরা সিরিয়াল অনুযায়ী তিনদিন মতন পড়বেন।

এই ঘোষণা ক্লাসের সকলের উপর একইসাথে নেতিবাচক এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলল। অনেকে খুশি হয়ে মোবারকবাদ জানাল। এমন একজন সহপাঠী পাওয়া গেছে, যাকে মাদানি রহিমাহুল্লাহ সপ্তাহে তিনদিন মতন পড়ার জন্য নির্বাচিত করেছেন! আবার যারা নিয়মিত মতন পড়তেন, তারা এটাকে ভালোভাবে নিতে পারলেন না। নানা ধরনের কানাঘুষা শুরু হলো। আমি খুব নাজুক স্বভাবের মানুষ। এসব সহ্য হচ্ছিল না। একদিন হজরত মাদানির কাছে সরাসরি সাক্ষাত করে বিষয়টি খুলে বললাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন তালিবে ইলমদের এমন হিংসাত্মক আচরণে।

'ভাই! কিছু মনে করো না। জমানা আখেরি চলছে। পরিবেশ মানিয়েই চলতে হবে। দিনশেষে এরাই উম্মতের রাহবারি করবে। কী করবে বলো!' এমনই ছিল হজরত মাদানির বক্তব্য। এরপর তিনি ক্লাসে এসে খুব স্বল্পকথায় সবাইকে ইসলাহি নসিহত করেন। সাথে সামান্য সতর্কও করে দেন। আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানান যে, আমি প্রতি সপ্তাহে একদিন (সম্ভবত সোমবার) মতন পড়ব। বাকি দিনগুলো সবাই ভাগ করে নেবে। এভাবে উত্থিত সমস্যাটি নিরসন করা হয়।

কিন্তু সেখানে ছাত্রভাই থাকত এক ক্লাসে একশর বেশি। তারা আসত সারা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। ফলে একটা প্রতিযোগিতাময় পরিবেশ ছিল মতন পড়ার জন্য। অথচ এখানে আপনারা মাত্র কজন, তবু সামান্য ছাড় দেওয়ার মনোভাব নেই। খুবই আফসোসের বিষয়। মতন পড়া না ফরজ, না সুন্নাত। মুবাহের মধ্যেও পড়ে না। বরং অন্যকে সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে আপনারা সবর ও ঈসারের চর্চা করতে পারতেন, যা অত্যন্ত উন্নতমানের ইসলামি সিফাত। আমি আশা করব, আপনারা ভবিষ্যতে এই ধরনের নীচ মানসিকতা প্রদর্শন করবেন না।'

নিজেদের সামলে নেওয়া

এরপর থেকে ক্লাসে আমাদের যে ভাই নাজিম হিসেবে দায়িত্বে থাকতেন, তিনি কঠোরভাবে আমাদেরকে নিষেধ করে দেন ইবারত পড়া নিয়ে যেন কখনোই আমরা উন্নাসিকতা না দেখাই। যেকেউ চাইলে ইবারত পড়বে; কিন্তু কোনো গোলযোগ যেন সৃষ্টি না হয়। এভাবে মুফতি সাহেবের বছর অতিক্রান্ত হয়। দাওরার বছরের শুরুতেই আমরা আলোচনায় বসে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিই যে, সেই ভাইকে—যিনি সবসময় সকলের থেকে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন—সপ্তাহে কয়েকদিন ইবারত পড়তে দেওয়া হবে। অন্যান্য দিন আমরা সকলে ভাগাভাগি করে ইবারত পড়ে নেব। এতে করে ফিতনা হবে না এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের মেজাজ এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সকলেরই ধারণা ছিল। তার ক্লাসে যদি কোনো ধরনের অসংলগ্ন আচরণ প্রকাশ পায়, তাহলে সারা বছরের জন্য ক্লাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মিটিংয়ে সিদ্ধান্তের পর সকলেই খুব কঠোরভাবে সেটি আমল করেছিলেন। ফলে সারা বছর দাওরার ক্লাসে আমাদের কোনো ধরনের পারস্পরিক সমঝোতা বিনষ্ট হয়নি। কিন্তু মানুষকে তার স্বভাব সবসময় তাড়িত করে থাকে। মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর আমাদের মিশকাতের ঘটনা আদ্যোপান্ত জেনেছিলেন। সর্বশেষ ক্লাসে অর্থাৎ খতমে বুখারির মাহফিলে ইবারত কে পড়বে, এ নিয়ে

গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে, মুহাদ্দিস সাহেব তা খুব ভালোভাবেই টের পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি অবলম্বন করেন একটি অভিনব উপায়।

নববি হেকমত

মাহফিলের দিন আমরা সকলেই প্রস্তুত হয়ে কিছুটা দুরুদুরু বুকে বুখারি শরিফ হাতে নিয়ে নিজেদের আসন গ্রহণ করি। আমাদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, সেই ভাইটি যদি ইবারত পড়তে চান, তাহলে কেউ তাকে বাধা দেবে না। সনদ হাসিল করা ও মুহাদ্দিস সাহেবের দোয়া লাভ করাই যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য; তাই এ বিষয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু মুহাদ্দিস সাহেব আমাদের সাথে ইনসাফ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের এতদিনের সবরের একটি ফল আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে আমাদের প্রদান করেছিলেন। প্রথমে কিছুক্ষণ মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর শেষসবক প্রদানের পূর্বে ছাত্র-জনতার উদ্দেশে নসিহতমূলক আলোচনা করলেন। এরপর তিনি ইবারত পাঠ করার একটি মৌলিক নীতি আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আপনারা সকলেই জানেন, ইবারতপাঠের দুটি মৌলিক পদ্ধতি রয়েছে। একটি শিক্ষকের উদ্দেশে ছাত্রের পাঠ, অপরটি ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের পাঠ। আপনারা সারা বছর একটি পদ্ধতির উপর আমল করে এসেছেন। শিক্ষকের উপর ছাত্র ভাইয়েরা পাঠ করে এসেছেন। সুন্নাতের উপর আমল করা উত্তম। তাই আজ আমি অপর পদ্ধতির উপর আমল করে আপনাদের ইবারতপাঠের পূর্ণাঙ্গ সুন্নাত আদায় করতে চাচ্ছি। আপনারা এটাও জেনে রাখবেন, ইবারত পাঠের এই পদ্ধতিটিই উত্তম। এই বলে তিনি শেষসবক পাঠ করে ফেলেন। এভাবেই দীর্ঘ দুই বছর সবরের একটি চূড়ান্ত ফল আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রদান করেন।

আমরা কে কজন!

আমার সহোদরদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তাদের নিয়েও সামান্য স্মৃতিচারণ করা যাক!

আমি আমার পিতার বড় সন্তান। আমার পরে এক ভাই ও বোন ছিল। তারা বাল্যকালেই ইনতেকাল করেন। একজনের নাম ছিল আনোয়ারা অপরজনের নাম আবুল হাশেম। একজন সাত বছর বয়সে এবং অপরজন এগারো বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। আনোয়ারার মৃত্যু হয়েছিল নিউমোনিয়ায়। এরপরে আমার একটি বোন জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় লাইলা বেগম। সর্বশেষ আমার একটি ছোট ভাইয়ের জন্ম হয়। তাকে মাস্টার কাশেম (আবুল কাশেম) নামে ডাকা হতো। আব্বা তাকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত ইংরেজি পড়িয়েছিলেন। এরপর সে কিছুদিন আব্বার সাথে

চাষাবাদের কাজ করে। পরবর্তীকালে যখন আমি করাচিতে চলে যাই, তখন জিরি মাদরাসায় ইংরেজির শিক্ষকের প্রয়োজন পড়েছিল। তারা আমার ভাইয়ের ব্যাপারে জানার পর তাকে সেখানে চাকরির প্রস্তাব দেয়। মাস্টার কাশেম চাষাবাদ ছেড়ে জিরিতে চাকরি করতে চলে যান। পরে আব্বা-আম্মা ইনতেকাল করলে বাড়িঘর ও জমিজমা দেখাশোনার জন্য চাকরি ছেড়ে তিনি পুনরায় বাড়িতে ফিরে আসেন।

আমার আম্মার পূর্বে আব্বাজান আরো একটি শাদি করেছিলেন। সেই আম্মুর গর্ভে দুটি সন্তান হয়েছিল। দুজনই পুত্র সন্তান ছিলেন। আমার সেই আম্মু অত্যন্ত সুন্দরী এবং খানদানি ছিলেন। আব্বু বলতেন, তোমার সেই আম্মাজান সের ভরা[৭০] সুন্দরী ছিলেন। বংশীয় আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের কারণে তিনি কখনো কখনো আব্বুর সাথে বেআদবি করে বসতেন। এভাবে একদিন চূড়ান্ত বেআদবির ফলে আব্বু তাকে তালাক প্রদান করেন। বড় আম্মু তার দুই সন্তান নিয়ে বাবার বাসায় চলে যান। আমার নানাজান অত্যন্ত গম্ভীর এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এত ভালো পরিবার এবং এত ভালো জামাই থেকে তালাক গ্রহণ করার ফলে তিনি বড় আম্মুর উপর অত্যন্ত নাখোশ হন। নিজ বাড়িতে তাকে একটি ঘর প্রদান করেন ঠিকই; কিন্তু কথাবার্তা বন্ধ রাখেন। আম্মু নিজের ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হন। দিন-দিন রোগশোকে কাতর হয়ে পড়েন। এরই মাঝে আমার এক ভাইয়ের নিউমোনিয়া হয়। সে কিছুদিনের মাঝে মারাও যায়। সন্তান হারিয়ে আম্মু পাগল হয়ে পড়েন। এদিকে ছোট আরেক ভাই, যার বয়স তখন এক বছর ছিল, তাকে দেখাশোনাও আম্মুর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। নানা ব্যতীত ঘরে এমন কেউ ছিল না, যে ছোট্ট সন্তানটিকে দেখভাল করবে। ফলে আল্লাহর হুকুমে সেই ভাইটিও ইনতেকাল করে। দুটি সন্তান হারিয়ে আম্মু একদম দিশেহারা হয়ে পড়েন। একদিকে নানার অসন্তুষ্টি অপরদিকে স্বামীহারা অবস্থায় সন্তানদের বিয়োগ তাকে দুনিয়াত্যাগী করে ফেলে। আল্লাহ তায়ালার হুকুমে কিছুদিনের মধ্যে বড় আম্মুও দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। এই সবকিছু মাত্র ছয় মাসের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাত দান করুন।

আব্বাজান বড় আম্মুকে তালাক দেওয়ার পরে আমার দাদাজান অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। আব্বুর সাথে পরবর্তী বিয়ের ব্যাপারে কখনো কখনো পরামর্শ করলেও

---

৭০. সের ভরা অর্থ পূর্ণ বা অত্যন্ত অর্থে নেওয়া যেতে পারে।

আব্বু চুপচাপ থাকতেন। মূলত আব্বুও বড় আম্মুকে অনেক ভালোবাসতেন। এটা বেশ স্বাভাবিক ছিল। তালাকের পর আম্মুর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ তাকেও নাড়িয়ে দিয়েছিল। এসব শোক হজম করতে আব্বাজান একটু সময় নিচ্ছিলেন। সে সময় আমার আম্মু একজন কিশোরী বালিকা ছিলেন। ইতিপূর্বে হয়তো আপনাকে বলেছি যে, আমার আম্মু আমার আব্বুর চাচাতো বোন ছিলেন। একদিন আমার নানাজান আমার দাদাজানকে আম্মু এবং আব্বুর বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দেন। নানাজান প্রস্তাবটি বিবেচনা করে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন; কিন্তু আব্বুর বিয়ের পূর্বেই নানাজান ইনতেকাল করেন। ফলে আম্মুর বিয়ে আমার দুই মামু অর্থাৎ আলিম মামু এবং ছোট মামু মিলে দিয়েছিলেন। এজন্য আমাদের জায়গা-জমি এখনো একই জায়গায় পড়ে রয়েছে।

আহ! আম্মাজান!

আম্মাজানের কথা যখন এলোই, তার ব্যাপারে কিছু স্মৃতিচারণ করতে চাই। আশা করি, আপনাদের ভালো লাগবে।

আমার আব্বাজান এবং আম্মাজান ইনতেকাল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে জান্নাত দান করুন। আমার প্রথম বিয়ের পর আমি যখন করাচি চলে আসি, তখন আব্বা ইনতেকাল করেন। আব্বার ইনতেকালের দিন আমি স্বপ্নেই খবরটি পেয়েছিলাম। পরদিন সকালে টেলিফোনের মাধ্যমে সরাসরি সংবাদটি পাই। আব্বাজান মৃত্যুর পূর্বে অত্যন্ত সুস্থমস্তিষ্কে কিছু অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। আম্মাকে বলেছিলেন, 'শোনো, আমার কোনো দেনা-পাওনা নাই। আমার জানাজায় যদি আবদুস সালাম আসতে পারে, তাহলে তাকে জানাজা পড়াতে বলবে। আর যদি সে আসতে না পারে তাহলে আমার এক জামাতা মাওলানা কারি কবির আহমদ আছেন, যিনি সুলতান নানুপুরির খলিফা, তাকে জানাজা পড়াতে বলবে।' এই বলে তিনি আল্লাহ তায়ালা হুকুমে চিরবিদায় নেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আব্বুর পাঁচশত টাকা দেনা ছিল। এ দেনাটি ছিল তার খুবই নিকটতম সাথির নিকট। তিনি এটি আম্মুকে জানিয়ে তাকে কষ্ট দিতে চাননি। স্বপ্নে তিনি আমার সাথে দেখা করে আমাকে দেনার ব্যাপারে জানান। পরবর্তী সময়ে আমি এক সপ্তাহ পরে দেশে ফিরে সেই চাচার সাথে দেখা করে জানতে পারি যে, সত্যিই আব্বা তার কাছে ৫০০ টাকা ঋণী ছিলেন। আমি অত্যন্ত আদব-মহব্বতের সাথে তার সেই দেনা পরিশোধ করি।

আমার আম্মাজান খুব নেককার ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগিতে সময় কাটাতেন। আমি যখন প্রথম বিয়ে করে স্ত্রীকে দেশে রেখে করাচি আসি, তার কিছুদিন পরে আমার ছোটভাই মাস্টার কাশেম বিয়ে করেন। বৌমা তার নিজের পছন্দের ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তাই আম্মা আর কিছু বলেননি।[৭১] তবে বাড়িতে কিছুদিনের মধ্যেই দুই বউয়ের মাঝে একটু দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পারস্পরিক এই দ্বন্দ্বে আমার মা পিষ্ট হতে থাকেন। কমে যায় তার খেদমত। এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখি, আমার আম্মা আমার কাছে এসে কাতর স্বরে অভিযোগ জানাচ্ছেন, বাবা! তোরা বিয়েশাদি করেছিস ভালো কথা। আমার একটুও খেদমত কেউ করে না। আমি তো বুড়ো মানুষ! আজ রাতে আমার ভাগ্যে খাবার পর্যন্ত জোটেনি। ওরা দুজন ঝগড়া করে রান্নাবাড়া করেনি। পরবর্তীতে আমি দেশে এসে খোঁজখবর করে দেখি, সেই রাত্রে আম্মার সাথে ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছিল। আমার চাচা-মামাদের সাথে আমি পরিবারের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য পরামর্শে বসি। ভাই কাশেম সাথে ছিল। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত হয়, এখন দুই ভাইয়ের পরিবার পৃথক অবস্থান গ্রহণ করলে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা দুই ভাই আলাদা হয়ে যাই। আম্মা ১৫ দিন আমার বাসায় এবং ১৫ দিন ভাইয়ের বাসায় অবস্থান করতেন। আমার মাস্টার ভাই আব্বার ইনতেকালের কিছুদিন পূর্বে চাকুরি ছেড়ে আব্বার অনুরোধে আবার জমি-জিরাত দেখাশোনার কাজে ফিরে এসেছিলেন। ফলে দুই পরিবার আলাদা হয়ে গেলেও তিনিই দুই পরিবারের দেখাশোনা করতেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দান করুন। আমিন।

আমার জীবনের এই টুকরো গল্পগুলো আশা করি আপনাদের জীবনের কোথাও না কোথাও পাথেয় যোগাবে।

নিউটাউনের দিনগুলো

করাচিতে আসার পর নিউটাউনে ভর্তি হই। ভর্তির দুদিন পর থেকে ক্লাস শুরু হয়ে গেল। প্রথম ঘণ্টাতে মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেবের ক্লাস। উনার ভাগে ছিল তিরমিজি শরিফ। জিরিতে আমি মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ সাহেবের কাছে মুফতি সাহেবের অত্যন্ত প্রশংসা শুনেছিলাম। ফিকহের ক্ষেত্রে উনি নাকি সমকালীনদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাই যখন জানলাম মুফতি সাহেব ক্লাস নেবেন, মনটা আপনাতেই উৎসুক ও আগ্রহী হয়ে উঠল।

---

[৭১]. এখনকার মতো নিজ পছন্দে বিয়ের রেওয়াজ তখন ছিল না। এটাকে ভিন্নচোখে দেখা হতো।

যথাসময়ে একজন মৌলবি সাহেব এলেন। পরনে আলিগড়ি পাজামা। হাঁটু ছুঁই ছুঁই জামা। দেখে কিছুটা আমাদের দেশের আলিয়া মাদরাসার পরিবেশের কথা মনে হলো।[৭২] অথবা জামায়াতে ইসলামপন্থি ভাইদের মতো লাগল।[৭৩] আমি হতাশ হলাম। ভাবলাম হুজুর মনে হয় অসুস্থ। হয়তো অন্য কেউ এসেছেন ঘণ্টা নিতে। মসনদে বসেই হাদিস কাকে বলে? হাদিস বলতে আমরা কী বুঝি? এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আলোচনা চলতে থাকল। কিতাব উনার সামনে বন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকত। আমরাও সবাই কিতাব বন্ধ রেখেছিলাম। প্রথম সবকে হাদিসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, নীতিমালা এগুলো আলোচনা হতে থাকল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই মৌলবি সাহেবের দরস শুনতাম। কিন্তু মুফতি সাহেবের অনুপস্থিতির দুঃখ ভেতরে থেকেই গেল।

ভর্তির পর দ্বিতীয় তলায় ১৮ নম্বর কামরায় থাকতে শুরু করি। আমি যে বছর করাচি আসি, যাত্রাবাড়ির বর্তমান মুহতামিম আল্লামা মাহমুদুল হাসান সাহেব সে বছরই এসেছিলেন। উনি ভর্তি হয়েছিলেন মিশকাত জামাতে। উনার এক চাচাও এসেছিলেন সে বছর। আমাদের প্রিয় মুফতি ফজলুল হক আমিনী[৭৪] এসেছিলেন দু'বছর পর।

---

৭২. এখানে আলিয়া ঘরানাকে ছোট করা কখনোই উদ্দেশ্য নয়। বরং পাঠকের কাছে পরিচিত উপমার মাধ্যমে পরিবেশ বোঝানোর চেষ্টা মাত্র।

৭৩. এখানেও একই কথা। যদিও তাদের কিছু মৌলিক আকিদা ও চিন্তাধারার সাথে আলিমদের মতপার্থক্য রয়েছে।

৭৪. ফজলুল হক আমিনী (১৫ নভেম্বর ১৯৪৫ - ১২ ডিসেম্বর ২০১২) ছিলেন বাংলাদেশের একজন ইসলামি চিন্তাবিদ, ইসলামি আইনজ্ঞ (মুফতি) ও রাজনীতিবিদ। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম কওমি প্রতিষ্ঠান জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ১৫ই নভেম্বর বি-বাড়িয়া জেলার আমিনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও দীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বি-বাড়ীয়া জামেয়া ইউনুসিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন সিরাজদিখানের মুস্তফাগঞ্জ মাদরাসায় তিন বছর পড়াশোনা করেন। তারপর ১৯৬১ সালে রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসায় চলে আসেন। এখানে তিনি হজরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. ও হজরত হাফেজ্জী হুজুর রহ., কিংবদন্তি মুহাদ্দিস হজরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ রহ., শায়খুল হাদিস হজরত মাওলানা আজিজুল হক রহ., আরেফ বিল্লাহ মাওলানা সালাহ উদ্দীন রহ. এবং হজরত মাওলানা আবদুল মজীদ ঢাকুবী রহ.-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে দাওরায়ে হাদিসের সনদ লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে আল্লামা ইউসুফ বানুরির (রহ.) কাছে হাদিস পড়ার উদ্দেশে পাকিস্তানের করাচিস্থ নিউটাউন মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি উলুমুল হাদিসের উপর পাঠ গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসেন।==

সবক শুরু হবার পর মাওলানা ইদরিস মিরাঠি সাহেব হুজুর আমাকে তাখাসসুস ফিল হাদিসের কামরায় পাঠিয়ে দিলেন। দীর্ঘক্ষণ মুতালায়ার জন্য এই সুযোগ আমাকে দেওয়া হয়। হাদিসের প্রায় সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ সেখানে ছিল। আমাকে আদেশ দেন যেন আমি সাধ্যমতো কিতাব মুতালায়া শুরু করি। ফাতহুল মুলহিম তখন তিন খণ্ডে ছিল। পরে আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি[৭৫] সাহেব সেটি পূর্ণ করেন। আমি সে সময় তিন খণ্ডই মুতালায়া করি। বাজলুল মাজহুদ মুতালায়া করি। ফাতহুল বারিও শেষ করি। আরো পড়ি মাআরিফুস সুনান। আরফ শুজি ইত্যাদি। যেহেতু আমি শুধু দাওরার ঘণ্টায় বসতাম, তাই বাকি সময় ব্যাখ্যাগ্রন্থ অধ্যয়নেই চলে যেত।

==কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৭০ সালে। প্রথমে মাদরাসা-ই-নুরিয়া কামরাঙ্গীরচরে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ওই বছরই তিনি হজরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর কন্যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭২ সালে মাত্র নয় মাসে তিনি কুরআন শরিফ হেফয করেন। এ সময় তিনি ঢাকার আলু বাজারে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে আলু বাজার মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৭৫ সালে তিনি জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসার শিক্ষক ও সহকারী মুফতি নিযুক্ত হন। ১৯৮৪ সালে তিনি লালবাগ জামেয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতির দয়িত্ব পান। ১৯৮৭ সালে হজরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর ইনতেকালের পর থেকে তিনি লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদিসের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে পান বড়কাটারা হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব। ইনতেকালের আগ পর্যন্তই এই দুইটি মাদরাসার মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। পাশাপাশি ঢাকার কাকরাইল, দাউদকান্দির গৌরীপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মাদরাসার প্রধান অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আশির দশকের শুরু পর্যন্ত তিনি ছিলেন অতি মনোযোগী ও নীরবতাবাদী একজন মেধাবী আলিম-শিক্ষক। তার শিক্ষক ও অভিভাবক হজরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. তাকে রাজনীতিতে নামালেন। ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সেই যে নামলেন তিনি, আর সরে গেলেন না। তিনি যখন গেলেন তখন কোটি মানুষকে রাস্তায় রেখে একদমই তিনি চলে গেলেন।

রাজনীতির ময়দানে হুঙ্কার দেওয়া মুফতি আমিনী সেই অন্ধকার শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে অসহায়ের মতো, ভিক্ষুকের মতো, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মতো চিৎকার করে কাঁদতে থাকতেন। তার সঙ্গে সারাটা মসজিদ যেন কাঁদতে থাকত। মনে হতো তার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। কান্নায়-কষ্টে, আবেদনে-আবদারে, দুঃখে-কাতরতায় তিনি নুয়ে নুয়ে পড়তেন। অপরিহার্যভাবে এসব দুআয় তিনি দেশ, দেশের মানুষ, দেশের স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য বড় একটি সময় জোরে জোরে দুআ করতেন। ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর আমিনী ঢাকার একটি হাসপাতালে ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকার জাতীয় ঈদগাহ মাঠে ইসলামি রীতি অনুযায়ী জানাজা শেষে তাকে জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসায় দাফন করা হয়।

[৭৫]. আল্লামা তাকি উসমানি। নামটিই তাঁর পরিচয়। সমকালীন বিদগ্ধ আলিমদের একজন। বিশ্বজোড়া খ্যাতি তাঁর। জন্মেছেন ভারতের দেওবন্দে। বিখ্যাত পিতার সুযোগ্য সন্তান তিনি। আলিমসমাজে আলাদাভাবে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালা তাকে হেফাজতের চাদরে আবৃত রাখুন। আমিন।

আমাদের ক্লাসগুলো ভালোই চলছিল। নিয়মিত ক্লাসে বসতাম। আর মাগরিবের পর তাখাসসুসে গিয়ে মুতালায়া করতাম। আল্লামা বানুরি আমাকে এখানে বসতে অনুমতি দেওয়ায় আমার কী উপকার হয়েছিল, তা শুধু আমিই জানি। এরপর কিছুদিন পর প্রথম সাময়িক ইমতেহানে বসলাম। সব বিষয়ে ভালো নম্বর পেলাম। শুধু কম নম্বর পেলাম ইদরিস সাহেব হুজুরের খাতায়। আরো বেশি পাব এই আশায় হুজুরের সাথে দেখা করতে চলে যাই আমি! হুজুর হেসে বলেন কী জন্য এসেছ? আমি আপনার খাতায় ভালো লিখেছিলাম। কিন্তু আশানুরূপ নম্বর পাইনি। কত পেয়েছ? ৬০! মাশাআল্লাহ! এটা তো অনেক। আমার খাতায় ৬০ মানে অন্যের খাতায় ৯০ এর বেশি পাওয়া। এতে সান্ত্বনা পেয়ে চলে আসি। আসলে হুজুর খুব সূক্ষ্ম মেজাজের মানুষ ছিলেন। মেপে মেপে কথা বলতেন। ঘণ্টাতেও একই অবস্থা। তালিবে ইলম ভাইয়েরা উনার তাকরির পুরোটাই নোট করার চেষ্টা করতেন। এরপর পরীক্ষার খাতায় উনার মতো করেই জবাব লেখার চেষ্টা হতো। যারা যত বেশি হুজুরের মতো লিখতে পারত, তাদের তত বেশি নম্বর আসত। অন্যান্য খাতাতে দেখা গেল আমি ঠিকই আশির উপরে নম্বর পেয়েছি। সেই ইমতেহানে পঞ্চম হয়েছিলাম আমি।

স্মরণীয়দের শরণে

আমাদের আবু দাউদের দরস নিতেন ফজল মুহাম্মদ সাহেব। আমরা তাকে দরবেশ সাহেব বলতাম। সবচেয়ে বেশি যার তাকরির বুঝতে পারতাম, তিনি ছিলেন মাওলানা বদিউজ্জামান সাহেব হুজুর। তহাবি শরিফ পড়েছি তার কাছে। জোয়ান মানুষ, উদ্যমে পূর্ণ ছিল তাঁর মনোবল। নতুন মানুষ হিসেবে উনার তাকরিরটাই বেশি বুঝতাম আমি। নাসায়ি শরিফ আমরা পড়ি মাওলানা সাইয়েদ মিসবাহুল্লাহ সাহেবের কাছে। উনি সাদাত[৭৬] ছিলেন। আর বুখারি পড়াতেন বানুরি সাহেব নিজে।

বানুরিটাউনে দাওরার উসতাদদের কাছে পঠিত কিতাবের তালিকা

বুখারি (পূর্ণাঙ্গ)	আল্লামা বানুরি রহ.
আবু দাউদ (পূর্ণাঙ্গ)	মাওলানা ফজল মুহাম্মদ সাহেব
তহাবি শরিফ	বদীউজ্জামান সাহেব
নাসায়ি (পূর্ণাঙ্গ)	মিসবাহুল্লাহ সাহেব
তিরমিজি (পূর্ণাঙ্গ)	মাওলানা মুফতি ওয়ালি টুংকি
মুসলিম (পূর্ণাঙ্গ)	আল্লামা ইদরিস সাহেব

[৭৬]. সাইয়েদ বংশের লোকদের পাকিস্তানে সাদাত বলা হয়। সাইয়েদেরা নবীজির বংশধর।

আমাদের ক্লাস শুরু হবার এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমি আশায় ছিলাম মুফতি সাহেব কবে থেকে ক্লাস নেবেন। আলিগড়ি ধাঁচের পোশাকে এই হুজুর সাহেবই যে সব ক্লাস নিচ্ছেন! কেমন একটা ব্যাপার! কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় লাগত। আমাকে আবার সবাই বোকা না ভেবে বসে। যদি উনিই মুফতি সাহেব হন, তাহলে আমাকে সবাই এমনই ভাববে। আর যদি না হন, তাহলে তো উনি আসবেনই। এভাবে এক সপ্তাহ যাওয়ার পর আর থাকতে না পেরে এক বিশ্বস্ত ছাত্রভাইকে জিজ্ঞাসা করি, মুফতি সাহেব কোনজন আমাকে একটু বলবেন? উনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে দিলেন। বললেন আজ যিনি আসবেন তিনিই মুফতি সাহেব। আমি ভাবলাম মুফতি সাহেব মনে হয় এসেছেন। তাই খুব আগ্রহের সাথে সেদিন ক্লাস করতে গেলাম। গিয়ে দেখি সেই একই ভদ্রলোক এলেন! একই পোশাক, একই হাসি। সেই আগের মতো তার সাদাসিধে চলন। আমি অবাক হয়ে ছাত্রভাইয়ের দিকে তাকালাম। উনি ছোট্ট ইশারায় আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর বুঝলাম, প্রথম দিন থেকে যেই সাদাসিধা মৌলবি সাহেবকে দেখে এলাম তিনিই বিখ্যাত ওয়ালি হাসান টুংকি! কিছুটা বিস্মিত হলাম। আমি আশা করেছিলাম বানুরির মতো হাট্টাকাট্টা, লম্বা-চওড়া একজন বিশাল বপু, প্রচণ্ড রকমের গাম্ভীর্যপূর্ণ হবেন মুফতি সাহেব। কিন্তু! সবসময় আশানুরূপ হয় না সব ভাবনা!

মুফতি সাহেবকে তিরমিজি পাঠদানের দায়িত্ব দেওয়ার সময় হজরত বানুরি ভিন্ন কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ইসতিখারা করে মুফতি সাহেবের ব্যাপারে মনস্থির করেছিলেন যে, উনাকে দিয়েই তিরমিজি পড়াবেন। বানুরি চাইতেন মুফতি সাহেব ফিকহের মতো হাদিসও নিয়মিত পড়ান। তাই হাদিসের দরসের প্রতি শখ তৈরির জন্য তিনি মুফতি সাহেবকে দীর্ঘ এক বছর তাঁর তিরমিজির দরসে বসান। মুফতি সাহেবও আজব ধরনের বিনয়ী মানুষ ছিলেন। বিনাবাক্যব্যয়ে তিনি দরসে বসে পড়েছিলেন। এরপর থেকে তিরমিজি তিনিই পড়াতেন। একবার বানুরি নিজেই বলেছিলেন, আমার মন চায় আমি মুফতি সাহেবের দরসে তিরমিজিতে বসি। আমি যখন করাচি যাই তখন উনার তিরমিজির দ্বিতীয় বছর চলছে। উনি আমাকে অতিরিক্ত ফায়দার জন্য হিদায়ার ঘণ্টায় বসতে বলতেন, আমিও সৌভাগ্য ভেবে বসে যেতাম।

মুফতি সাহেবের পঠনরীতি

মুফতি সাহেবের তাকরির কিছুটা ভিন্নরকম ছিল। অনেকটা অভিনব পদ্ধতিতে পড়াতেন তিনি। আমি সামান্য কিছু ঝলক তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

মুফতি সাহেবের পঠনরীতি একটু বিচিত্র ধরনের ছিল। উনি বিষয়ের উপর মৌলিক ধারণা শিক্ষার্থীর মাঝে প্রোথিত করার উদ্দেশে শুরুতে কিছুদিন মৌখিক কিন্তু অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী আলোচনা করতেন। এতে ছাত্রদের মন-মগজে বিষয়ের উপর একটা মৌলিক ধারণা এসে যেত। তিরমিজির দরসেও এমন দেখলাম। প্রায় এক সপ্তাহ শুধু ইমাম সাহেবের জীবনী ও গবেষণাপদ্ধতির উপর আলোচনা চালিয়ে গেলেন। শুরুতে মনে হতো, কিতাব ছেড়ে উনি কী-সব বলেন! কিন্তু পরে তিরমিজি পড়ার সময় অনুভব করছিলাম কীভাবে ইমাম তিরমিজির চিন্তাধারা ও গবেষণাপদ্ধতি আমাদের অবচেতন মনে জায়গা করে নিয়েছে। মাসআলা বুঝতে কোনোরকম কষ্টই হতো না। পরবর্তীতে আমিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। জীবনভর। এভাবে ছাত্রভাইদের অনেক উপকার হতো। পরবর্তীতে তারাই উল্লেখ করেছে এসব ফায়দার কথা।

দরসের আল্লামা বানুরি

আল্লামা সাইয়েদ ইউসুফ বানুরির পঠনরীতি ছিল এককথায় অসাধারণ। প্রচণ্ড গতিশীল, ছন্দময় এবং একইসাথে তথ্যের প্রাচুর্যতায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এর কৃতজ্ঞতা থেকে সেই সময়ের মধুমাখা স্মৃতিময় সময়গুলোর হাল্কা রোমন্থন করছি।

কিন্তু আল্লামা বানুরির দরসের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন মুহাদ্দিস ছিলেন। পাঠান বংশীয়। অত্যন্ত গতিশীলভাবে তাকরির করতেন। চাইলেও উনার তাকরির সংকলন করা সম্ভব হতো না। একেক তাকরিরে ন্যূনতম বিশটি হাওয়ালা[৭৭] দিতেন। কখনো পঞ্চাশটিও ছাড়িয়ে যেত! কণ্ঠ ছিল ভরাট। মাউথপিস ছাড়াই সারা ক্লাসে উনার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ত। দেখতেও ছিলেন যুবরাজদের মতো। যখন হাদিস পড়তেন তখন মহব্বত ও জোশে চেহারা রক্তিম হয়ে উঠত। বানুরির ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রচুর কিতাব ছিল। প্রায়ই আফসোস করে বলতেন, এখনকার ছাত্ররা কিতাব খরিদ করতেই চায় না। আমার সময়ে আমি প্রতি বছর সব কিতাব কিনতাম। পরবর্তী বছরের শুরুতে পূর্বের কিতাবগুলো বিক্রি করে আবার নতুন কিতাব নিতাম। কিন্তু নিজের কিতাব ছাড়া অন্যের কিতাবে কখনো হাত লাগাতাম না। আর এখন! আল্লাহ মাফ করুন। আলিম হয়ে যায় অথচ কিতাবের ছোট একটা শেলফও থাকে না মাওলানাদের!

---

[৭৭]. তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স

আল্লামা বানুরির দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলাম। সেসময় আমার কাছেও তেমন কিতাবপত্র ছিল না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এর পর থেকে কিতাব সংগ্রহ করা শুরু করি, যে অভ্যাস আজও ধরে রেখেছি। নতুন কোনো কিতাব, যা আমাকে ফায়দা দিতে পারে, শুনলেই আমি সংগ্রহ করে নিতাম। এই যে এখানে আমার সংগ্রহে যেসব কিতাব রয়েছে, তার অধিকাংশই পাকিস্তান থাকতে সংগ্রহ করা। হাদিসের প্রতিটি গ্রন্থের কোনো না কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমার কাছে পেয়ে যাবেন।

আবাসিক চিত্রে নিউটাউন

নিউটাউনে ছাত্রদের আবাসন-সুবিধা থেকে শুরু করে অন্যান্য সুবিধা ছিল খুবই চমৎকার। প্রতিটি বড় রুমে ছয় থেকে আটজন আর ছোট রুমে তিন থেকে চারজন ছাত্রভাই থাকতেন। সকালবেলা আবাসিক ভবনের প্রতিটি রুমে একজন খাদেম সাহেব 'লো ভাই আপনা বন লে লো'[৭৮] বলে বলে করিডোরগুলোয় ঘুরতেন। আর রুমের সামনে এসে দুটি বা তিনটি করে বাটারবান দিয়ে যেতেন। দফতর থেকে প্রত্যেকের জন্য মাসিক হাতখরচা নির্ধারিত ছিল। সেখান থেকে অনেকে চা কিনে রাখত। সকালের নাশতা চা এবং রুটি দিয়ে খুব ভালোভাবেই হয়ে যেত। মাসিক কোনো বেতন ছিল না। সম্পূর্ণ ফ্রি ছিল নিউটাউনের পড়াশোনা। প্রতিদিন দুবেলা রুটি আর খাসি বা মুরগী অথবা গরুর গোশতের তরকারি থাকত। তবে বুধবার ছিল ভিন্নরকম। সেদিন থাকত রুটির সাথে মুগডাল। দুজন করে তালিবুল ইলম ভাই এক প্লেটে বসে যেতেন। কিছু ভাই ঘুরে ঘুরে খেদমত করতেন। বড় বড় তন্দুর রুটি দেওয়া হতো। জনপ্রতি দুটি করে। আমার মনে আছে, আমি কোনোদিন দুটো তন্দুর শেষ করতে পারিনি। আমার সাথে যে ভাই বসতেন তিনি আমার এই দুরবস্থা দেখে হাসতেন। সপ্তাহে একদিন বিরিয়ানি দেওয়া হতো। সেদিন একটু মন ভরে খেতাম। আর বেঁচে যাওয়া রুটি রুমে এনে রাখতাম। পরে মন চাইলে চা বানিয়ে তাতে ভিজিতে খেয়ে নিতাম। প্রতি রুমেই গ্যাসের চুলা এবং সিলিন্ডার রাখার সুযোগ ছিল। প্রত্যেক দারুল ইকামায় ফ্রিজেরও সুব্যবস্থা ছিল। যে যার খুশিমতো রান্না করেও নিতে পারত। এখন মাশাআল্লাহ হাটহাজারিতেও কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা চালু আছে। কিন্তু সেই জমানায় নিউটাউনে এই সুবিধাগুলো ছিল। এখন না জানি আরো কত সুবিধা চালু হয়েছে।

---

৭৮. এই যে ভাইয়েরা নিজেদের পাউরুটি নিয়ে নিন

ঈদস্মৃতি

ঈদুল আজহার খেদমতের ব্যাপারে একটু বলি। আমাদের দেশের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি ওখানে চালু আছে। প্রতিটি দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে অবশ্য ভাবা উচিত। কিন্তু উপমহাদেশ হিসেবে আমরা তুলনা করতেই পারি। এতে মনোবল ও সাহস বৃদ্ধি পায়। নতুন কর্মপন্থা বেরিয়ে আসে। অবস্থা পরিবর্তনের সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়। এভাবেই একদিন সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশ বাস্তবে রূপলাভ করে।

নিউটাউনে আমার প্রথম ঈদুল আজহা ঘনিয়ে আসছিল। আমিও কিছুটা রোমাঞ্চিত ছিলাম এই ভেবে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের গরু-খাসি জবাই দেব এবার! ঈদের দু'দিন পূর্বে বাঙালি বড়ভাইদের জিজ্ঞাসা করলাম ঈদের আয়োজনের ব্যাপারে। ওরা আমার জিজ্ঞাসায় হেসে দিল। বলল ঈদ আসুক, নিজেই দেখে নিয়ো আয়োজন। আমিও কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম। ঈদের আগেরদিন সন্ধ্যায় মাদরাসায় এ'লান করা হলো- যেসকল ভাই কুরবানির খেদমতে থাকতে আগ্রহী, তারা যেন নাম লেখায়। আমিও আগ্রহ সহকারে নাম লেখাতে গেলাম। কিন্তু আমার এক স্থানীয় সাথি আমাকে নাম লেখাতে দিল না। বলল তুমি এবার নাম লেখাতে যেয়ো না। তোমাকে এবার আমি সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব। ওর কথায় আর নাম লেখালাম না।

পরদিন আমার জন্য বিরাট বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ঈদের নামাজের পর স্বাভাবিকভাবেই ভেবেছিলাম, এখন ছাত্রভাইয়েরা দা-বটি-ছুরি নিয়ে তৈরি হবেন। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তারা বেশ স্বাভাবিকই থাকলেন। এরপর এ'লান হলো—যারা নাম লিখিয়েছেন, তারা দয়া করে কুরবানির ময়দানে চলে যান। আমি অবাক হচ্ছিলাম শুধু। তখন আমার সাথি জানাল এখানে একটা মাঠে যেতে হয়। সেখানে যেটা হতো, মাদরাসার পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করা হতো। প্রত্যেক মহল্লার লোকেরা নিজ নিজ এলাকার প্যান্ডেলে গিয়ে তাদের পশু কুরবানি করতেন। এরপর চামড়া সেই প্যান্ডেলে জমা হয়ে যেত। কর্তৃপক্ষ বা ছাত্রভাইদের এই চামড়ার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হতো না। মূল্য নিয়ে দামাদামি করাও লাগত না। কুরবানির পশুর গোশত যারা যতটুকু নিতে চান, নিয়ে চলে যেতেন। বাকি সব মাদরাসার জন্য থেকে যেত; গোশত, চামড়া সবই। জবাই ও চামড়া ছাড়ানোর জন্যও আলাদা পেশাদার কসাই শ্রেণি থাকত। মাদরাসার ছাত্রভাইদের কাজ হচ্ছে শুধু চামড়াগুলো পিক-আপ ভ্যানে উঠিয়ে দেওয়া। এতটুকুই কাজ! আমি শুনে থ বনে গেলাম। সে আমাকে বলল, চলো তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাই।

নির্দিষ্ট মাঠে গিয়ে দেখি ঠিকই। সাথিদের বলা তথ্যের সত্যতা শতভাগ। নিউটাউনের প্যান্ডেলের ওখানে গেলাম। যেহেতু দীর্ঘদিনের অভ্যাস; তাই কিছু কাজ না করে শান্তি পাচ্ছিলাম না। হাত লাগালাম সামান্য। আমি যখন গেলাম তখন প্রথম দিনের কাজ প্রায় শেষের পথে। উসতাদরা লিস্ট থেকে নাম ডেকে ডেকে সামান্য হাদিয়া দিচ্ছিলেন। আমার সাথি আমাকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে হাদিয়া নিয়ে দিল। দেখলাম হাতে একশ রুপির একটি নোট।[৭৯] বাহ! এতটুকুন খেদমত করে এত হাদিয়া! মাশাআল্লাহ! আসা দরকার তো তাহলে! সাথি আমার ভাবনা ধরতে পেরে হেসে দিল।

মাদরাসায় ফেরার সময় সাথিদের কাছে পুরো পদ্ধতির ব্যাপারে শুনলাম। ঈদুল আজহার এই খেদমতের চল পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শুরু হয়। মুফতি শফি সাহেব[৮০] এবং অন্যরা এই পদ্ধতি হিন্দুস্থান থেকে এনেছিলেন বলে শুনলাম। অর্থাৎ জনগণের কাছে গিয়ে গিয়ে সহযোগিতা গ্রহণের বদলে তাদের সাথে এমনভাবে আচরণ করা হয়, যেন তারা ইসলামি আদব অনুযায়ী তালিবুল ইলম ভাইদের খেদমতে নিজেরাই এগিয়ে আসে। আলহামদুলিল্লাহ! জনগণ তাদের এই আখলাকি শিক্ষা গ্রহণ করে নেয়। আজ পুরো পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে এই পদ্ধতি চালু আছে, মাশাআল্লাহ। আমাদের দেশে কেন এই পদ্ধতি এখনো চালু হলো না, এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি যেহেতু শুরু থেকে ছিলাম না; তাই এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য না করাই ভালো। তবে আমি চাই, তালিবুল ইলমের মর্যাদা ও সম্মান জাতি উপলব্ধি করুক। জাতির কর্ণধার আলিমদেরও উচিত জনগণের কাছে এই বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরা। জনগণ যেন স্বপ্রণোদিত হয়েই দীনের সহযোগিতায় নিজের আখেরাত আরো উন্নত করার স্বার্থে এগিয়ে আসে।

ঈদের তিনদিনই এভাবে খেদমত চলে। এই দিনগুলোতে মাদরাসায় উপস্থিত থাকা সকল তালিবুল ইলম ভাই প্রতিষ্ঠানের মেহমান হিসেবে থাকতেন। কুরবানির গোশত রান্না হতো সবার জন্য। কোনো মিসকিনের হাদিয়া হিসেবে নয়; বরং প্রতিষ্ঠানের সকলের প্রতি হাদিয়া হিসেবে কিছু পশু আসত। সেই জবাই করা গোশতই মেহমানদারিতে দেওয়া হতো। সকালে তন্দুরের সাথে গোশত, রাতেও গোশত-রুটি। কিন্তু দুপুরে হতো রাজকীয় খানা। পোলাও, বিরিয়ানি, কোর্মা, জর্দা, ফিরনি, পায়েস আরো কত কী! আমরা তো দেখেই পেট ভরিয়ে ফেলতাম।

---

৭৯. শিক্ষকদেরও দৈনিক হাদিয়া নির্ধারিত ছিল। প্রথমদিন পাঁচশ, দ্বিতীয়দিন তিনশ আর তৃতীয়দিন দুশ রূপি। ছাত্রভাইয়েরা পেত প্রথম দিন তিনশ, দ্বিতীয়দিন দুশ আর শেষদিন একশ রূপি হাদিয়া।

৮০. মুফতি তাকি উসমানির সম্মানিত পিতা। অবিভক্ত ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই মুফতিয়ে আজম ছিলেন। বিখ্যাত মা'আরেফুল কুরআন তার কালজয়ী তাফসির। আলিমসমাজে নামটিই তাঁর পরিচয়।

খেদমতের দ্বিতীয় দিন প্রত্যেক খাদেম ভাইকে ২০০ রুপি দেওয়া হতো, তৃতীয় দিন দেওয়া হতো ৩০০ রুপি। এর উদ্দেশ্য হলো, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে উপস্থিতির হার বাড়ানো। কারণ অনেকেই পরের দিনগুলোয় থাকতে পারে না। তাই একটু হাদিয়া দিয়ে আগ্রহী করা হতো তাদের।

জালালে ইদরিস

মাওলানা ইদরিস মিরাঠি সাহেব হুজুরের কথা বলি একটু। উনি খুব সরলপ্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলতেন অত্যন্ত শক্তভাবে। আমাদের সময় নাজিমে আলা ছিলেন। কাউকেই ছুটি দিতে চাইতেন না। জ্বর হলে বলতেন, তালিবে ইলমের আবার জ্বর হয় নাকি? আমার তো জীবনেও জ্বর আসেনি। জ্বর এলেই পড়তে বসতাম। জ্বর চলে যেত। উনি যখন এই দায়িত্ব ছেড়ে বেফাকের মহাসচিবের দায়িত্ব নিলেন, সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। অনেকে সদকাও করেছিল! হাহাহা! রহিমাহুল্লাহ!

উনার আরেকটি ঘটনা বলি। একদিন আমি তাখাসসুসের কামরায় বসে মুতালায়া করছি। হঠাৎ এক উকিল ভদ্রলোক এলেন। এক বড়ভাইকে বলে ফাতহুল বারি চেয়ে নিলেন। উনি সম্ভবত আইনি কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দেখতে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর মাওলানা ইদরিস সাহেব হুজুর তার স্বভাবমতো চক্কর দিতে এলেন। উনি একটা নিয়ম করেছিলেন অনুমতি ব্যতীত কেউ কখনো মুতালায়ার কামরায় প্রবেশ করবে না। কেউই না! এই ব্যক্তি তো এই নিয়ম জানত না, বড়ভাইও তাকে কিছু বলেননি। হুজুর যখনই কামরায় এলেন, নতুন মানুষটিকে দেখে উনার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। রাগে-ক্ষোভে তিনি কাঁপতে লাগলেন। সবাই ভয়ে চুপ। ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তাকে অনুমতি দিয়েছে? এত রেগে গিয়েছিলেন যে, ভদ্রলোকের সাথে সরাসরি কথাও বললেন না। এক বড়ভাই মাথা নিচু করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকে সামনে রেখে সবাইকে শুনিয়ে আরো কিছু বকাঝকা দিলেন তিনি। সবশেষে সেই ভদ্রলোককে সম্বোধন করে বললেন, হয়েছে আপনার? এরপর জবাবের অপেক্ষা না করেই তাকে বিদায় করে দিলেন। বিদায় করার সময় উনি বলেছিলেন, তাখাসসুসের তালিবে ইলম ছাড়া এখানে কেউ মুতালায়া করে না। বিনা অনুমতিতে আপনি কেন এসেছেন? হুজুরের এই কথা শুনে আমিও আস্তে করে কামরা ছেড়ে ভেগে গিয়েছিলাম সেদিন!

এরপর কয়েকদিন আমি আর তাখাসসুসের কামরার ছায়া মাড়াইনি। একদিন হুজুর বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আমি এই কদিন হুজুরকেও এড়িয়ে চলেছি,

ভয় ও শংকায়-না জানি কী বলে ধমক দেন আমাকে! কিন্তু সেদিন সামনে পড়ে গেলাম।

এই যে! আপনাকে আর দেখি না কেন? পড়াশোনা কি ছেড়ে দিয়েছেন?

আমি লজ্জাবনত ভঙ্গিতে বললাম, হজরত, আপনি তো সেদিন গাইরে তাখাসসুস সকলকে বের করে দিয়েছিলেন। তাই আমিও দাওরার ছাত্র হিসেবে বের হয়ে এসেছিলাম।

আরে না! আপনাকে কি আমি বের হতে বলেছি? আপনি পড়তে আসবেন। স্নেহ-ভালোবাসার স্পষ্ট ছাপ হজরতের কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল। এরপর থেকে আমি নিয়মিত আবার তাখাসসুসের কামরায় মুতালায়া করতে থাকি।

মাওলানা ইদরিস সাহেবের ইনতেকাল

মাওলানা ইদরিস সাহেব হুজুরের ইনতেকালের সময়টা আমার মনে পড়ে। উনি তখন জালালাইন পড়াতেন। সুরা ফাজরের শেষ আয়াত পড়ানোর সময় ছাত্রদের বলছিলেন, আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই। আমার শরীর এখন ভালো যাচ্ছে না। এই কথা বলে উনি দরস থেকে উঠে বসার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারলেন না। ছাত্র ভাইয়েরা ধরাধরি করে তাকে তার ছেলে মাস্টার শামিমের বাসায় নিয়ে যায়। সেই দিনগুলোতে উনার পুত্রবধূ শ্বশুরের খুব খেদমত করেছেন। হজরত যখন জালালাইন পড়াতেন, আমিও তখন প্রথম খণ্ড পড়াতাম। সুরা ফাজরের দরসের পর হজরত আর দরসে আসতে পারেননি। কিন্তু নাজিমে তালিমাত ছিলেন বিধায় মাদরাসায় আসতেন। দেখাশোনা করতেন। একদিন মাদরাসায় ছিলেন। হঠাৎ অসুখ বেড়ে যায় হুজুরের। ড. আবদুর রাযযাক ইস্কান্দার[৮১] সাহেব তখন নিউটাউনে ছিলেন। উনাকে জানানো হলে দৌড়ে আসেন হুজুরের কাছে। নার্ভ পরীক্ষা করে দেখেন হুজুর আর নেই। সাথে সাথে মাদরাসায় নিযুক্ত ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনা হয়। তিনি এসে আবারও নার্ভ

---

[৮১]. আবদুর রাযযাক ইস্কান্দার ১৯৩৫ সালে এবোটাবাড যিল হাযারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী এই মানুষটি একাধারে জামিয়া দারুল উলুম করাচি, বানুরি টাউন, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আল-আজহারে লেখাপড়া করেন। আল্লামা মুফতি শফি থেকে শুরু করে আল্লামা বানুরি, মুফতি ইউসুফ লুধিয়ানবি, শাইখুল হাদিস জাকারিয়ার বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। কর্মজীবনেও তিনি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছিলেন। পরে বেফাকুল মাদারিসের মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করেছেন। তার রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা অগণিত। অধিকাংশই আরবি ও উরদু ভাষায়। আত তরিকাতুল আসরিয়্যাহ তার বিখ্যাত রচনা। পাকিস্তান বেফাকের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত এই গ্রন্থটি। ইলমি সমুদ্রের এই মহান নাবিক ৩০শে জুন, ২০২১ সালে আখেরাতের সফরে রওনা দেন। রহিমাহুল্লাহু তায়ালা।

পরীক্ষা করে দেখেন, সত্যিই মাওলানা আর নেই। ইনতেকাল হয়ে গেছে তার। আপন রবের নিকট ফিরে গেছেন সন্তুষ্ট বান্দা। রহিমাহুল্লাহ!

পাঠানি উরদু

মাওলানা ইদরিস সাহেব হুজুর বাইয়্যিনাতের 'ইবর ও বাসাইর' নামে বানুরির যেই মাসিক রিসালাহ আসত, সেটি সম্পাদনা করে দিতেন। বানুরি হজরতের হয়ে দীর্ঘদিন তিনি এটি করে এসেছেন। বানুরি মূলত পাঠান ছিলেন। ফলে উরদুর মান অত্যন্ত উঁচুমানের হতো না। তাই তার রিসালাহ ইদরিস সাহেব কাঁটাছেঁড়া করে মানসম্মত করে নিতেন। এরপর পত্রিকায় আসত সেটি। মাঝেমধ্যে আল্লামা বানুরি আল-বাইয়্যিনাত অফিসে এসে নিজের ছেপে আসা রিসালাহ দেখতেন। আর হেসে হেসে ইদরিস সাহেব হুজুরকে বলতেন, আমি ঠিক এভাবেই লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তো আমিই! আপনি আমার মনের ভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেন মনে হচ্ছে, এটি আমারই স্বহস্তে লেখা কলাম! একথা বলে উনি জোরে হেসে দিতেন! আদহাকাল্লাহু সিন্নাহুম!

প্যারালাইজড আল্লামা বানুরি

আল্লামা বানুরি সাহেব একসময় প্যারালাইজড হয়ে পড়েন। তবু বুখারির সবক চলত। মাদরাসায় আসতে না পারলে নিজের বাসার উঠানে পড়াতেন। তার বাসায় একটা সুন্দর বড় উঠান ছিল। সেখানেই একটা আম গাছের নিচে উনি বসে থাকতেন। আমরা গিয়ে সবক পড়তাম। সব প্রতিষ্ঠানেই শেষসবকের সময় কিছু আয়োজন হয়ে থাকে। আমি জানতাম না নিউটাউনে কী হয়! কিছু ছাত্রভাইকে বলতে শুনলাম বানুরি সাহেব এগুলো পছন্দ করেন না। দারুল হাদিসে স্বাভাবিক বুখারি খতম হয়। কিন্তু আমাদের বর্ষের সবাই শেষসবকে একটু মিষ্টিমুখ করতে চাইল। আমি পরামর্শ দিলাম, যে যা পারে জমা দিক। নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ ধার্য না করা হোক। সবাই এই পরামর্শ পছন্দ করল। চাঁদা এভাবে প্রায় ৪৫০ রুপি পর্যন্ত উঠল। আমি এবং এক ছাত্রভাই সেই চাঁদা পকেটে করে বানুরি সাহেবের বাসায় যাই। তিনি তখন আরাম করছিলেন।

কেন এসেছেন?

দেখা-সাক্ষাতের জন্য।

তারপর, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

জি হজরত, আলহামদুলিল্লাহ।

কিছু বলবেন মনে হচ্ছে। বলে ফেলুন।

আমরা খতমে বুখারি মসজিদে করতে চাচ্ছিলাম।

হ্যাঁ, অবশ্যই। ইনশাআল্লাহ আমি মসজিদে উপস্থিত হব। যেহেতু আমি অসুস্থ, তাই দারুল হাদিসে যাওয়া আমার পক্ষে একটু কষ্টকর।

আমরা সামান্য মিষ্টিমুখের আয়োজন করতে চাচ্ছিলাম।

জনপ্রতি চাঁদা তুলেছেন নাকি?

জি না। যে যা পারে দিয়েছে। সবার থেকে চেয়ে নেওয়া হয়নি।

কত উঠেছে?

৪৫০ রুপি।

দিন আমাকে।

এই বলে উনি হাত বাড়ালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে রুপিগুলো তাকে দিলাম।

আপনারা আজ আসুন তাহলে। বাকি আয়োজন আমার জিম্মাদারিতে থাকুক।

খতমে বুখারি : সাদামাটা আয়োজন

বুখারি খতমের দিন আমরা মসজিদে উপস্থিত হলাম। আল্লামা বানুরিও এলেন। এলাকার দীন-দরদি মুসলমানরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। যথারীতি শেষসবক অনুষ্ঠিত হলো। দোয়ার পূর্বে আল্লামা বানুরি আবদুর রাযযাক সাহেবকে বললেন, মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব কোথায়?

উনি তো পেছনে থাকেন।

উনাকে ডাকুন।

মুফতি সাহেবকে মসজিদের এক নিভৃত কোণ থেকে মাওলানা আবদুর রাযযাক ইস্কান্দার সাহেব ডেকে আনলেন। মুফতি সাহেব সামনে এসে আবার শ্রোতার সারিতে বসে পড়লেন। 'ওখানে না মুফতি সাহেব, এখানে।' এই বলে হজরত বানুরি তাকে সামনে ডাকলেন। মুফতি সাহেব মাথা নিচু করে সামনে এসে চুপচাপ বসে পড়লেন। এরপর আল্লামা বানুরি আবেগাপ্লুত হয়ে জনতার সম্মুখে মুফতি সাহেবের পরিচিতি প্রদান করেন।

'সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা জানেন প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি প্রাণকেন্দ্র থাকে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানেরও একটি প্রাণ আছে। তিনি একজন সরলপ্রকৃতির মানুষ। তারা সাতপুরুষ ধরে মুফতি ও কাজির (বিচারপতি) খেদমত আনজাম দিয়ে আসছেন। আমার পাশে বসা এই মানুষটি হলেন তিনি। এই বলে উনি আবেগে কেঁদে

ফেলেন। মুফতি সাহেবের চেহারায় কোনো ভাবান্তর দেখলাম না। উনি আগের মতোই মাথা নিচু করে বসে আছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, উনি এত সাদাসিধা পোশাকে ছিলেন যে সামনে বসা সকলের মাঝে তাকে আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছিল!

খতমের দোয়া হয়ে যাওয়ার পর আমরা উপস্থিত সকল মেহমানকে মিষ্টিমুখ করি। এরপর নিজের রুমে গিয়ে দেখি বাংলাদেশ থেকে দুজন সম্মানিত মেহমান উপস্থিত হয়েছেন। মাওলানা আবদুল ওয়াহাব সাহেব এবং হাজি ইউনুস সাহেব। আমি তাদের সালাম দিয়ে হাত চুম্বন করি। তারাও বিনিময়ে আমাকে তাকমিল সমাপ্তির জন্য মোবারকবাদ জানান। আমি হাতের কাছে যা ছিল তা দিয়ে তাদের মেহমানদারিতে লেগে যাই। অন্যান্য বাঙালি ভাইও ইতিমধ্যে আমার রুমে এসে পড়েন। এদিকে কে যেন বানুরি সাহেবকে মেহমানদের খবর দিয়ে দেয়। উনি এই অসুস্থাবস্থাতেও তাঁর বাঙালি সাথিদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে অধমের রুম পর্যন্ত এসে পড়েন। আমি তো খুব লজ্জায় পড়ে যাই। কী করি, কোথায় বসতে দিই তাদের! বানুরি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে মুচকি হাসি দিয়ে সান্ত্বনা দেন। ইশারায় বোঝান, কিছু করতে হবে না! চুপচাপ থাকো! এরপর বাংলাদেশি (তখনো দেশ স্বাধীন হয়নি) মেহমানদের সাথে গল্পে লেগে যান। পুরোনো সময়ের কতশত স্মৃতি যে তারা আলোচনা করছিলেন, তা আমরাও সঠিকভাবে ঠাহর করতে পারিনি।

আসলে হয়েছিল কি, উনারা নিউটাউনে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানেও শরিক হয়েছিলেন। এরপর আমার রুমে এসে পড়েন কিছুক্ষণ আরাম করার জন্য। অল্প সময় পর তাদের উমরার সফর ছিল। পরে এই তথ্য জেনে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, বুখারি খতমের সময় আমার দেশীয় মুরুব্বিরাও আমার সামনে উপস্থিত ছিলেন।

মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব রহ.

আমরা যখন করাচিতে দাওরার ঘণ্টা করতাম, সবচেয়ে আকর্ষণীয় হতো আল্লামা বানুরির ঘণ্টা। উনি ক্লাসে এসে বসতেন আর বলতেন, জি ভাই পড়ুন। কোনো এক ভাই একটি হাদিস তিলাওয়াত করলে সাথে সাথে থামিয়ে দিতেন। এরপর শুরু হতো ইলমের ঝর্না থেকে বহমান প্রবাহ। আলোচ্য হাদিসটি বুখারির কোথায় কোথায় এসেছে, প্রতিটির সনদের কী অবস্থা, রাবিদের কার কোথায় জন্ম ও মৃত্যু, কে কুফি, কে মাক্কি কে মাদানি, কে শামি, কে খাওয়ারিজমি; হাদিসটি থেকে কোনো হুকুম প্রমাণিত হয় কি না, আহনাফের দলিল এখান থেকে প্রমাণিত হয় কি না ইত্যাকার নানা মৌলিক আলোচনায় জমে উঠত তাঁর মজলিস। আর আল্লামা বানুরি এত দ্রুত তাকরির করতেন যে, কেউ চাইলেই তা শ্রুতিলিখন করতে পারত না। আল্লামার

তথ্যসূত্র দেওয়ারও একটি মজার পদ্ধতি ছিল। উনি একেকটি তথ্যসূত্রের সাথে তা কবে কোথায় মস্তিষ্কে গ্রহণ করেছেন, তারও সুনিপুণ বর্ণনা দিয়ে দিতেন। সুবহানাল্লাহ! অর্থাৎ আমি এই হাওয়ালাটি ত্রিশ বছর পূর্বে দেওবন্দের লাইব্রেরিতে পড়েছি, অমুক হাওয়ালাটি মিশরের কোনো লাইব্রেরিতে পেয়েছি ইত্যাদি। এজন্য শাহ সাহেবের হাজারো শাগরেদের মাঝে আল্লামা বানুরির অবস্থান ছিল একেবারেই অনন্য। উনাকে এজন্য জানাশিন-এ-শাহ সাহেব বলা হয়।

আমাদের উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে গত কয়েক দশক থেকে বুখারি খতমের একটি অসুস্থ ধারা শুরু হয়েছে, যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। অথচ আল্লামা বানুরির ওখানে আমি এমন জাঁকজমক দেখিনি। শেষহাদিস কবে কোথায় পড়িয়ে ফেলতেন, শুরু জমানায় তো কেউ বুঝতেই পারত না। একদম অনাড়ম্বরপূর্ণ সাধারণ মজলিস হতো। সর্বোচ্চ এতটুকু খেয়াল রাখতেন যেন খতমের বিষয়টি উসতাদগণ জানতে পারেন। সাধারণত বুখারি খতম হতো দারুল হাদিসে। খুব সাদামাটাভাবে। আমাদের সময়েও এমনটি হয়েছিল। তবে আল্লামা বানুরির অসুস্থতার কারণে মসজিদে শেষদরস হয়েছিল। আমাদের বছর আমরা স্বেচ্ছায় কিছু মিষ্টান্ন কিনতে চেয়েছিলাম। সেই হিসেবে আল্লামা বানুরিকে আমরা কিছু নগদ অর্থ দিতে যাই। তিনি বলেন, এই কয়েকটি রুপি দিয়ে কিছু হবে না। আমার কাছে রেখে যাও। আমি দেখছি। এরপর তিনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় এক মিষ্টির কারখানা থেকে কয়েক মণ মিষ্টি আনানো হয়। সেগুলো বড় বড় টুকরিতে সাজিয়ে ফেলেন ভাইয়েরা। আল্লামা বানুরি সাহেব সেবার মসজিদের চার দরজায় দুজন করে তালিবে ইলম ভাইকে দাঁড় করিয়ে মিষ্টি বিতরণ করিয়েছিলেন। কোনো অতিরঞ্জিত বিশাল খানাপিনার আয়োজন করা হয়নি। অথচ নিউটাউনে চাইলেই এমন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়। কুরবানির মৌসুমে আমরা দেখেছি, কত বড় বড় সব আয়োজন হতো। আসলে আমাদের উচিত আকাবিরের পদচিহ্ন সামনে রেখে জীবন পরিচালনা করা। নয়তো মহব্বতের সাথে আমল করতে গিয়ে আল্লাহ না করুন, সুন্নাত ছেড়ে বিদআতের পথে পা না চলে যায়। আল্লাহ হেফাজতকারী।

ওয়ালির বেলায়েত

হজরত মুফতি সাহেবের সাথে আমার স্মৃতিগুলো এক বৈঠকে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। সব স্মৃতি সবসময় মাথায় আসেও না। আমি কিছু স্মৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তবে এমন বহু স্মৃতি আছে, যা আমি একান্তই আমার নিজের মনে করি। এগুলো নিয়েই আখেরাতে পাড়ি জমাতে চাই।

নিউটাউনে আল্লামা বানুরির পরে আমার সবচেয়ে মহব্বতের মানুষ ছিলেন মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেব। উনি ছিলেন একাধারে আমার শ্রদ্ধেয় উসতাদ, রুহানি পিতা, স্নেহশীল পরামর্শক এবং আরো অনেক কিছু। অথচ উনার সাথে পরিচয়ের শুরুটা একদম ভিন্নরকম ছিল। দাওরার বছর উনি আমাদের তিরমিজি নিয়েছিলেন। দরসে হজরত অনেক জটিল বিষয় সহজভাবে উপস্থাপন করতেন। তবু আমার উরদু শুরুদিকে একটু কমজোর থাকায় অনেক বিষয় বুঝতে একটু সময় নিতাম। কখনো কখনো প্রশ্ন করে বসতাম। আমার মুফতি সাহেব খুবই সাদাসিধা হবার পাশাপাশি অসাধারণ রসবোধের অধিকারী ছিলেন। সবার সাথে মজা করতেন। উনার রসবোধও ইলমি ধাঁচের হতো। কোনো তালিবে ইলম বেশি প্রশ্ন করলে তাকে 'মওদুদি' বলতেন। কেউ এই লকবের মর্ম বুঝত কি না জানি না। একদিন দরসে আমি একটা প্রশ্ন করলাম। মুফতি সাহেব বলে উঠলেন, এই যে দেখো মওদুদি মাসআলা বোঝে না। হঠাৎ এভাবে মওদুদি পদবি পেয়ে বিব্রত হয়ে পড়ি। এরপর আরো কয়েকদিন ক্লাসে প্রশ্ন করলে মুফতি সাহেব আমাকে একইভাবে সম্বোধন করে যান। আপনাদের হয়তো সামান্য ধারণা আছে, কওমি সমাজে মওদুদি সাহেবের অবস্থান কেমন! একসময় এই স্লোগান খুব চলত, সও ইয়াহুদি, এক মওদুদি![৮২] এবার ভাবুন কেউ যদি কওমিঘারানার সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে এই সম্বোধন করে, তাহলে তার কেমন বোধ হতে পারে! আমি টানা কয়েকদিন এই বিব্রতবোধ নিয়ে কাটাই। নিজের রুমেও মনমরা হয়ে বসে বসে ভাবতাম, আমার কোন আচরণের জন্য মুফতি সাহেব আমার সাথে এমন আচরণ করলেন! কিছু ভাইকে জিজ্ঞাসাও করলাম। কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারল না। সবাই মুফতি সাহেবের এমন আচরণ মেনে নিয়েছে, এমন একটা চল লক্ষ করলাম। কিন্তু আমি যেহেতু নতুন ছিলাম, আমার পক্ষে এই সম্বোধন মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম আরেকদিন এমন হলে হজরতের সাথে সাক্ষাত করে আমার দুঃখ তাঁর কাছে প্রকাশ করব।

---

৮২. উম্মতের গবেষক ওলামারা মাওলানা মওদুদি সাহেবের কিছু গবেষণা নিয়ে কঠোরভাবে একাডেমিক মতানৈক্য করেছেন। এসব ক্ষেত্রে তারা উঠতি আলিম ও গবেষকদের শাস্ত্রীয় ধাঁচ অনুসরণের দিকে উদ্বুদ্ধ করতেন। মওদুদি সাহেবের ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় বিরাট অবদান থাকলেও শাস্ত্রীয় অনেক বিষয়ে তিনি মোটাদাগের বড়সড় ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। এজন্য ক্লাসের শাস্ত্রীয় পরিবেশে মুফতি সাহেব এমন শব্দ ব্যবহার করতেন। এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে- সহজ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত একটি বিষয় ছাত্রটি কেন বুঝতে পারছে না! একথাও মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি মওদুদি সাহেবকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ওলামায়ে কেরাম কোনোরূপ কার্পণ্য করেন নি। মাওলানা সম্বোধন করেছেন তার ক্ষেত্রে। এমনকি আল্লামা সাইয়িদ বানুরির একটি গ্রন্থে তাকে আস সাইয়িদ মওদুদি বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। গাফারাল্লাহু লাহু ওয়া খাতায়াহু!

ঠিকই একদিন ক্লাসে আবার প্রশ্ন করলাম। বরাবরের মতো আবার একই সম্বোধন! সেদিন ক্লাস শেষ হতেই মুফতি সাহেবের পেছনে দ্রুতপায়ে হাঁটা দিই। উনি দারুল ইফতার সামনে আসতেই সালাম দিই আমি। জবাব নিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান। কী হয়েছে? কিছু বলবেন?

জি, আপনার সাথে কিছু কথা বলতাম।

আসুন। ভেতরে আসুন।

বসার পর আমাকে বললেন, বলুন কী বলবেন।

আমার চেহারায় একটা দুঃখবোধের ছাপ ইতিমধ্যে ফুটে উঠেছিল। আমি মুফতি সাহেবের কাছে ব্যথাতুর ভঙ্গিতে মনের কথা তুলে ধরলাম। আমাকে আপনি প্রায়ই মওদুদি সম্বোধন করেন, আমার দিলটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। মনে হয় আমার বুকে কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে। আমি জানি আপনি হাসিমজার মানুষ। কৌতুকচ্ছলে কথা বলেন। কিন্তু আমাকে দেওয়া আপনার এই সম্বোধন আমি একদমই মেনে নিতে পারি না। আমাকে দয়া করে এই সম্বোধনের তাৎপর্য একটু বুঝিয়ে দেবেন।

এতটুকু বলতেই আমি হু হু করে কেঁদে ফেলি।

আমার এমন আবেগি কথাবার্তায় মুফতি সাহেব বিচলিত না হয়ে উলটো মুখ ভরে হেসে দেন। আরো অবাক হয়ে যাই আমি। এরপর মুফতি সাহেব বলেন, দেখুন! আমি তো কৌতুকচ্ছলে এই সম্বোধন করে থাকি। মন থেকে বলি না। আমার এমন আচরণ সবাই মেনে নিয়েছে। আপনি যেহেতু নতুন এসেছেন, তাই আমার এমন সম্বোধন আপনাকে হয়তো কিছুটা কষ্ট দিয়েছে। তবে আমি কেন অন্য কিছু না বলে জমানার বদনাম এই ব্যক্তির নাম নিই, এর পেছনে আমার জীবনেরই একটা লম্বা ঘটনা আছে। যেহেতু আমার কথায় আপনি ক্লাসে কষ্ট পেয়েছেন, তাই আমি ক্লাসেই আপনার সামনে এর ব্যাখ্যা দেব। গত কালকের জন্য আমাকে মাফ করবেন!

পরবর্তী দিন ক্লাসে এসে মুফতি সাহেব সংক্ষেপে ক্লাস নিলেন। এরপর আমার দিকে একবার তাকিয়ে শুরু করলেন গতদিনের ব্যাখ্যা। টানা এক ঘণ্টা সেদিন গল্প বলেছিলেন আমাদের। এটা মুফতি সাহেবের রেকর্ড যে, তিনি এত সময় আমাদের সাথে গল্প করেছিলেন। আমি সংক্ষেপে ঘটনাটি কিছুটা আমার ভাষ্যে এবং জায়গামতো মুফতি সাহেবের ভাষ্যে তুলে ধরছি।

মুফতি সাহেবের মওদুদিয়াত : ঘটনার ইতিবৃত্ত

মূলত মুফতি সাহেবরা ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন। টুংক (Tonk state) রাজ্যে ছিল তাদের বসবাস। ব্রিটিশ ভারতেও একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ছিল সেটি। তার

পূর্বপুরুষরা সাতপুরুষ ধরে এই অঞ্চলের কাজি (প্রধানবিচারপতি) ও মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর খান্দান ছিল আলিমদের খান্দান। তার পিতা এমদাদ হাসান খান কাজি ও মুফতি ছিলেন। বিখ্যাত আলিম হায়দার হাসান খান তার দাদা ছিলেন। নদওয়াতুল উলামার মুদির ও শাইখুল হাদিস ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি যেখানে বিয়ে করেছিলেন, তাদের আত্মীয়রা অনেকেই ছিলেন মওদুদি সাহেবের চিন্তাধারায় প্রভাবিত। উনার সাতজন সম্বন্ধী ছিল। তার মধ্যে একজন ছিলেন দেওবন্দি আলিম। বাকি সবাই জামায়াতে ইসলামি সমর্থন করতেন। অনেকে একনিষ্ঠ কর্মী ও পদস্থও ছিলেন। এদের মাঝে একজন ছিলেন সেনাকর্মকর্তা। মাঝেমধ্যেই দেখা করতে আসতেন নিউটাউনে। মুফতি সাহেবকে খুব শ্রদ্ধা করতেন তারা। মুফতি সাহেব দারুল উলুম করাচি থেকে নিউটাউনে এসে যাওয়ার পর নিউটাউন উত্তরোত্তর উন্নতি করছিল। দীনদারি থাকলেও মানুষের মাঝে নানা কারণে কখনো কখনো গিবতা থেকে কিছু হাসাদ এসে পড়ে। মুফতি সাহেবের খেদমতের ফলে নিউটাউনের যে উন্নতি হচ্ছিল তাতে আল্লামা বানুরি তাঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। মুফতি সাহেবের আলাদা কদর করতেন। নিউটাউনের উসতাদদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা আল্লামা বানুরি তৈরি করেছিলেন মুফতি সাহেবের সাথে। এই ঘনিষ্ঠতা অনেক উসতাদ সহ্য করতে পারছিলেন না। তারা মুফতি সাহেবের ব্যাপারে কানাঘুষা করতে শুরু করেন।

এদিকে আরেক মুহাজির আলিম এসেছিলেন হিন্দুস্থান থেকে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানি।[৮৩] নদওয়াতুল উলামার ফারেগ ছিলেন। মুফতি সাহেবের দাদার শাগরেদ এবং একইসাথে মুফতি সাহেবের সাথি তিনি। সে হিসেবে তাদের ভালো সখ্য ছিল। আল্লামা নুমানি পাকিস্তানে হিজরত করে চলে এলে বানুরি তাকেও নিউটাউনে দাওয়াত দেন। কিন্তু নুমানির প্রতিও উসতাদগণ বিদ্বেষবশত জামায়াতে ইসলামির সাথে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণের চেষ্টা করে। নুমানি নানাবিধ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল। ছিলেন বড় সাহিত্যিকও। আরবি, উরদু, ইংরেজি ভাষাতে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

আবদুর রশিদ নুমানির উপর জামায়াতে ইসলামির প্রতি আন্তরিক হবার অভিযোগ দিনদিন বেড়েই চলে। মূলত নদওয়ায় পড়াশোনার কারণে কিছুটা উদার মনোভাব রাখতেন তিনি। জামায়াতে ইসলামির নানান দর্শনভিত্তিক সভা-সেমিনারেও

---

৮৩. সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের উসতাদ। তার পরিচয় আলিমদের কাছে নিষ্প্রয়োজন।

অংশ নিতেন। প্রতিষ্ঠানের কিছু উসতাদের এসব পছন্দ হতো না। কিছু উসতাদ তাকে ভুল বুঝে আল্লামা বানুরির কাছে কঠোরভাবে নালিশ করেন। নালিশ এত তীব্র ছিল যে বানুরি খুব সহজেই ব্যাপারটির গভীরতা বুঝে ফেলেন। তবে একজনের জন্য এতজন উসতাদের বিরুদ্ধে যাওয়া তিনি মুনাসিব মনে করেননি। আর নুমানি সাহেব যেহেতু অত্যন্ত যোগ্য ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন, তাই হেকমতের সাথে বানুরি তার জন্য একটি চমৎকার সমাধান বের করে ফেলেন।

আল্লামা বানুরির কাছে পাকিস্তানজুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার জন্য যোগ্য আলিমদের চাকুরির প্রস্তাব আসত। সে সময় তার কাছে ভাওয়ালপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি ইতিহাস ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনার জন্য একজন যোগ্য ও প্রাজ্ঞ আলিমের সন্ধান চাওয়া হয়। বানুরি সাহেব হেকমতের সাথে আল্লামা নুমানির কাছে এই প্রস্তাব তুলে ধরেন। নুমানি সাহেবও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নেন।

নিউটাউনে সেই যুগে আল্লামা নুমানির মাসিক বেতন ছিল ২০০ রুপি। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বেতন নির্ধারিত হয় ৫০০ রুপি। ফলে মুহাজির হিসেবে রিজিকের আসানিও তার নিকট একটি বাহ্যিক উপলক্ষ্য হিসেবে দেখা দেয়। এই বিষয়টি মুখ্য দেখিয়ে আল্লামা বানুরি, আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানান।

সাথি নেই, আমিও নেই!

মুফতি সাহেবের সাথে নুমানির সখ্য ছিল অত্যন্ত গভীর ধরনের। মুহাজির হিসেবে প্রথম দিকে তারা একসাথে চলাফেরা, ওঠাবসা ও খোশগল্প করতেন। দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম ও পুরোনো। তারা দুজন একসাথে নদওয়াতুল ওলামায় পড়াশোনা করতেন। হ্যাঁ, মুফতি সাহেবের দাদা আল্লামা হায়দার হাসান সাহেব নদওয়াতুল ওলামায় শাইখুল হাদিস ছিলেন। সেই সুবাদে মুফতি সাহেব ছোটবেলায় টানা চার বছর নদওয়ায় পড়াশোনা করেন। এসময় নুমানি সাহেব তার সহপাঠী ছিলেন। ফলে তারা একত্রে বেড়ে ওঠার সুযোগ পান। পরবর্তীতে নুমানি সাহেব নদওয়ায় থেকে গেলেও মুফতি সাহেব দেওবন্দে চলে আসেন। সেখানে মাওলানা এ'জায আলি রহ. এর কাছে হিদায়া আখেরাইন আরেকবার পড়েন। এরপর দরসে নিজামির অবশিষ্ট সিলেবাস দেওবন্দে সমাপ্ত করেন। তাই বলা যায়, নদওয়া এবং দেওবন্দ উভয়ের চিন্তাধারা ও পরিবেশে থাকা রুহানি প্রভাবের মিশ্রণ মুফতি

সাহেবের ব্যক্তিত্বে রয়ে গেছে। ছোটবেলার এত স্মৃতি থাকার ফলে দুজনের মধ্যে তাই অনেক বেশি মিল ছিল। নুমানি সাহেবকে বিদায় জানানোর ফলে মুফতি সাহেব অত্যন্ত ব্যথিত হন। একরকম মনমরা হয়ে পড়েন তিনি। এমনিতেই কম কথা বলতেন, এবার আরো কমিয়ে দেন কথাবার্তা।

নুমানি সাহেবের চলে যাওয়ায় মুফতি সাহেবের উপর থেকে তাদের নজর যে সরে গিয়েছিল, এমন নয়। বরং তার উপর সর্বদা কড়া নজর রেখেছিল একদল মানুষ। মুফতি সাহেবের জামায়াতপন্থি শ্যালক এবং সম্বন্ধিরা যখন তার সাথে দেখা করতে আসতেন, তখন অনেক সময় ধরে গল্পস্বল্প করে যেতেন। এসময় কে বা কারা যেন আল্লামা বানুরি সাহেবের অফিসের দিকে চলে যেত! পুরো ব্যাপারটি জানা এবং বোঝার পরেও অসহায়ের মতো চুপ থাকতেন আল্লামা বানুরি। কিন্তু একদিন সবকিছু মুফতি সাহেবের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন, তাকেও নুমানি সাহেবের মতো সসম্মানে বিদায়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বুঝতে পেরে তিনি নিজেই একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

হঠাৎ একদিন সকালে সবাই আবিষ্কার করল, মুফতি সাহেব মাদরাসায় নেই। নেই তো নেই। মুফতি সাহেবের যেন কোনো গন্ধই নেই। দু-একদিনের মধ্যেই সবাই বুঝে গেল মুফতি সাহেব মনে কষ্ট নিয়ে মাদরাসা থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। এগুলো আমি করাচিতে যাওয়ার কিছুকাল আগের ঘটনা। আমি শুনেছিলাম যাওয়ার পর। এই সময়ে বানুরি সাহেবের চেহারা ছিল দেখার মতো। তিনি এত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে, কোনো শিক্ষকের সাথে কথা বলতেন না। অনেকদিন তিনি কারো সাথে কথা বলেননি। এ সময় সবাই তাদের ভুল বুঝতে পারেন। মুফতি সাহেবের খানদান সাতপুরুষ ধরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে আসছেন এবং সাতপুরুষ ধরে ফতোয়ার কাজ করে যাচ্ছেন—এটা জানতে পেরে তারা অত্যন্ত লজ্জিত হন। কিন্তু তির ধনুক থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। ফলে আফসোস ছাড়া করার কিছুই ছিল না।

মুফতি সাহেব আমাকে মওদুদি বলে সম্বোধন করার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তার এই ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেন এভাবে—'মাদরাসায় অবস্থান করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লে আমি কিছুদিন একাকী থাকার জন্য বাসায় চলে যাই। কেননা অন্যের নজরের উপর অবস্থান করা খুবই পীড়াদায়ক বিষয় এবং এতে মানসিকভাবেও ব্যক্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মাদরাসা থেকে আমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও আমি কিছুটা নিরিবিলি একাকী থাকার জন্য যোগাযোগ বন্ধ রাখি। এসময় আমার সব

সম্বন্ধি আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন। হঠাৎ করে আমার এক শ্যালক বাসায় দেখা করতে এলেন। কথায় কথায় তিনি মাদরাসার পরিবেশের ব্যাপারে উত্থিত সমস্যাটি আঁচ করে ফেলেন। এমতাবস্থায় আমাকে একটি প্রস্তাব দিয়ে বসেন তিনি। প্রস্তাবটি ছিল, হায়দারাবাদের[৮৪] মনসুরাতে জামায়াতে ইসলামির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি বিখ্যাত মাদরাসায় অধ্যাপনার সুযোগ বিষয়ে। সেখানে কওমি মাদরাসার কিতাব বিশেষত দরসে নিজামির কিতাবাদি এবং যুগোপযোগী অন্যান্য কিছু বিষয় শিখিয়ে তাদেরকে আলিম হিসেবে জামায়াতে ইসলামির দলীয় ব্যানারে ব্যবহার করা হতো। সেসময় মাওলানা চেরাগ মুহাম্মদ সাহেব সেই প্রতিষ্ঠানের শাইখুল হাদিস ও মুহতামিম ছিলেন। আমাকে শ্যালক প্রস্তাব করেন যে, আপনি একজন যোগ্য মুফতি। আপনি কেন বাসায় বসে সময়ের অপচয় করবেন! আপনার যদি মনে হয় তাহলে সেখানে একবার সফর করেই আসুন। সুযোগ-সুবিধা ও সম্মানের ব্যাপারে আপনাকে একটুও চিন্তা করতে হবে না। নিউটাউনের চেয়ে কমপক্ষে পাঁচগুণ সম্মানী আপনাকে তারা প্রদান করবে।

আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম বাসায় বসে না থেকে যাই একটু সফর করে আসি। আর তা ছাড়া বেকার জীবন কখনোই কাম্য নয়। বাস্তবিকপক্ষে আমি সেসময় আমাদের দীনি পরিবেশের প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলাম! এত সংকীর্ণতা, এত রেষারেষি আমাকে ব্যথাতুর করে তুলেছিল। তাই সবদিক বিবেচনা করে আমি কিছুদিনের জন্য হলেও হায়দারাবাদের মনসুরাতে সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

হায়দারাবাদ পৌঁছে আমি উল্লেখিত মাদরাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত হই। সেখানে শুরুতেই আমাকে একজন শাইখুল হাদিসের মর্যাদা প্রদান করা হয়। আমার জন্য সকাল-সন্ধ্যা খেদমতের আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। নিউটাউন থেকে অব্যাহতি নিয়ে এখানে চলে আসার বিষয়টি তাদের কাছে খুবই বিস্ময়কর ছিল। বিধায় তারা আমাকে একে তো মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করত; দ্বিতীয়ত আমার সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে খেয়াল রাখত। মাদরাসার পরিচালনায় তখন ছিলেন হজরত শাহ সাহেবের একজন নিকটতম শাগরেদ। তিনি আলিম হিসেবে অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে জামায়াতে ইসলামির সাথে

[৮৪]. এটি ভারতের হায়দারাবাদ নয়, যেটি বর্তমান তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী। আলোচ্য শহরটি পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের একটি শহর। আশা করি পাঠকরা বিভ্রান্ত হবেন না।

সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।[৮৫] এই হজরত আমাকে ডেকে জানান, আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। আপনি যেকোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধায় কমতি পড়লে আমাদেরকে জানাবেন। আপনার খেদমতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছি। আর সম্মানীর ব্যাপারে একটুও ভাববেন না। আপনার প্রয়োজনমতো যতটুকু দরকার আমাদেরকে শুধু জানাবেন, আমরা ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ।

গৃহপালিতের খোঁয়াড়ে

এখানে সবচেয়ে স্মৃতিময় ঘটনাগুলো ঘটেছিল অধ্যাপনাকে কেন্দ্র করে। যখন আমি ক্লাসে যাই, সম্ভবত হিদায়া পড়াতে, তখন ক্লাসের পরিবেশ দেখে আমাকে ভিমড়ি খেতে হয়। কিছু ছাত্রের মাথায় টুপি নেই। অনেকের মুখেই সুন্নতি দাড়ি দেখতে পাচ্ছিলাম না। এমনকি সকলের সম্মুখে হিদায়া কিতাবও রাখা ছিল না। আমি যখন আমার নির্ধারিত ডেস্কে গিয়ে বসি, তখন সকলে দাঁড়িয়ে আমাকে সম্মানসূচক সালাম প্রদান করে! একটু বিব্রত হয়ে পড়ি আমি। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সাথে পরিচিত হয়ে গেলে আমি এই মাসআলাটি তাদের বুঝিয়ে বলি। সম্মানসূচক দাঁড়ানো একটি অপছন্দনীয় কাজ, সেটি মহব্বতের সাথে তাদেরকে বোঝাই। এরপর শুরু হয় মূল ক্লাস। আমি নির্ধারিত অধ্যায় খুলে ছাত্রভাইদের উদ্দেশে বলি, ইবারত পড়ুন! কিন্তু তাদের মাথায় যেন আকাশ ভারী করে তোলে আমার এই কথা। তারা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করে। এ আবার কোন মুফতি সাহেব, ছাত্রদের পড়তে বলেন—এমন একটা ভাব তাদের চেহারায় লক্ষ করি। একজন ছাত্রভাইকে নির্দিষ্ট করে বলি, আপনি ইবারত পড়ুন। তিনি কম্পিত পায়ে দাঁড়িয়ে যান। বলেন, হজরত, আমরা তো এ পর্যন্ত কখনো নিজেরা ইবারত পড়িনি। আমাদের উসতাদজিরা সব সময় ইবারত পড়ে দেন। আমরা শুধু শুনতে থাকি। একথা বলে তিনি লজ্জাবনত মস্তিষ্কে বসে পড়েন। ঠিক সেইসময় সাহস করে সকলে একযোগে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বলে, হজরত, এই ভাই সঠিক বলেছেন। আমরা তো শুধু ক্লাসে উপস্থিত হই। ইবারত উসতাদজিই পড়েন। একথা শুনে আমি

---

[৮৫]. আসলে সেই যুগে, যখন জামায়াতে ইসলামি এবং মাওলানা মওদুদি সাহেবের চিন্তাধারার ভ্রান্তির ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে সকলেই একমত হতে পারছিলেন না, সে সময়ে বহু আলিম ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামিতে যোগদান করেছিলেন। মাওলানা মানজুর নুমানি, আল্লামা আবুল হাসান আলি নদবিসহ অনেক যশস্বী চিন্তাবিদ শুরুতে মাওলানার সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে তার ভ্রান্তি প্রকাশিত হওয়ার এই সকল মহান চিন্তাবিদ সেগুলো চিহ্নিত করে দলত্যাগ করেন। আজীবন তারা মাওলানাসহ তার দলকে চিন্তাধারা সংশোধনের নসীহত করে গেছেন।

হাসবো নাকি কাঁদবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এরা বলে কী! ইবারত সবসময় উসতাদজি পড়বেন তাহলে এরা এখানে কী জন্য এসেছে! এক বোকা ছাত্রভাই মহব্বতের সাথে আমাকে প্রশ্ন করেন, হজরত, শুনেছি আপনি অনেক বড় মুফতি সাহেব! তাহলে ইবারতটুকু পড়তে আপনার এত কষ্ট হচ্ছে কেন? বুঝুন এবার পরিস্থিতি!

সেদিন আর নতুন পড়া না পড়িয়ে ইবারত বুঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু এতে ব্যর্থ হলে আমি ক্লাস সমাপ্ত করে কামরায় চলে আসি। কিছুক্ষণ মন খুলে নিজে নিজেই হাসি। হে আল্লাহ, এ কোথায় আমাকে নিয়ে এলেন! এরা তো সাধারণ আরবি ইবারতটুকু পড়তে পারে না। কিছুক্ষণ পর আবার হঠাৎ আমার কান্না এসে পড়ে। আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকি, হে আল্লাহ, কোন গুনাহের কারণে আমাকে তুমি এই পরিবেশে নিয়ে এলে! যারা সুন্নাত অনুসরণ করে না, যারা দীন বোঝে না, যাদের আকিদায় ভ্রান্তি রয়েছে এদের মাঝে আমাকে কেন নিয়ে এলে? আমি তো উচ্চ পারিশ্রমিক চেয়ে কখনো দোয়া করিনি, তাহলে কেন !

পরবর্তী দিন ক্লাসে গিয়ে আরো মজার অভিজ্ঞতা অর্জন করি। আমি নিজেই পড়তে শুরু করি একটি প্যারা। ইবারত পড়ার পর সে বিষয়ে মৌলিক ও উসুলি আলোচনা আরম্ভ করি। হঠাৎ ছাত্রভাইদের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, তারা বড় বড় চোখ-মুখ করে একবার আমার দিকে আর একবার নিজেদের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমি আলোচনা থামিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে তাদের একজন বলে উঠল, উসতাদজি, আপনি আমাদেরকে শুধু ইবারতের অনুবাদ করে শুনিয়ে দিন। এত উসুলি ও দীর্ঘ ব্যাখ্যা জেনে আমরা কী করব? আমাদেরকে তো অন্যান্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এত পুরোনো এসব আলোচনা আমাদের এখন অতটা প্রয়োজন নেই। আমি শুনে তো পুরোই থ! জামায়াতে ইসলামির আলিম তৈরির প্রকল্পের অসারতা খুব ভালোভাবে টের পেয়ে যাই। তাদের পছন্দমতো হেসে হেসে আমি সেদিনকার ক্লাসে শুধু মাসআলা আলোচনা করে ক্লাস শেষ করি। এরপর যথারীতি কামরায় ফিরে আসি। এভাবে টানা দুই সপ্তাহ ক্লাস নেওয়ার পর আমার মনে হয়—আমার এখানে থাকা উচিত নয়। এমন পাগল-ছাগল ও গণ্ডমূর্খদের শিক্ষক হওয়ার চেয়ে বেকার জীবনে বাসায় থাকা অনেক ভালো।

আমি পরবর্তী দিন মুহতামিম সাহেবের সাথে দেখা করি। বাসায় যাওয়ার প্রয়োজনের কথা তার কাছে তুলে ধরলে তিনি হন্তদন্ত হয়ে আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এসব জিজ্ঞাসা করেন। অত্যন্ত আদবের সাথে জানাই, আমার এখানে মোটামুটি ভালোই লাগছে। তবে কিছুদিনের বাসায় যাওয়া আমার খুবই প্রয়োজন।

আর বাসা থেকে এতদূরে আসায় কিছুটা মনোকষ্টে আছি। আমি বাসায় গেলে কবে নাগাদ আসব তা আপাতত নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। এবার মুহতামিম সাহেব আমাকে আর্থিক বিষয়ে কোনো প্রয়োজন রয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। আমি জানাই, রাহাখরচ বাবদ আপনারা চাইলে কিছু দিতেই পারেন। একথা শুনে মুহতামিম সাহেব আমাকে পাঁচশত রুপি হাতে দিয়ে বলেন, আপনি ফিরবেন কি না জানি না। তবে এটি রাখুন। আপনার পুরো মাসের জন্য যে সম্মানী তা আমরা প্রদান করলাম। আপনি যদি ফিরে আসেন তাহলে আমরা অনেক খুশি হব।

পরবর্তী দিন আমি মনসুরা থেকে করাচি চলে আসি। এমন মাদরাসায় অধ্যাপনা করার চেয়ে বাসায় বসে থাকা অনেক ভালো। অন্তত কিতাবপত্র অধ্যয়ন করে সময় কাটাতে পারব। এটাও কম কী!'

এই ছিল মুফতি সাহেবের জবানীতে তার মনসুরার অভিজ্ঞতা!

অগাধ আস্থা

মুফতি সাহেবের মনসুরায় যাওয়ার খবরটি সবাই জেনে গিয়েছিল। নিউটাউনের সে সকল উসতাদ বানুরি সাহেবকে তাদের অবস্থানের সত্যতা নিশ্চিত করতে বারবার একথা উল্লেখ করে বলতেন যে, দেখলেন! তিনি মওদুদি সাহেবের আদর্শিক প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় চলে গেছেন। আমরা আপনাকে সঠিক বিষয়ে অবগত করেছিলাম! কিন্তু মুফতি সাহেবের আদ্যোপান্ত জানা থাকার ফলে তাদের এমন কথা মানতে রাজি ছিলেন না বানুরি। তাদেরকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়ে বলতেন, মুফতি সাহেবকে আমি ভালোভাবে চিনি। তিনি কেন চলে গিয়েছেন এ বিষয়ে আপনারা কেউই নিশ্চিতরূপে কিছু জানেন না। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে তার ব্যাপারে মন্তব্য করছেন! মুফতি সাহেবের কিতাব ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠলে বানুরি বলেন, মুফতি সাহেব আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছুই বলেননি। ইস্তফাও জমা দেননি। তাই তার কিতাব এখনই ভাগ করার প্রয়োজন নেই। যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারব তখন দেখা যাবে। অর্থাৎ বানুরি সাহেব এলহামি দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, মুফতি সাহেবকে কষ্ট দিয়েই এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।

বিভাজিত ইলমি কানন : মতানৈক্যের বরকত

মূলত মুফতি সাহেব হিজরত করে আসার পর হজরত মুফতি শফি সাহেবের অনুরোধে প্রথমে দারুল উলুম করাচিতে যোগদান করেছিলেন। পাকিস্তান যুগ শুরুর

পর থেকে হিজরত করে আসা প্রবীণ আলিমগণ দারুল উলুম এবং নিউটাউনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু মুফতি শফি সাহেব বার্ধক্যে উপনীত হলে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা সেখানে উপস্থিত আলিমদের কিছুটা নারাজ করে দেয়। যদিও মুফতি সাহেবের ব্যক্তিগত অবস্থান শরিয়ত ও হেকমতের পরিপন্থি ছিল না। মুফতি সাহেব তার দুই সুযোগ্য পুত্র মুফতি মুহাম্মদ তাকি এবং মুফতি মুহাম্মদ রফি সাহেবানকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তারা তখন অত্যন্ত নবীন ছিলেন। সদ্য পাশ করেছেন এমন অবস্থায় তাদেরকে এত বড় দায়িত্ব অর্পণ করা প্রবীণ আলিম শিক্ষকদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছিল না। কিন্তু শফি সাহেব তাদেরকে এই ব্যাখ্যা দেন যে, আমি আমার দূরদৃষ্টি থেকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পারিবারিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনারা আশাকরি এতে অখুশি হবেন না। আপনাদের অবস্থান, সম্মান, মর্যাদা যথাস্থানেই থাকবে। এই বাচ্চাগুলো শুধু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পর প্রবীণ শিক্ষকগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করতে শুরু করেন। মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব নিউটাউন থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে করাচির লালুক্ষেত এলাকার একটি বাসায় বসবাস করতেন। দারুল উলুম করাচি এখান থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। ফলে মুফতি সাহেবের জন্য প্রতিদিন যাওয়া-আসা করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। এই ঘটনার পর তাই তিনিও অব্যাহতি নিয়ে চলে আসেন। বানুরি সাহেব তাকে অত্যন্ত সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে নিউটাউনে জায়গা করে দেন। হিদায়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড তিনি একাধারে পড়াতে থাকেন। বরং কোনো এক বছর হিদায়া পুরোটাই হজরত মুফতি সাহেব পড়িয়েছিলেন। ছাত্ররা তার পঠনরীতিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। ফিকহের গভীর জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা তার বংশে দান করেছিলেন। ফিকহ ও ফতোয়ায় ব্যুৎপত্তি ছিল তাদের বংশীয় উত্তরাধিকার।

একই সময়ে হজরত মাওলানা সলিমুল্লাহ খান সাহেব দারুল উলুম করাচি ছেড়ে নিউটাউনে যোগদান করেন। কিন্তু অধ্যাপনার পর তার মাথায় চিন্তা আসে তিনি নতুন একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবেন, যেখানে তার কিছু স্বপ্নের বাস্তবায়ন তিনি নিজহাতে করতে চান। এই সময় জামিয়া ফারুকিয়া মাদরাসার বর্তমান জায়গাটি এক আল্লাহর বান্দা তাকে দান করে দেন। তখন সলিমুল্লাহ খান সাহেব বানুরি সাহেবের কাছে আবেদন করেন, হজরত, আপনি আমাকে পূর্ণ অনুমতি দিলে আমি নতুন একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে চাই। বানুরি সাহেব খুশি মনে তাকে অনুমতি প্রদান করেন; যদিও তিনি অত্যন্ত যোগ্য এবং প্রবীণ আলিম ছিলেন। দারুল উলুম ও নিউটাউন উভয় প্রতিষ্ঠানেই মুসলিম শরিফ পাঠদান করতেন। কিন্তু দীনের নতুন একটি

প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা দেখে বানুরি সাহেব তাকে সসম্মানে অনুমতি দিয়ে দেন। এই একই পদে একসময় হজরত মাওলানা আবদুর রশিদ নুমানি ছিলেন। কিন্তু তাকে তো ষড়যন্ত্র করে বিদায় করে দেওয়া হয়।

হায়দারাবাদ থেকে করাচি প্রত্যাবর্তন

যাই হোক, মুফতি সাহেব বাসায় চলে আসার পর পরবর্তী জুমার দিন নিউটাউনে আগমন করেন। অভ্যাস অনুযায়ী জুমার আজানের পূর্বে কিছুক্ষণ তিনি মাদরাসার বাইরে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ছিলেন। ছাত্র ও শিক্ষকরা তাকে দেখে হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু কেউই সাহস করে তার সাথে সাক্ষাত করে তার আগমনের উদ্দেশ্য জানার সাহস করতে পারছিল না। আজান হয়ে গেলে মুফতি সাহেব তার কামরায় না গিয়ে সরাসরি মসজিদে চলে আসেন। বানুরি সাহেব সে যুগে নিজে জুমা পড়াতেন। দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত টানা এক ঘণ্টা মুসল্লিদের উদ্দেশে বয়ান হতো। দূরদূরান্ত থেকে তার বয়ান শোনার জন্য মুসল্লিরা আগ্রহের সাথে এসে পড়তো। মুফতি সাহেব মসজিদের এক কোনায় গিয়ে সুন্নাত আদায় করে চুপচাপ বসে পড়েন। জুমার খুতবাদানের উদ্দেশে বয়ানের জন্য বানুরি সাহেব তার পার্শ্বস্থ কামরা থেকে যখন মিম্বরে আরোহণ করলেন, তখন তার অনুসন্ধানী চোখ মুফতি সাহেবের উপর পড়ে। সাথে সাথে মাদরাসার একজন শিক্ষককে ডেকে আদেশ দেন, তুমি মুফতি সাহেবের পেছনে গিয়ে সুন্নাত পড়ে বসে থাকবে। মুফতি সাহেব নামাজ পড়ে চলে যাওয়ার সময় দেখা করে বলবে, বানুরি সাহেব আপনাকে বাসায় চা পানের দাওয়াত করেছেন। কথামতো সেই শিক্ষক সাহেব মুফতি সাহেবের পেছনে গিয়ে বসে থাকেন। মুফতি সাহেব নামাজ শেষ করে বের হওয়া মাত্র শিক্ষক মহোদয় তার সাথে সালাম-কালাম করে বিনয়ের সাথে আল্লামা বানুরির বাসায় আমন্ত্রণের খবরটি জানান। মুফতি সাহেব 'আচ্ছা ঠিক আছে বলে' বলেন যে, আপনি যান আমি আসছি! কিন্তু শিক্ষক মহোদয় অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে বলেন, হজরত আমাকে আদেশ করেছেন যেন আপনাকে সাথে নিয়ে যাই। এই ঘটনাটি বর্ণনার সময় মুফতি সাহেব বলছিলেন, 'আমার বুক তখন দুরুদুরু করা শুরু করেছিল। পাঠান মানুষ আজকে আমার কী করবে আল্লাহই ভালো জানেন! দোয়া-দরুদ পড়তে পড়তে আমি সেই ভাইয়ের সাথে বানুরি সাহেবের বাসায় যাই।'

বানুরি সাহেবের বাসায় গেলে মুফতি সাহেবকে তিনি আলিঙ্গন করে বসতে দেন। দুপুরে খাবার খেয়েছেন কি না জিজ্ঞাসা করলে মুফতি সাহেব জানান তিনি খেয়ে এসেছেন। আল্লামা বানুরি তার সামনে চা পরিবেশন করে নিজে খাবার গ্রহণে বসে যান। খাবার গ্রহণ শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন

মুফতি সাহেব? আমাকে কিছু না বলে কোথায় চলে গিয়েছিলেন আপনি? মুফতি সাহেব তাকে ঘটনা বিস্তারিতভাবে খুলে বলেন। আরো জানান, 'হজরত, এখানে আমার মন অনেক বিষাক্ত হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আমার এখানে অবস্থান করা সম্ভব ছিল না। তাই আমি আমার অপবাদের প্রমাণ সৃষ্টির জন্য জামায়াতিদের প্রতিষ্ঠান আবাদ করতে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে তো কোনো মানুষ পড়াশোনা করে না! সব গাধা-গর্ধভ এবং গৃহপালিত পশু ওরা।[৮৬] ফলে দুই সপ্তাহ থেকে আমি আবার বাসায় চলে এসেছি! এই হলো আমার বর্তমান অবস্থা। বানুরি সাহেব এই খবর শুনে হাসতে হাসতে ফেটে পড়েন। তিনি বলতে থাকেন, জামায়াতিদের প্রতি আমার করুণা হয়! ওদের মাঝে দীনের কোনো ইলম নেই। ওদের বড়দের কাছে যদি না থাকে ছোটরা কোথা থেকে ইলম অর্জন করবে! আপনি সেখান থেকে চলে এসে ভালো করেছেন। আপনাকে তো আমি অনেক আশা করে নিউটাউনে এনেছিলাম। আমার আশাবাদ রয়েছে আপনি শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন। আপনার চলে যাওয়াতে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল আপনি অবশ্যই ফিরে আসবেন। এজন্য সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও আমি আপনার কিতাব কাউকে দিইনি। মুফতি সাহেব! আপনি কাল থেকে যোগদান করুন। আপনার ব্যাপারে যত কথা উঠেছে আমি সব শুনেছি। আমি জানি এগুলোর কোনোটিই আপনার মাঝে নেই। আমি তাদের ইসলাহ করব। এ ছাড়াও যদি আপনাকে পরবর্তী সময়ে কেউ কিছু বলে, সরাসরি আমাকে জানাবেন। আমি তাদের সবাইকে উচিতশিক্ষা দেব।

দীর্ঘ প্রায় একঘণ্টার গল্পের পর মুফতি সাহেব গল্পের ইতি টানতে টানতে বলেন, এরপর থেকে আমাকে কোনো ছাত্র বা অন্য কেউ যদি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করত, তখন আমি তার বোধ্যতার স্বল্পতার জন্য তাকে মওদুদি বলে সম্বোধন করতাম! এটি আমার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এখানকার তালিবে ইলমরা মোটামুটি সবাই জেনে গেছে। নতুনরা অনেকে না জানায় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আমি তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

ওয়ালি সত্যিই ওলী

উনার সাথে তো আমার বাবা-ছেলের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা ইদরিস সাহেব যখন আমাকে তাখাসসুস ফিল হাদিসে ভর্তি হবার জন্য হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়তে দিয়ে হজের সফরে গিয়েছিলেন, তখন থেকেই মুফতি সাহেব আমাকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। সবসময় অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকতাম বলে তিনি আমাকে

---

[৮৬]. শাস্ত্র ও পড়াশোনার সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক না থাকায় এমন করে বলেছেন।

পড়ুয়া বাঙালি নাম দিয়েছিলেন। আমার মাঝে উনার মতো সহজ সরল ব্যক্তিত্ব থাকায় তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আল্লামা বানুরি সাহেব যখন তাখাসসুস উদ্বোধন করেন, তখন মুফতি সাহেব আমার সরাসরি অভিভাবকে পরিণত হন। দিনরাত তার অধীনেই অধ্যয়ন করতে থাকি। এভাবে মুফতি সাহেবের সান্নিধ্য আমার জীবন আমূল বদলে দেয়। আমার জীবনের উপর মুফতি সাহেবের সুবিশাল প্রভাব আপনারা হয়তো লক্ষ করে থাকবেন।

অস্তিত্বে দারুল ইফতাঃ কল্পনা থেকে বাস্তবে

আজ আমি বলব কীভাবে নিউটাউনে তাখাসসুস ফিল ইফতা বিভাগ চালু হয় এবং কীভাবে আমি সেখানে দাখেলা নিই। পরবর্তীতে আল্লাহর রহম ও ফজলে কীভাবে আমি সেখানে খেদমতে নিয়োজিত হই।

দাওরার বছর তো মাওলানা ইদরিস সাহেব হুজুর আমাকে তাখাসসুস ফিল হাদিসে বসে মুতালায়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আমি সারা বছর হাদিসের শুরুহাত (ব্যাখ্যাগ্রন্থাদি) সাধ্যের সবটুকু দিয়ে মুতালায়া করি। এতে করে আমার হাদিসের ইলম আগের চেয়ে অনেক বেশি পোক্ত হয়। বছর শেষ হবার পর আমি চেয়েছিলাম তাখাসসুসে দাখেলা নেব। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। মাওলানা ইদরিস সাহেব উমরায় রওনা হচ্ছিলেন। সাথে আল্লামা বানুরি সাহেবও। উনারা প্রায় বছরই হজ-উমরায় যেতেন। যাওয়ার পূর্বে আমাকে তাখসসুস ফিল হাদিসের কিতাব মুতালায়া করতে বলে যান। আমি দাখেলার কথা বললে হজরত বলেন, আমি দেখে নেব ব্যাপারটি। তুমি পড়াশোনা চালিয়ে যাও। যেহেতু উনি সেই বিভাগেরই মুশরিফ ছিলেন; তাই আমি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। তাদরিবুর রাবি ও ইবনুস সালাহের মুকাদ্দিমা পড়তে থাকলাম। শাবানের ইমতেহানের পর থেকে শাওয়াল-জিলকদ প্রায় পুরো সময় এভাবেই নিবিড় অধ্যয়নে কেটে গেল। আমি এই কিতাবগুলো অধ্যয়নের সময় কিছু নোটও রেখেছিলাম। উমরা থেকে এসে ইদরিস সাহেব হুজুর আমাকে ডাকলেন। আমি দেখা করলে উনি বললেন, নোটপাতি কিছু করেছ নাকি শুধু মুতালায়া করে গেছ? আমি নোট দেখালে হজরত খুব সন্তোষ প্রকাশ করেন। উনি আমাকে বাহবা দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বলেন। আমি সেখানে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু দাখেলার কথা এবার আর লজ্জায় বলতে পারিনি। হজরত বললেন, হজ থেকে আসতে আসতে যেন দেখি শেষ করে ফেলেছ। আমি উনাকে দোয়ার আবেদন জানাই।

এদিকে হজে গিয়ে আল্লামা বানুরি সাহেব, মাওলানা ইদরিস সাহেবকে নিয়ে কাবা-চত্বরে বসে গল্প করতে করতে একপর্যায়ে উনার মনের একটি ইচ্ছা প্রকাশ

করেন। সেটি ছিল নিউটাউনে একটি মানসম্মত তাখাসসুস ফিল ইফতা বিভাগ খোলার পরিকল্পনা, যা সময়ের চাহিদা পূরণে উম্মতকে সাহায্য করবে। এজন্য উনি মাওলানা ইদরিস সাহেব হুজুরকে অনুরোধ করেন যেন কিছু ছাত্র এই বছরের জন্য প্রস্তুত করা হয়। বছর যেহেতু শুরু হয়ে গেছে, একটু কষ্ট হবে হয়তো, কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন এই বছরেই বিভাগ শুরু হোক। ইদরিস সাহেব উনাকে আশ্বাসবাণী শোনান। কিন্তু উনার মনেও চিন্তার রেখা উঁকি দেয় যে, বছরের এই সময়ে এসে কীভাবে ছাত্র সংগ্রহ করবেন? যারা হাদিসে দাখেলা নেওয়ার তারা তো নিয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই আমার দাখেলা না হওয়ার কথা তাঁর মনে উদয় হয়। আমাকে রেখে আরো কিছু ছাত্র সংগ্রহের চিন্তা তাঁর মাথায় আসে। কিছুটা ভারমুক্ত হন তিনি।

দেশে ফিরেই মাওলানা ইদরিস সাহেব আমাকে ডেকে নিলেন। তখন ওখানে মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেবও ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাখাসসুস ফিল হাদিসেই দাখেলা নেবে? আমি বললাম, হজরত, হাদিস পড়ার জন্যই তো এসেছিলাম। কিন্তু আপনারা যদি অন্য কোনো ফয়সালা করেন আমি তাতেও রাজি আছি। তখন মাওলানা ইদরিস সাহেব আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি ফিকহের পথে এসে পড়ো। আমরা নতুন বিভাগ খুলব। তুমি হবা আমাদের নিউটাউনের ইতিহাসে তাখাসসুস ফিল ফিকহের প্রথম ছাত্র। তুমি আরো কিছু ছাত্রভাইকে এই বিভাগের গুরুত্ব বুঝিয়ে দাখেলা নেওয়াতে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের সহযোগিতা করবে। আমরা তোমার জন্য দোয়া করি।

আমি কামরায় ফিরে এসে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। উসতাদদের এমন স্নেহনজর কজনের ভাগ্যেই জোটে! উনারা আমার কথা বিশেষভাবে স্মরণ রেখেছেন। আমি উনাদের আদেশমতো ছাত্রভাইদের প্রতি নজর দিতে লাগলাম। এক ভাইকে পেলাম তাখাসসুস ফিল হাদিস শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। উনি ছিলেন ঢাকার মানুষ। মাওলানা মুজিবুর রহমান ছিল তার নাম। আমি যখন উনাকে বুঝালাম, উনি আগ্রহের সাথে আমার প্রস্তাব কবুল করে নিলেন। কারণ নিউটাউনের মতো অভিজ্ঞতম উসতাদদের তত্ত্বাবধানে আরো কিছু সময় অতিবাহিত করা সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়। ফলে আমি আর মুজিব ভাই দুজন প্রস্তুত হয়ে গেলাম। আর এক ভাই সে বছর আমাদের সাথে দাখেলা নিয়েছিলেন। তিনি

ছিলেন সোয়াতের বাসিন্দা। আকুড়াখটক[৮৭] থেকে উনি ফারেগ হয়েছিলেন। আল-বাইয়্যিনাতে বানুরি সাহেব এই বিভাগের জন্য একটি প্রচারণা চালান। সেখানে দাখেলার জন্য আবেদন করার প্রাথমিক শর্তাদি উল্লেখ ছিল। তন্মধ্যে মুমতাজ হওয়া এবং নিজ প্রতিষ্ঠান বা অঞ্চলের বড় আলিম থেকে প্রশংসাপত্র থাকার কথা উল্লেখ ছিল। এই দুই শর্ত মেনে কিছু আবেদন আসে। তন্মধ্যে এহসানুল্লাহ সোয়াতি সাহেবের আবেদন বানুরি সাহেবের পছন্দ হয়। তবু উনি তাকে চিঠিতে লেখেন, আপনি অতি সত্বর চলে আসুন। আমরা এখানে আপনার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে এরপর দাখেলা নেব ইনশাআল্লাহ।

উচ্চশিক্ষার রাজপথে

দারুল ইফতার পাশেই একটা ছোট জায়গা ছিল। সেটিকে তাখাসসুস ফিল ইফতার জন্য নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত দিনের পূর্বেই সোয়াতি সাহেব নিউটাউনে পৌঁছে যান। আমরা তিনজন পরস্পর পরিচিত হই। পরদিন মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেব আমাদের মৌখিক পরীক্ষা নেন। আলাদাভাবে কিছু প্রশ্ন করেন তিনজনকে। আমাকে তাদবিনে ফিকহের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেন। আমি সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। বাকিরাও ভালোভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আমাদের বিভাগের নিসাব বা সিলেবাস মুফতি সাহেবের সহায়তায় আল্লামা বানুরি সাহেব তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই একই নিসাব পরবর্তীতে আমি হাটহাজারিতে চালু করি। সম্পূর্ণ দুই বছরের কোর্স। আমরা তিনজন এই নিসাব সামনে রেখে পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। তারিখে ফিকহ, রিজালশাস্ত্র, তারিখে ফুকাহা, ফাতাওয়ার কিতাব, ব্যাখ্যাগ্রন্থাদি ধীরে ধীরে চলতে থাকল। একে একে শামি, আলমগিরি, কাজিখান চোখের সামনে আসতে থাকে। যদিও আমি এগুলো আগেও মুতালায়া করেছিলাম। এখন আরো গভীরভাবে মুতালায়া চলতে থাকল। গাইরে নিসাবি ফিকহি কিতাবাদিও পড়তাম। নিউটাউনের কুতুবখানার মৌমাছি হয়ে যাই এক সময়। অধ্যয়নের নেশা মানুষকে পাগল করে দেয়। তাখাসসুসের দু'বছরে বি-হামদিল্লাহ আমি কয়েকশত ফিকহি কিতাব মুতালায়া করেছি। এই সময়ে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল আল্লামা ইবনুল কাইয়িমের ই'লামুল মুওয়াক্কায়িন। অসাধারণ একটি কিতাব! এ ছাড়াও ড. ইউসুফ মুসা মিশরির তারিখে ফিকহে ইসলামি, আল্লামা শাতিবির আল-মুওয়াফাকাত, ইমাম আবদুল আযিয বুখারির কাশফুল আসরার (ইজমা-কিয়াস অধ্যায়) প্রভৃতি গ্রন্থও আমার হৃদয় আলোকিত করে।

---

[৮৭]. পাকিস্তানের বিখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠান। আবদুল হক হক্কানি এর প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় দারুল উলুম দেওবন্দ বলা হয় এই প্রতিষ্ঠানকে।

দ্বিতীয় বছরের শেষদিকে মুফতি সাহেব আমাদের মাকালা (থিসিস) লিখতে বললেন। তিনজনকে ডেকে তিনটি বিষয় দেওয়া হলো। এক. আলকাজা ফিল ইসলাম। দুই. আবু হানিফা ওয়া ফিকহুহু এবং তিন. বাইয়ুল হুকুক ফিত তিজারাতির রায়িজাহ।

আমার ভাগে তৃতীয়টি পড়ে। যদিও আমি আলকাজা নিতে চেয়েছিলাম। সেজন্য ই'লামুল মুওয়াক্কায়িন কিতাবের চারটি খণ্ডই ভালোভাবে পড়েছিলাম। খুবই চমৎকার একটি কিতাব। আমি এমনকি কিছু দোস্ত-আহবাবকে কিতাবটি কেনার পরামর্শও দিয়েছিলাম। কিন্তু উসতাদদের পরামর্শে মাকালা হিসেবে তৃতীয়টিই নিই। সময় দেওয়া হলো তিন মাস। এই সময়ের মধ্যে একটি মানসম্মত মাকালা লিখতে হবে। শুরু হয় বিষয়ের উপর পড়াশোনা। আমি নিউটাউনের লাইব্রেরি থেকে শুরু করে করাচির লাইব্রেরি সব ছেটে ফেলি। দুই মাস পড়াশোনার পর একটা মোটামুটি ধারণা ফুটে ওঠে মস্তিষ্কে। কিন্তু কিছু আধুনিক বিষয় তখনো সমস্যা আকারে থেকে যাওয়ায় আমার লেখা শুরু হতে একটু বিলম্ব হয়। উনাদের লেখা সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। উনারা খুব রুটিন করে চলতেন। সময়ের খাওয়া সময়েই করতেন। ঘোরাঘুরিও করতেন সময় বের করে। কিন্তু আমি মুতালায়া করতাম বেশি। নোটও নিতাম খুব। তবে আমার খাওয়া-ঘুম সময়মতো হতো না। কখনো টানা দশ ঘণ্টাও মুতালায়া করেছি। তাই আমার লেখা শেষ হতে অতিরিক্ত পুরো এক মাস লেগে যায়। মাকালার উপর একটি রিপোর্টও জমা দিতে হয় মূল মাকালার সাথে। সেখানে কী কী তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, কতটুকু মুতালায়া হয়েছে সেসব উল্লেখ করতে হয়। আমার রিপোর্টে আলহামদুলিল্লাহ উল্লেখ করি—আমি দুইশতাধিক তথ্যসূত্র ব্যবহার করেছি। মুতালায়ার পরিমাণ উল্লেখ করি আটচল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা। যদিও আমার মুতালায়ার পরিধি পঞ্চাশ হাজার পৃষ্ঠা ছাড়িয়েছিল। কিন্তু সতর্কতাবশত আমি কিছু কম লিখি। মাকালা তিন কপি বানিয়ে দফতরে জমা দিয়ে মৌখিক পরীক্ষার অপেক্ষায় অধিক মুতালায়া করতে থাকি।

পরিশ্রমের মূল্যায়ন

মাকালা প্রথম দেখেছিলেন মাওলানা ইসহাক সন্ধলবি সাহেব। উনি নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌতে শাইখুল হাদিস ছিলেন। সেখানকারই ফারেগ তিনি। আদিব মানুষ। থানবির মুজায ছিলেন। আল্লামা মুফতি হায়দার আলি খান সাহেবের ছাত্র। আরবি, ইংরেজি ও উরদু তিন ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। বানুরিকে উনি হিজরত করে পাকিস্তানে আসার কথা জানিয়ে হিন্দুস্থান থেকে চিঠি লিখেছিলেন। বানুরি সাদরে তাকে নিউটাউনে স্বাগত জানান। হিন্দুস্থানের অনেক হীরা এভাবে বানুরির মাধ্যমে নিউটাউনে জড়ো হয়েছিলেন। উনি নিউটাউনের দারুদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ

বিভাগের মুশরিফ ছিলেন। এটিও ছিল একটি নতুন তাখাসসুস বিভাগ। পরে তিনি ইফতা বিভাগের মুশরিফও হয়েছিলেন। আমরা উনার কাছে হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ পড়েছি। আমাকে খুব মহব্বত করতেন। আমার মাকালা পড়ে উনি মন্তব্য করেন যে, এটি একটি আনোখা (অনন্য) মাকালা। ফিকহি ধাঁচে লেখা হয়েছে। খুবই ভালো মাশাআল্লাহ। আমি তো একশতে ১০০ দিতে চাই।

এরপর আমার মাকালা আবদুর রশিদ নুমানির হাতে যায়। আবদুর রশিদ নুমানি ভাওয়ালপুর থেকে আবার চলে এসেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা তার খুব একটা পছন্দ হচ্ছিল না। পাঁচশ রুপির পরিবর্তে আবার দুইশ রুপির বেতনে ফিরে আসেন তিনি। নুমানি সাহেব নিউটাউনে ফিরে এলে বানুরি তাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে জামায়াতে ইসলামির ব্যাপারে সংশয় নিরসন করার অনুরোধ করেন। প্রশ্ন শুনে নুমানি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, দেখুন! আমি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী। মওদুদিপন্থিদের সাথে মিশলেও তাদের আকিদার কোনো অংশই আমি গ্রহণ করিনি। ‘ইবনে মাজাহ ও ইলমে হাদিস’ নামে আমার স্বতন্ত্র একটি গবেষণাগ্রন্থ রয়েছে। সেখানে আমি ফিকহে হানাফির পক্ষাবলম্বন করে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। নদওয়াতুল ওলামায় পড়লেও দেওবন্দ এবং সাহারানপুরে আমার যাতায়াত ছিল। এরপরও যদি আমার প্রতি অভিযোগ ওঠে, তাহলে আমার কিছু বলার থাকবে না। বানুরি তাকে নিশ্চিত করেন, ইনশাআল্লাহ আমি আশ্বস্ত হলাম। আপনার কোনো সমস্যা নেই। আপনার যতদিন ইচ্ছা পুনরায় নিউটাউনে অবস্থান করুন। পরবর্তীকালে তিনি তাখাসসুস ফিল হাদিসের প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে পদ গ্রহণ করেন। এই পদে ইতিপূর্বে মাওলানা ইদরিস সাহেব হুজুর অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু মাওলানা ইদরিস সাহেব পরবর্তীকালে বেফাকুল মাদারিসের সদর নির্বাচিত হন।

আবদুর রশিদ নুমানি সাহেবের কাছে যখন আমার মাকালা পৌঁছে, তখন আমার একটু শিক্ষা হয়। তিনি অত্যন্ত উঁচুদরের সাহিত্যিক ছিলেন। উরদু, ইংরেজি, আরবি, ফারসি সকল ভাষাতেই তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আমার মাকালায় সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক ভুল বের করেন এবং আমাকে ভাষাগত দিকে নজর দেওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। এত কঠিন বিষয়ের উপর এত সুন্দর প্রবন্ধের জন্য তিনি উৎসাহও প্রদান করেছিলেন। আমাকে মুমতাজ নম্বর ও প্রথম স্থান দেওয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ!

মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেব আমার মাকালা দেখে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভঙ্গিতে মুমতাজ হিসেবে মন্তব্য প্রদান করেন।

আমিও মুফতি!

আল্লামা ইউসুফ বানুরি শুধু একজন মুহতামিম ছিলেন এমন নয়, তিনি একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ছিলেন। শাহ সাহেবের শাগরেদ ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি শুধু মুহাদ্দিস নই, আমি মুফতিও। শাহ সাহেবের অধীনে তিন বছর ফতোয়া লিখেছি। একদিনও শাহ সাহেব কালির আঁচড় ফেলতে পারেননি। সে হিসেবে আমিও মুফতি! আমাকে দেওবন্দে সদর মুফতি ও শাইখুল হাদিস হিসেবে নিয়োগ দান করা হচ্ছিল। কিন্তু আমি হিজরত পছন্দ করেছিলাম। তাই এই বড় ইলমি পদগুলো আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিয়েছি।'

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য

আমাদের যখন মাকালা দেখা হচ্ছিল, সে সময় আমাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল আপনাকে একটু বিস্তারিত বলি।

আমাদের পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর বানুরি সাহেব আমাকে বলেছিলেন, তুমি দুই মাস থাকো আপাতত। একটু বিশ্রাম নাও, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ো কী করবে! আমিও তার কথামতো থেকে যাই। এসময় মেহমানখানায় অবস্থান করি। খাদেম বাদশাহ খানকে আমার পানাহার এবং দেখভালের জন্য বলে দেন আল্লামা বানুরি। অবসর সময়ে বিস্তর অধ্যয়ন শুরু করি। বানুরি সাহেব একজন ছাত্রভাইকে আমার দেখাশোনার জন্য বিশেষভাবে নিয়োগ দেন। কিন্তু এভাবে এত ধরাবাঁধা ছকে জীবন ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল একটু কোথাও ঘুরে আসি। করাচিতে আমার এক সাথি ছিলেন। কারি সাহেব হিসেবে স্থানীয়ভাবে পরিচিত ছিলেন তিনি। আমি দুই-তিনদিন থেকে তার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। একদিন সকালে খাদেম সাহেবকে নাশতার সময় জানালাম, আমি একটু আমার সাথির কাছে যাচ্ছি। কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে আপনি এতটুকু বলে দেবেন। এটুকু বলেই আমি সাথির কাছে চলে আসি।

আমার সাথি একটি মসজিদের ইমাম-খতিব ছিলেন। বেড়াতে গিয়ে তার কোয়ার্টারে থাকা শুরু করি। দু-সাথি অবসরে গল্পগুজব হাসি-মজা করে সময় কাটাচ্ছিলাম। খাবারদাবারেও ছিল পুরো বাঙালিয়ানা ভাব। অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছাই ছিল না। ভাবছিলাম টানা একমাস এখানেই থেকে যাব।

এদিকে কয়েকদিন যাবৎ আমাকে দেখতে না পেয়ে বানুরি সাহেব খাদেম ভাইকে জিজ্ঞাসা করেন, আবদুস সালাম সাহেব কোথায়? খাদেম সাহেব এতটুকুই জানান যে তিনি আমাকে সাথির কাছে যাওয়ার কথা বলে গিয়েছেন। কতদিন থাকবেন বা কবে

আসবেন সে সম্পর্কে কিছুই বলে যাননি। বানুরি সাহেব জানতে পেরে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। আমার বিষয়ে হয়তো তার কোনো পরিকল্পনা ছিল। আমি হঠাৎ না বলে এভাবে চলে যাওয়ায় তিনি আমার খোঁজ করতে থাকেন।

কারি মুসার ওখানে আমি খুব ভালো সময় কাটাচ্ছিলাম। বহুদিন পড়াশোনার চাপ থেকে মুক্ত হয়ে আকাবিরের জীবনী ও সাথির সাথে গল্পগুজব করার পাশাপাশি নানা পদের বাঙালি খাবার খেয়ে ১৫ দিন অতিবাহিত করে ফেলি। মিকরোড জং প্রেস জামে মসজিদে আমি অবস্থান করছিলাম। তখনই একদিন বুধবারে একটি স্বপ্ন দেখি। এ স্বপ্নটি আমাকে কারি মুসার ডেরা থেকে নিউটাউনের পথের পথিক বানিয়ে ফেলে।

স্বপ্নে বানুরি

স্বপ্নে দেখি, আমি বাংলাদেশে চলে এসেছি। আব্বার অধীনে থেকে জমিজমা দেখাশোনা করি। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় আল্লামা বানুরি সাহেব আমাদের বাসায় আগমন করেন। আমি সেসময় জামে মসজিদের ঘাটে অজু করছিলাম। আব্বাজান আমাকে বলেন, আল্লামা বানুরি তোমাকে দেখতে এসেছেন আর তুমি এখানে বসে আছ! আমি হন্তদন্ত হয়ে তাকে দেখে দৌড়ে ছুটে গিয়ে সালাম-মুসাফাহা করে তাকে অভ্যর্থনা জানাই। হজরতকে বৈঠকখানায় বসতে দিয়ে আব্বাজানকে ডেকে নিয়ে আসি। আব্বাজান তার সাথে সাক্ষাত করে স্বাগত ও শুকরিয়া জানান। এতদূর থেকে সফরের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে বানুরি সাহেব বলেন, আপনার ছেলে তো আপনার ছেলেই! কিন্তু আমিও তার রুহানি পিতা। সে হিসেবে আবদুস সালাম আমারও ছেলে। আপনি তাকে শুধু নিজ স্বার্থে ও পারিবারিক স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন আর আমি তাকে উম্মতের স্বার্থে কাজে লাগাতে চাই। আমার অনুরোধ, আপনি আপনার ছেলেকে আমার হাতে সোপর্দ করে দিন। আমি তাকে উম্মতের কল্যাণে কাজে লাগাবো। এর সব নেকির ভাগ আপনিও পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

বাড়িতে যা ছিল তা দিয়েই বানুরি সাহেবকে আপ্যায়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সম্ভবত সেদিন বড় মাছ রান্না করা হয়েছিল। বানুরি সাহেব খুব স্বাচ্ছন্দ্যে মাছ-তরকারি আহার করেন। খাবার শেষে তিনি আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে ঘাটের উদ্দেশে হাঁটা দেন। আমিও পিছে পিছে তার সাথে হাঁটতে থাকি। বানুরি সাহেব আমাকে বলেন, আবদুস সালাম, তুমি খুব দ্রুত তৈরি হয়ে নিউটাউনে চলে এসো। তোমাকে আমরা কয়েকদিন ধরে খুঁজছি। আমি তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করি, হজরত, আপনি এত দূরের পথ এই রাত্রে কীভাবে সফর করবেন? আল্লাহর ওলী পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে বললেন, সামনে আমার নৌকা অপেক্ষা করছে! তোমাকে এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এই বলে বিদায় নিয়ে ঘাটে নেমে গেলেন। আমাদের বাড়ির পাশে একটি নদী ছিল। সেখানে তার

সাম্পান বাঁধা ছিল। তিনি সেটাতে চড়ে গন্তব্যপানে চলে গেলেন। আমি তাকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে বাসায় ফিরে আসি। এ সময় আব্বা আমাকে বলেন, তোমার উসতাদ তোমার উপর ভরসা করেছেন। এমন নির্ভরতা ও আস্থা বড় বড় আলিমরা সবার উপর রাখেন না। তুমি জমিজমা দেখাশোনা ছেড়ে তার কাছেই ফিরে যাও। তোমার থেকে দুনিয়াবি কোনো প্রতিফল ও প্রত্যাশা আমি রাখি না। ঠিক এসময় আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। খেয়াল করে দেখি, আমি মিকরোড জং প্রেস জামে মসজিদের একটি কামরায় শুয়ে আছি!

বিনে পয়সার চাকরি!

ঘুম থেকে জেগে নিউটাউনের পরিবেশ নিয়ে ভাবতে থাকি। হায়! আমাকে হয়তো খুঁজে ফেরা হচ্ছে। বানুরি সাহেব হয়তো আমাকে খুঁজছেন। যার ফলে এমন স্বপ্ন আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেখিয়েছেন। কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে রাখি। সাথিকে কিছু না জানিয়ে বৃহস্পতিবার সকালেই ফজর পড়ে নিউটাউনের উদ্দেশে রওনা দিই। সে সময় আমার পকেটে একটি রুপিও ছিল না। তিন মাইল পথ আমি হেঁটেই পাড়ি দিই। সারা রাস্তাজুড়ে ভাবতে থাকি, বানুরি সাহেব জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে কী জবাব দেব! ভাবতে-ভাবতে পৌঁছে যাই মাদরাসায়। সোজা দারুল ইফতায় চলে আসি। মুফতি সাহেব হুজুরের কাছে গিয়ে অবনত মস্তকে বসে পড়ি। হজরত, আমাকে মাফ করে দিন! আমি কয়েকদিন অবকাশ যাপন করার জন্য এক সাথির কাছে গিয়েছিলাম। এরপর পুরো ঘটনা বর্ণনা করে ফেলি।

মুফতি সাহেব আমার স্বপ্নের ঘটনা শুনে বলেন, তুমি ঠিকই দেখেছ। বানুরি সাহেব তোমাকে কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাদেরকে এবং ছাত্রদেরকেও বারবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। তোমার উচিত ছিল তোমার অবস্থানস্থল সম্পর্কে খাদেম ভাইকে জানিয়ে যাওয়া। যাই হোক, তুমি একটা কাজ করো। মাওলানা ইদরিস সাহেব হুজুরের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করো যে, তুমি অবসরের এই সময়ে কী করতে চাচ্ছ।

হঠাৎ এই সময় মাওলানা ইদরিস সাহেব হুজুরের আগমন ঘটে। মৃদু ধমকের সুরে বলেন, কোথায় চলে গেছিলে? আমরা পাগল হয়ে তোমাকে খুঁজে ফিরছি! কাছে গিয়ে পরামর্শ করি। হুজুর আমাকে একটি ছোট্ট কাগজ নিয়ে আসতে বলেন। দপ্তরিকে বলে একটি ছোট কাগজ সংগ্রহ করে ইদরিস সাহেব হুজুরের কাছে ফিরে আসি। হুজুর আমাকে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লিখতে বলেন। কথাগুলো অনেকটা এমন ছিল-

'হজরতওয়ালা, আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাখাসসুস ফিল ইফতা কোর্স সম্পন্ন করেছি। এখন আল্লাহর বান্দা অবসরে রয়েছি। দীনের খেদমতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লালন করি। আপনার অনুমতি হলে মুফতি সাহেবের সহযোগিতায় সময় ব্যয় করতে চাই। আপনার অনুমতি ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়...

—আবদুস সালাম'

এমনই কিছু কথা তিনি আমাকে সেই চিরকুটে লিখিয়ে এরপর নিজে প্রথমে দস্তখত করে মুফতি সাহেবের নিকট থেকেও স্বাক্ষর নিতে বলেন। সাথে এও বলে দেন যে, মুফতি সাহেব, এই ছেলেটির কদর করুন। এমন কিতাবপ্রেমী মোল্লা, পরিশ্রমী ও কর্মঠ মানুষ আপনি সহজে পাবেন না। আমি দুজনের থেকেই স্বাক্ষর গ্রহণ করে মুফতি সাহেবের কাছে দোয়া চাই। মুফতি সাহেব হেসে বলেন, বানুরি পাঠান মানুষ! সামান্য বকা দিলে ভয় পেয়ো না। তুমি তো জানোই, আমিও কতটা ভয় পাই উনাকে।

দুরুদুরু বুকে কাগজ হাতে নিয়ে বানুরি সাহেবের দারুত তাসনিফ অফিসের সামনে গিয়ে আদবের সাথে জোরে সালাম করি। আন্দার আ যাইয়ে! শোনার পর আস্তে করে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করি। বানুরি সাহেব আমাকে দেখে বলেন, আবদুস সালাম, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আমাদের কাউকেই কিছু বলে যাওনি! নিউটাউন বুঝি অনেক সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে তোমার কাছে!

আমি কী জবাব দেব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই অবনত দৃষ্টিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। হজরত আমাকে একটি চেয়ারে বসতে বলেন। এরপর বলতে থাকেন, দেখো, তোমার মাধ্যমে আমরা তাখাসসুস উদ্বোধন করেছিলাম। আল্লাহর রহমতে তোমরা ভালোই পড়াশোনা করেছ। এখন দারুল ইফতায় সময় দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু যোগ্য ও মেধাবী তরুণ আলিম দরকার। হজরত এতটুকু বলা মাত্র আমি কাগজটি তার দিকে এগিয়ে দিই। তিনি একবার কাগজটির দিকে তাকিয়ে আবার আমাকে বলতে থাকেন, হ্যাঁ, তাদের সাথে আমার কথা হয়েছিল। তোমার ব্যাপারে তারাও অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। একথা বলেই তিনি কাগজের উলটো পিঠে সামান্য দুটি কথা লিখে স্বাক্ষর প্রদান করেন। এভাবে আমার নিউটাউনে খেদমতের সুযোগ হয়ে যায়।

বানুরি সাহেবের অফিস থেকে ফিরে আবার দারুল ইফতায় আসি। আমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে মুফতি সাহেব এবং ইদরিস সাহেব হুজুর বুঝে যান যে,

ছেলে সফল হয়ে ফিরে এসেছে! ইদরিস সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে আলিঙ্গন করি। মুফতি সাহেব আমাকে দোয়া দিয়ে বলেন, এখন থেকে সময় অপচয় না করে আমার সাথে কাজ করবে। আমি তাদের দুজনকে আবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আমার কামরায় ফিরে আসি।

এ দিনটি ছিল ১৫ জুমাদাল উলা। সেসময় নিউটাউনের নায়েবে মুহতামিম দুজন ছিলেন। একজন শিক্ষাকার্যক্রম দেখাশোনা করতেন। অপরজন অর্থনৈতিক বিষয়াদি দেখাশোনা করতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি জেনারেল ধারায় উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। মানুষটির নাম ছিল মির আলম লাগারি। অত্যন্ত ধনী মানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু দীনদার হওয়ার পর বানুরি সাহেবের সোহবত এখতিয়ার করেন। ফলে সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যের জন্য তিনি মাদরাসার এই পদটি বিনা বেতনে গ্রহণ করে সান্নিধ্যের সুযোগটি স্থায়ী করে নিয়েছিলেন। মাওলানা ইসমাইল বামজি নামের একজন আফ্রিকার অধিবাসী ছিলেন। আমার দুবছর আগের ফারেগ ছিলেন তিনি। বানুরির সান্নিধ্য নিতে চাইতেন তিনিও। আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে তালিমাতের কিছু দায়িত্ব বিনা বেতনে অর্পণ করা হয়। তিনি কিছুদিন এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর নিজ দেশে ফিরে যান।

পা রাখলাম স্বপ্নময় কর্মজীবনে

মুফতি সাহেবের সাথে এরপর থেকে কাজ শুরু করে দিই। মুফতি সাহেব ফতোয়া লিখতেন, আমি সেগুলো রেজিস্ট্রি করে রাখতাম। সেই মাসে ১৫ দিন খেদমত করেছিলাম। আমাকে ১৫ দিনের বেতনসংবলিত একটি খাম ইসমাইল সাহেব দিয়েছিলেন। আজও সেই স্মৃতি আমার মনে জ্বল জ্বল করে।

প্রথম দিনই ইসমাইল সাহেব বানুরি সাহেবের আদেশে আমার জন্য নিচতলার ৪নং কামরা নির্বাচন করে দেন। সেখানে একটি আলমারি, একটি খাট এবং একটি ডেস্কের ব্যবস্থা করা হয়। নিউটাউনে শুরুতে ৪টি কামরা ছিল, যেগুলোতে শিক্ষকবৃন্দ আবাসিক সুবিধা গ্রহণ করতেন। এই কামরাগুলোর চতুর্থটি ছিল অধমের জন্য নির্ধারিত। সুবহানাল্লাহ!

নিউটাউনের শিক্ষক এবং ছাত্রদের জন্য গ্যাস স্টোভের ব্যবস্থাও ছিল। কেউ চাইলে নিজেই রান্না করে পছন্দের খাবার খেতে পারতেন।

এই কামরায় আমি জামে মসজিদ উসমানিয়াতে ইমামত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করি। যখন ইমামতি হয়ে যায়, তখন মসজিদের কোয়ার্টারে স্থানান্তর হয়ে গিয়েছিলাম। নিউটাউনের আবাসিক জীবন শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত স্মরণীয় সময় ছিল।

শুকরিয়া রজনী

নিউটাউনে আমার যখন খেদমত চূড়ান্ত হয়ে যায়, সেদিন রাতের কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। প্রায় পুরো রাতজুড়ে কেঁদেছিলাম। পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়াও আদায় করছিলাম। একথাও ভাবছিলাম, ফারেগ হওয়ার পরে হাজারো ছাত্রভাই কত ধরনের পেরেশানিতে পড়ে থাকেন। ছোটখাটো খেদমত সংগ্রহ করতেই তাদের গলদঘর্ম হওয়ার দশা হয়; সেখানে আল্লাহ তায়ালা আমাকে একজন পরদেশি হিসেবে মাত্র পনেরো দিনের মাঝেই একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও খেদমত করার সুযোগ দান করেছেন। এটি আমার মতো নগণ্য বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর অশেষ রহমত ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে! এসব ভাবনার সমান্তরালে আমার সকল শিক্ষক এবং পিতা-মাতার জন্য মন খুলে সারারাত ভরে ইসালে সওয়াব এবং দোয়া করতে থাকি।

দেশীয় প্রতিক্রিয়া : বিদেশের মাটিতে

নিউটাউনে আমার খেদমত পাওয়ার খবর প্রচারিত হলে স্থানীয় উচ্চশিক্ষিত বাঙালিরা অত্যন্ত অবাক ও বিস্মিত হয়। কারণ বাঙালি হিসেবে নিউটাউনে শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়া অনেক বড় বিষয় ছিল। দেশের জন্য যদিও কিছুটা চিন্তিত ছিলাম; কিন্তু নিউটাউনের খেদমত আমাকে সাময়িকভাবে আনন্দিত করেছিল। বানুরি আমাকে প্রায়ই বলতেন, তুমি চিন্তা করো না। একদিন ঠিকই দেশে যেতে পারবে। আপাতত নিজেকে মুহাজির মনে করো। মনে রাখবে, হিজরতের মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে।

ভুলব না দিনটি!

নিউটাউনের শিক্ষকতার প্রথম বছরে আমি ও কারি মুহাম্মদ ইউসুফ হাজারবি ফাতাওয়া রেজিস্ট্রেশনের কাজ করে যাই। পরবর্তী বছর তরজমাতুল কুরআন প্রথম ভাগ ও কানযুদ দাকাইক পড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করি। অবশ্য আমার পূর্বেও কয়েকজন বাঙালি শিক্ষক নিউটাউনে শিক্ষকতা করেছিলেন; কিন্তু প্রত্যেকেই

কিছুদিনের মাথায় চাকরি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। অথবা তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমার সাথে কী হবে আল্লাহই ভালো জানেন!!

প্রথম দিন ক্লাস করাতে গিয়ে ক্লাসে আমার সাথে আজব অবস্থার অবতারণা হয়েছিল। আমি কিতাবের কোনো হরফ দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই কিতাব বন্ধ রেখেই ছাত্রদের সাথে কিছু গল্পসল্প করে ক্লাস শেষ করি। পরবর্তীতে মুফতি সাহেবের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলে মুফতি সাহেব পরামর্শ দেন, তুমি ক্লাস শুরুর পূর্বে কিছুক্ষণ দরুদ শরিফ পড়ে নেবে। আমি মুফতি সাহেবকে অনুরোধ করে বলি, হজরত, আমি দেখতেও তেমন সুন্দর নই। লম্বা-চওড়া, শক্ত-সমর্থ নই। অথচ আমার যেসকল ছাত্রভাই ক্লাসে থাকেন, তারা সবাই অত্যন্ত শক্ত-সমর্থ, লম্বা-চওড়া এবং সৌম্যকান্ত চেহারার অধিকারী। তাদের সামনে তাকরির করতে আমার ভয় হয়!! মুফতি সাহেব এই কথা শুনে হেসে দেন। তিনি বলেন, শিক্ষকতার প্রথম যুগে থাকা অবস্থায় আমার সাথেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। অনেকে তো আমাকে শিক্ষকই মনে করত না। এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ক্লাসের পূর্বে দরুদ পড়বে। পরবর্তী দিন মুফতি সাহেবের কথামতো দরুদ শরিফ পড়তে পড়তে ক্লাসে প্রবেশ করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ, আমার মাতাপিতা এবং উসতাদদের সম্মানকে আপনি বৃথা যেতে দিয়েন না। তারা অত্যন্ত আস্থার সাথে আমাকে শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এরপর হাজিরা গ্রহণ করে যথারীতি পড়ানো শুরু করি। ধীরে ধীরে আল্লাহ তায়ালা আমার মধ্যে একটি ব্যক্তিত্ব দান করেন এবং মনের সকল ভয় দূর করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ!

আমার ছাত্রদের মাঝে পাকিস্তানি ছাড়াও আরাকানি, ইন্ডিয়ান, আফগান, উজবেক এবং মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল এবং আফ্রিকান ছাত্র বেশি থাকতেন। এজন্য এসব অঞ্চলে আমার প্রচুর শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাথি রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে স্মরণ করে থাকে।

পড়াশোনার কলাকৌশল

মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার রহমতে আমার জীবনে প্রচুর অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে। আমাদের পূর্বের আকাবির-আসলাফের জীবন তো ছিল মুতালায়াময়। আমি এসকল ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করব। আশাকরি আপনাদের কিছুটা হলেও উপকার হবে।

অধ্যয়নের জন্য মৌলিকভাবে কয়েকটি বিষয় প্রয়োজন। এক. স্নেহপরায়ণ উসতাদ। দুই. সুষ্ঠু পরিবেশ এবং তিন. কিতাবের প্রাচুর্য।

আমি যখন বাংলাদেশে পড়তাম, তখন শুধু দরসি কিতাব পড়াশোনা করতাম। সেখানেও অতিরিক্ত তথ্যের জন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থাদির সহযোগিতা নিতাম না। বরং কিতাবের চারপাশে ছড়ানো হাশিয়া (পার্শ্বটীকা; মূলপাঠের অতি সংক্ষেপিত ব্যাখ্যা) থেকে সামান্য কিছু পড়ে নিতাম। যেহেতু আমাকে অন্য ছাত্রভাইদেরও পড়া বুঝিয়ে দিতে হতো, তাই কিছু হাশিয়া পড়া হতো। অন্য ভাইয়েরা তো কিতাবের মূল নসেই সীমাবদ্ধ থেকে যেতেন। কিতাবপত্র কেনার ব্যাপারে যদি বলি, তাহলে বলব বাংলাদেশে আমি অন্ধকারে ছিলাম। প্রথম শ্রেণি থেকে দাওরা পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটা মাত্র কিতাব কিনেছিলাম। যেমন : গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, কুদুরি, একটা লুগাত, আরফ শুজি ইত্যাদি। শেষোক্তটি শাহ সাহেবের তিরমিজির তাকরির, যা একটি অনবদ্য ও অনন্য সংকলন। সেই সময়ে উপমহাদেশের অধিকাংশ ছাত্রভাই এটি মুতালায়া করতেন। এ ছাড়া আমার কাছে কোনো গাইরে দরসি কিতাব ছিল না।

ইলমের লোভে

কিন্তু করাচিতে গিয়ে আমি ভিন্ন এক পরিবর্তিত দুনিয়া দেখতে পেলাম। সেখানে ছাত্রভাইয়েরা কিতাবের পর কিতাব মুতালায়া করেন। হাত খরচের পয়সা জমিয়ে কিতাব কিনে রাখেন। সময় পেলে সুবিশাল কুতুবখানায় গিয়ে পড়াশোনা করেন। আমি যখন এই পরিবেশে আসি, স্বভাবতই মুখ হা হয়ে যায়। মন যেন বলে ওঠে এটাই, এটাই সেই পরিবেশ, যা তোমার মন খুঁজত! আমি এত বেশি খুশি হয়েছিলাম যে, আজ সেই অনুভূতি বলে বোঝানো সম্ভব না।

দরসে বসে বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে উপলব্ধ হতে থাকে। পরিবেশ ও উসতাদের যে সুবিধার কথা আমি বললাম, তার একটা বাস্তব রূপ আমি এখানে দেখতে পাই। উসতাদবৃন্দ যারা ছিলেন তারা ছাত্রদের অধিক থেকে অধিকতর অধ্যয়নের ব্যাপারে নানাভাবে আগ্রহী করতেন। কখনো হাদিয়া দিয়ে, কখনো কিতাব দিয়ে, কখনো নিজের ও আকাবির-আসলাফের জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে। বানুরি সাহেব তো হাওয়ালা দেওয়ার সময় প্রায়ই উল্লেখ করতেন, এই বিষয়টি আমি বিশ বছর পূর্বে পড়েছি। অমুক কিতাবটি আমি ত্রিশ বছর পূর্বে দেখেছি। এভাবে বলার ফলে ছাত্রদের মধ্যেও অধিক অধ্যয়নের আগ্রহ তৈরি হতো। হাওয়ালা মনে রাখার ধারা শিক্ষকের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে আসে। হজরত বানুরির কারণে উনার সব

ছাত্রের মাঝেই হাওয়ালা দেওয়ার ও অত্যধিক অধ্যয়নের একটি অভ্যাস খুবই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

জহুরীর জওহর

মুশফিক উসতাদের উদাহরণ বলতে ধরুন মাওলানা ইদরিস সাহেবের কথা। উনি আমাকে তাখাসসুস ফিল হাদিসের কক্ষে বসে মুতালায়ার সুযোগ করে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? আমাকে সাধারণ দাওরার কক্ষে থাকার কথাই বলতে পারতেন। কিন্তু না, উনি আমার আগ্রহের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে আমার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তিনি নিশ্চিত করেন। বিনিময়ে আমি যেন আল্লাহর রহমতে ভালো একটা বদলা উম্মতকে উপহার দিতে পারি। মুশফিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও গভীর পর্যবেক্ষণের অধিকারী উসতাদের এমনই হওয়া উচিত। সবসময় কড়া শাসনের নজরেই শুধু ছাত্রদের দেখলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা সহজে বেরিয়ে আসবে না। তাদের প্রতি স্নেহ ও শফকতের আলাদা নজর দিতে হবে।

আমি দাওরার বছরে শুধু ঘণ্টা করতাম। বাকি পুরো সময় মুতালায়ায় ব্যস্ত থাকতাম। ফাতহুল বারি, উমদাতুল কারি লিল আইনি, বাজলুল মাজহুদ, ফাতহুল মুলহিম এগুলো আমি সে বছরেই মুতালায়া করি।

আদিগন্ত পথচলা

তাখাসসুসে এসে দেখি এক ভিন্ন জগত এটি। ইলমচর্চার নতুন দিগন্ত। মুতালায়ার এত সুযোগ যে দম ফেলার ফুরসত নেই। আল্লাহর রহমতে আগ্রহ থাকায় আমিও আমার সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে ইসতিফাদা করার চেষ্টা করেছি। বানুরি সাহেব নিজেই ঘণ্টা নিতেন। বিভিন্ন মাজহাবচর্চার ব্যাপারে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতেন। আমরা তো দেশে থাকতে শুধু হানাফি মাজহাব চর্চা করতাম। কিন্তু এখানে বিভিন্ন দেশের ছাত্র থাকায় সকল মাজহাবের কিতাবপত্রও মজুদ ছিল। আমরা এই সুযোগে যথাসাধ্য ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাখাসসুসের দু-বছরে আমি সকল মাজহাব চর্চা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। ইমাম শাফেয়ির শারহুল মুহাজ্জাব পড়া হয়েছে। শাফেয়ি মাজহাবে এটি হিদায়ার মতো প্রসিদ্ধ কিতাব। হাম্বলি মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম ইবনু কুদামা আল-মাকদিসির কিতাব আল-মুগনি পড়া হয়। আল-মুদাওওয়ানাতুল কুবরা মালিকি মাজহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব। এই ধরনের সকল কিতাব আল্লাহর রহমতে অধ্যয়নের সুযোগ হয়।

যখন আমি শিক্ষকতা শুরু করি, তখন অন্যান্য মাজহাবের ফিকহের কিতাব পড়ানোর সৌভাগ্য আমার হয়। বিশেষত শাফেয়ি মাজহাবের কিতাব শরহে মুহাজ্জাব শাফেয়ি মাজহাবের কিছু বিদেশি ছাত্রভাইকে কয়েক বছর ধরে পড়াই। মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেব তাই আমার সনদে কয়েক ছত্র বেশি লিখেছিলেন। সেখানে লেখা আছে—আমাদের এই ভাই বিভিন্ন মাজহাবের কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি এই বিষয়ে পাঠদানেরও যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রাখেন।

শিক্ষকতার সময়েও পড়াশোনা ধরে রেখেছিলাম। ইমাম ইবনুল কাইয়িমের ই'লামুল মুওয়াক্কায়িন, ইমাম শাতেবির আল-মুওয়াফাকাত, উসুলে ফিকহের আল-মাজাল্লাহ ফি ইদখালিল মাদখাল প্রভৃতি কিতাব অধ্যয়ন করি। আরো অনেক কিতাব মাকতাবা থেকে নিয়ে পড়তাম। পকেটে পয়সা থাকলে কিতাব কিনতাম। তাখাসসুসের সময়েও গাইরে তাখাসসুস অনেক কিতাব পড়তে হয়েছে।

শেষভরসা যখন আমি

শিক্ষকতার সময়ে কানযুদ দাকাইক নিয়ে একটা মাসআলা উঠেছিল। এই কিতাবটি ছাত্রদের জন্য একটু জটিল মনে হতো। আল্লামা বানুরি সাহেব মুরুব্বি শিক্ষকদের সাথে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। কী করা যায় এ নিয়ে আলোচনা হলো। বানুরি চাচ্ছিলেন কানযের চেয়ে সহজ ও দীর্ঘ ব্যাখ্যাসংবলিত কোনো কিতাব সিলেবাসভুক্ত করা যায় কি না। এই সময় মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব বলেন, আমাদের আবদুস সালাম বেশ অধ্যয়ন করে। তাকে এক বছর এই কিতাব দিয়ে আমরা দেখি। যদি সেও সরলভাবে বুঝিয়ে ছাত্রদের সন্তুষ্ট করতে না পারে, তখন দেখা যাবে। হজরতের অভিমত শুনে আমি তো কিছুটা ভয়ই পেয়ে গেলাম। কীভাবে কী করব এখন!

মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম কীভাবে শুরু করব? একটু রাহনুমায়ী করুন। উনি বললেন এক কাজ করো। উসুলে ফিকহের কিতাব ও মাসায়েলের কিতাব পাশাপাশি রাখো। বাহরুর রায়িক আর তাবয়িনুল হাকায়িক সামনে রাখো। হিদায়া পাশে রাখবে। ফাতহুল কাদিরও রাখবে পাশে। যদি উসুল ও ফতোয়ায় বিরোধ হয় তাহলে ফতোয়াকে প্রাধান্য দেবে। ফতোয়ার কিতাব কিছু সামনে রাখবে, কাজিখান, আলমগিরি। হজরতের উৎসাহে বুকে বল পাই। ঘণ্টাটিকে আমি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম।

সে বছর তরজুমাতুল কুরআন আমার ভাগে পড়ে। সানাউল্লাহ পানিপতি সাহেবের তাফসিরে মাজহারি সামনে রাখতাম। মাআরিফুল কুরআন দুটোই পাশে

ছিল। আর সংক্ষিপ্ত অনুবাদের জন্য তাফসিরে উসমানি রাখতাম সাথে। তরজমাতুল কুরআনের নিসফে সানি দুই বছর পড়িয়েছি। আমি ঘণ্টার জন্য নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করতাম। রাত বারোটা বাজলেও পড়া শেষ করেই উঠতাম। একদিন পড়া শেষ হয়নি। এশার পর বসে ফজরে উঠেছিলাম। একটুও বুঝতে পারিনি। খাবার পাশেই পড়ে ছিল। পরদিন সকালে না ঘুমিয়েই দরস দিয়েছি। এরপর আরাম করেছি। এখন আর তেমন পরিশ্রম করতে পারি না।

এভাবে চার বছর পড়ানোর পর আমাকে হিদায়া পড়াতে দেওয়া হয়। আগে কানযুদ দাকাইক আওয়াল পড়াতাম, পরে সানিও পড়ানোর সুযোগ হয়। এই দফা উলটো ঘটনা ঘটে। আমাকে হিদায়া দেওয়ার সময় বানুরি সাহেবকে মুফতি ওয়ালি সাহেব বলছিলেন, ও কি পারবে এত চাপ সামলাতে? বানুরি সাহেব বলেছিলেন, পারবে পারবে। ও তো এখন পাকা উসতাদ হয়ে গেছে। ওর উপর আমার আস্থা আছে।

বানুরি সাহেবের দোয়ার বরকতে পরবর্তী চার বছর হিদায়া আওয়াল পড়াই। দারুল ইফতাতে তিন ঘণ্টা থাকতাম। বাকি সময় ক্লাস করাতাম। আর রাতে চলত পড়াশোনা। গভীর অধ্যয়ন। শুরুর দিকে তো দারুল ইফতায় দিনে দশটা ফতোয়াও আসত না। এরপর মুফতি সাহেবের অনমনীয় কিছু ফতোয়া সারা দেশে ছড়িয়ে গেলে ফতোয়ার পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। দারুল ইফতায় সেসময় তিনজন মুফতি ছিলেন। টুংকি সাহেব, মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব আর আবদুর রহমান বিন ক্যমলপুরি সাহেব। মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব বানুরি হুজুরের জামাতা ছিলেন। সেসময় নিউটাউনে পাকিস্তানের প্রাণভোমরা আকাবির উসতাদরা অবস্থান করছিলেন। ফলে পড়াশোনার পাশাপাশি রুহানি পরিবেশ ছিল খুব উঁচুমানের। আল্লামা বানুরি সাহেবের পর বুখারি পড়াতেন টুংকি সাহেব। উনার পর মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব। এক বছর পড়ানোর পর তিনি ইনতেকাল করেন। এরপর ড. মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার সাহেব পড়াতেন। উনি অনেক দিন বুখারি পড়িয়েছেন মাশাআল্লাহ। এরপর মাওলানা আনওয়ার বাদাখশানি পড়াতেন। আমার এক বছর পরের ফারেগ ছিলেন তিনি। এক অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ। উনার ব্যাপারে অন্য একদিন বলব।

বিদায় বানুরি!

আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহিমাহুল্লাহ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, আমি তখন সেখানে অবস্থান করছিলাম। বেদনাদায়ক এই স্মৃতি জাগিয়ে তোলা আমার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কিন্তু স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে বিধায় আলোচনা করতে চাচ্ছি (ইতিমধ্যে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে হজরতের দু'নয়ন)।

আল্লামা বানুরি সাহেব একবার ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকের অনুরোধে ইসলামি নজরিয়াতি কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করতে। আফজাল চিমা সেই কমিশনের সরকারি পর্যবেক্ষক ছিলেন। উনি কয়েকবার এই মিটিংয়ে অংশ নেন। শেষবার যখন যান, তখন উনার বুকে ব্যথা ওঠে। এই সফর থেকে ফিরেই হজরত বানুরি ইনতেকাল করেন।

আল্লামা বানুরি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন সভাপতি হিসেবে। শুক্র, শনি ও রবিবারের মজলিসে অংশ নিয়ে ইসলামাবাদে নিজ বাসভবনে ফিরে আসেন। এখানে আসার পরই তার শারীরিক অসুস্থতা শুরু হয়। সারারাত তার শরীর ছটফট করছিল। ফজরের নামাজের পূর্বে গোসল করেন। এরপরও শরীর খারাপ করলে বসে নামাজ আদায় করে নেন।

ফজরের পরেও শরীর তাঁকে সঙ্গ না দেওয়ায় ছেলে মুহাম্মদকে ডেকে আনেন। মুহাম্মদ বানুরি পিতার সঙ্গিন অবস্থা লক্ষ করে কারি সাঈদুর রহমান সাহেবকে—যিনি তখন ইসলামাবাদ প্রেসিডেন্ট মসজিদের ইমাম-খতিব ছিলেন—খবর দেন। কারি সাহেব আল্লামা বানুরিকে দেখামাত্র বুঝে ফেলেন অবস্থা ভালো নয়। সাথে সাথে মির আলম প্রমুখ সাথিকে নিয়ে তারা হজরতকে ইসলামাবাদ সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে জানান যে, রাতেই তিনি হার্ট অ্যাটাক করেছেন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর কিছুটা সুস্থবোধ করলে দায়িত্বরত চিকিৎসকরা তাঁকে আশংকামুক্ত ঘোষণা করেন। ডাক্তাররা সাথে থাকা এটেনডেন্টদের চিন্তা করতে নিষেধ করেন; বরং তাদেরকে ভারমুক্ত থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দেন।

কিন্তু মুহাম্মদ বানুরি সাথি-সঙ্গী নিয়ে অন্য কোথাও না গিয়ে আশপাশেই অবস্থান করতে থাকেন। তাদের ধারণা ছিল, রাতে আবার শরীর খারাপ করতে পারে। তাদের ধারণাই বাস্তবে রূপলাভ করে। রাত ১টার দিকে আবারও হজরতের শরীর খারাপ হয়ে যায়। সাথে সাথে দায়িত্বশীল ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়। পরীক্ষা করে জানা যায় হজরত আবারও হার্ট অ্যাটাক করেছেন! তাড়াতাড়ি তাকে আইসিইউতে

স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু এই দফাতেও তিনি কিছুক্ষণ পর সুস্থবোধ করতে শুরু করেন। তবে এবার একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ডাক্তারদের কাছে ডেকে জানান, আমাকে নিয়ে আর বেশি ভাবতে হবে না আপনাদের। আমার 'মেহমান' চলে এসেছেন! সেই রাতটা এভাবেই কেটে যায়। মুহাম্মদ বানুরি বলতেন, হজরত নাকি সারারাত জিকির করে কাটিয়েছিলেন। ভোর ঠিক পাঁচটার দিকে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কালিমা পাঠ করতে শুরু করেন। এসময় তার চেহারা কেবলামুখী ছিল। ঠিক তখনই হজরতের 'মেহমানবৃন্দ' তাঁকে নিয়ে আখেরাতের সফরে রওনা হয়! ইন্না-লিল্লাহি মা-আখাজা ওয়া লিল্লাহি মা-আ'তা ওয়া-কুল্লু শাইয়িন ইনদাহু বি মিকদার!

হজরতের পুত্ররা সকালে এসে পিতার খোঁজ করতে করতে জেনারেল কেবিনে এসে দেখেন, পিতা সেখানে শুয়ে আছেন! অথচ তার থাকার কথা আইসিইউতে![৮৮] ডাক্তারদের অবহিত করা হলে তারা জানায়, হজরত তো ইনতেকাল করেছেন। তাঁকে বিশেষ হিমাগারে রাখা হয়েছে। এই সংবাদ মুহূর্তে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে।

হজরতের মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে জামিয়া ইসলামিয়া পিন্ডিতে নিয়ে আসা হয়। গোসল দেওয়ার পর কাফন পরানো হয়। এরপর সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার ও রাজনীতিকরা কারি সাঈদুর রহমানের ইমামতিতে সংক্ষিপ্ত জানাজা আদায় করে। এসময় আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জানাজা শেষে মৃতদেহকে বিশেষ সামরিক বিমানে করাচি রওনা করানো হয়। করাচি বিমানবন্দর থেকে নিউটাউনের দূরত্ব ছিল মাত্র আধাঘণ্টার; অথচ মৃতদেহকে নিউটাউন ক্যাম্পাসে নিয়ে আসতে ছয় ঘণ্টা লেগে যায়! রাত সাড়ে দশটায় লক্ষাধিক ভক্ত-অনুরক্তের কান্নারত জামাত তাঁকে শেষবিদায় জানাতে একত্র হয়। মুহাম্মদ বানুরির অনুমতিক্রমে ডাক্তার আবদুল হাই—যিনি হজরত থানবির খলিফায়ে মুজাজ ছিলেন—আল্লামা বানুরির জানাজার নামাজের ইমামত করেন। আসকানাহুল্লাহু ফি আ'লাল জিনান।

---

[৮৮]. এটি হজরতের কারামত ছিল, যা ছেলেদের প্রাথমিকভাবে ভারমুক্ত রাখার জন্য প্রকাশ পেয়েছিল।

শাহাদাতপানে আলিমগণ

মুফতি নিজামুদ্দীন শামজাইর[৮৯] শাহাদাত

উনাকে শহিদ করা হয় খুবই ঠান্ডা মাথায়। আমি তখন সেখানে ছিলাম। মুজাহিদদের উনি জানপ্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। তাদের পাশে থেকে নিজের সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছিলেন।

মাওলানা মাসউদ আজহার[৯০] যখন হিন্দুস্থানকে নাকানিচুবানি খাইয়ে ফিরে আসেন, তখন তিনি ব্যস্ততম উসতাদ হয়েও জিহাদি কার্যক্রমে শাগরেদকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতেন। মাওলানা মাসউদ আমার কাছে শরহে তাহজিব, উসুলুশ শাশি পড়েছিলেন। একটু স্বাস্থ্যবান ছিলেন। ক্লাসে সবসময় প্রথম হতেন। সাহসী ছিলেন খুব। মুফতি সাহেবের প্রথম সারির ভক্ত ছিলেন। সম্ভবত মুফতি সাহেবের সাথে বাইয়াতের সম্পর্ক ছিল মাওলানা মাসউদের। আফগান জিহাদ তাকে সুলুকের পথ

---

[৮৯]. মুফতি নিজামুদ্দীন শামজাই (১২ জুলাই ১৯৫২ - ৩০ মে ২০০৪)
মুফতি সাহেব সোয়াত অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। প্রাথমিক পড়াশোনা সেখানেই সমাপ্ত করেন। এরপর করাচিতে জামিয়া ফারুকিয়াতে তাকমীল সমাপন করেন। আল্লামা সলীমুল্লাহ খানের খুব নিকটতম শাগরেদ ছিলেন। পরবর্তীতে সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইমাম বুখারির উস্তাদদের উপর গবেষণা করে পিএইচডি অর্জন করেন।
কর্মজীবনে জামিয়া ফারুকিয়াতে অধ্যাপনা করতেন। এক সময় বানুরি টাউনেও খণ্ডকালীন অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। দৈনিক জং পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতেন।
মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবির সাথে খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। দুজনেই ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ছিলেন। তালিবান শাসকদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তাদের শলা পরামর্শ দিতেন। সমকালীন জালিম পরাশক্তির বিরুদ্ধে সমানভাবে বলতেন ও লিখতেন। এই 'অপরাধেই' তাদের জীবন দিতে হয়েছিল।
মুফতি সাহেবকে আন্তর্জাতিকভাবে ষড়যন্ত্র করে নির্মমভাবে শহিদ করে দেওয়া হয়। মাওলানা লুধিয়ানবির পাশেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

[৯০]. মাওলানা মাসউদ আযহার একজন পাকিস্তানি আলিমে দীন। ইসলামের ভুলে যাওয়া ফরজ বিধানকে পুনরুজ্জীবিত করতে তিনি অসাধারণ সব কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। ভারতীয় দখলদারদের হাত থেকে কাশ্মির স্বাধীন করতে তিনি অবিরাম কাজ করে গেছেন। বন্দিত্ব বরণ করেছেন দীর্ঘ ছয় বছরের। বিমান ছিনতাই করে অবশেষে নাটকীয়ভাবে তাকে উদ্ধার করা হয়। জিহাদ বিষয়ক আয়াতসমৃদ্ধ বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ 'ফাতহুল জাওয়াদ' লিখে অমর হয়েছেন তিনি। ভাওয়ালপুরে জন্ম নেওয়া এই আলিমে দীন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরিটাউনে। মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেবের খুব কাছের শাগরেদ ছিলেন তিনি। মুফতি সাহেব দেশে ফেরার সময় সরকারি নজরদারিতে ছিলেন। এখনো রয়েছেন বলে শোনা যায়। হাফিজাহুল্লাহ!

থেকে কার্যত জিহাদের পথে নিয়ে আসে। তালিবানরা যখন ইমারাহ গঠন করেন, তখন ওলামায়ে কেরাম দলে দলে গিয়ে সেখানে ঈমানি জাগরণ স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন। আমাদের এখানকার মুফতি সাহেবরাও সবাই আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মদ উমর রহিমাহুল্লাহর সাথে দেখা করে এসেছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তখন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। না-হয় হয়তো আমারও যাওয়ার সৌভাগ্য হতো।

মুফতি নিজাম সাহেব নিউটাউনের পাশেই মাত্র একশ ফুট দূরে একটি ভবনে থাকতেন। গাড়িতে করে যাতায়াত করতেন। জিহাদি কার্যক্রমে অনেক সময় দিতেন। প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন বিধায় মুজাহিদীন তাকে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী গ্রহণ করতে বলেছিল। গাড়িতে করে মাদরাসায় আসা পর্যন্তও এজন্য তার সাথে সশস্ত্র দেহরক্ষী থাকত। একদিন এভাবেই আসছিলেন মাদরাসায়। নিউটাউনের মোড়ে আসতেই একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাঁর গাড়ি লক্ষ করে ব্রাশফায়ার চালায়। এতে তিনি দেহরক্ষীসহ শহিদ হয়ে যান। রহিমাহুমুল্লাহ।

বিজ্ঞ আলিমদের জিহাদে সম্পৃক্ত হওয়াকে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো খুব একটা ভালো চোখে দেখছিল না। যেহেতু তখন আমেরিকার সাথে নতুন যুদ্ধে নামতে যাচ্ছিল তালিবান, তাই মনে করা হয় এই হত্যাকাণ্ড আমেরিকার ইশারাতেই হয়েছিল। শুধু মুফতি নিজাম একাই নন, ধারাবাহিকভাবে একের পর এক বিজ্ঞ আলিমগণ পাকিস্তানে শাহাদাত বরণ করেই যাচ্ছিলেন। এর পূর্বেও শিয়া জালিমরা সিপাহে সাহাবার নেতৃবৃন্দকে শহিদ করেছিল ধারাবাহিক নিষ্ঠুরতার সাথে। আর নতুন যুগের ক্রুসেডযুদ্ধ শুরু হবার পর এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। বিশেষত নিউটাউনের আলিমগণ জিহাদি কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা বেশি করায় এখানকার আলিমদের উপর বাতিলের ছিল আলাদা শ্যেনদৃষ্টি। শক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ ফতোয়াদানে কোনোরকম শৈথিল্য না দেখিয়ে অনমনীয় মনোভাব ধরে রাখা নিউটাউনের দারুল ইফতার অনন্য বৈশিষ্ট্য। সুবিধাবাদী ইসলামের ধার ধারতেন না তারা। দেশীয় অনেক ইস্যুতেই নিউটাউন তার এই বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে। ফলে দেশে ও বিদেশে সর্বত্র নিউটাউনের দারুল ইফতার একটা বিশেষ চাহিদা ও আগ্রহ তৈরি হয়েছে। একইসাথে দারুল ইফতা তৈরি করেছে তার অসংখ্য শত্রু ও প্রাণের দুশমন। তখন এবং এখনো, পাকিস্তানে বিশেষত করাচিতে নিউটাউনের মুয়াফিক ফতোয়া হলে তা গৃহীত হতো, অন্যথা জনগণ তা গ্রহণে দ্বিধা করত। মুজাহিদীনও জটিল জটিল ফতোয়ার জন্য নিউটাউনে আসতেন। এজন্য বাতিল তাগুতি শক্তি মুফতি নিজামের পর আরো অনেককেই রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করতে থাকে।

ড. হাবিবুল্লাহ মুখতার দেহলবি

উনি আল্লামা ইউসুফ বানুরির জামাতা ছিলেন। মদিনা মুনাওয়ারায় হাদিস বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করেছেন। পরে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। খুব উঁচুমানের আলিম ছিলেন। শ্বশুরের সময়ে দারুত তাসনিফে থাকতেন। তিরমিজির বিখ্যাত শরাহ লুব্বুল লুবাব উনিই সংকলন করেছেন। আমার এক বছর পর উনি নিউটাউনে শিক্ষকতা শুরু করেন। হজরত আল্লামা বানুরির ইনতেকালের পর মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব মুহতামিম হন। উনার পর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. হাবিবুল্লাহ সাহেব। সামাজিকভাবে আলিমরা পাকিস্তানে খুব প্রভাবশালী হওয়ায় গোত্রীয় ও শালিসি করতে যেতে হয় তাদের। এটা অবশ্যই একটা ভালো এবং ইতিবাচক দিক। হাবিবুল্লাহ সাহেবকে এরকম অনেক সমস্যার সমাধান করে দিতে হয়েছিল। একবার এক এলাকায় উনি গেলেন একটা মসজিদের জায়গা নিয়ে চলমান সমস্যা সমাধান করতে। মসজিদটি একটি মাদরাসার সাথে সংযুক্ত ছিল। আর জায়গাটি ছিল একটি পরিবারের ওয়াকফ সম্পত্তি। কিন্তু ভূমিদস্যুরা জায়গাটি দখলে নিতে চাচ্ছিল। বাধ্য হয়ে মালিকপক্ষ আলিমদের শরণ গ্রহণ করে। ড. হাবিবুল্লাহ সাহেব কয়েকবার সেখানে উপস্থিত হন। সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ সময় দেন। আলোচনা হয়। আল্লাহর ঘর নিয়ে খায়েশ পূরণ না করতে অনুরোধ করেন তিনি। কিন্তু দুনিয়াবি ফায়দায় মগ্ন মন কি আর দীনি উপদেশ শোনে! তারাও জোরাজুরি, এমনকি হুমকি-ধমকিও দিতে থাকে যেন হাবিবুল্লাহ সাহেব তাদের পক্ষে রায় দেন। পরে তিনি বিরক্ত হয়ে তাঁর পক্ষ থেকে ন্যায্য ফয়সালা শুনিয়ে দিয়ে চলে আসেন। তার সাথে আবদুল কাইয়ুম সিন্ধি সাহেবও ছিলেন তখন। আসার পথে সন্ত্রাসীরা গুরুবন্দর মোড়ে তাদের গাড়িকে অ্যাম্বুশ করে। ক্ষমতার নেশায় পাগল হয়ে তারা তাঁর গাড়ি ঘেরাও করে গাড়ির উপর দাহ্য পদার্থ ঢেলে দেয়। এরপর এলোপাথারি গুলিবর্ষণ করে। গাড়ি উলটে গিয়ে আছড়ে পড়ে গুরুবন্দর মোড়ে। আবদুল কাইয়ুম সাহেব কোনোমতো বের হয়ে মাদরাসায় দৌড়ে আসেন। কাঁদতে কাঁদতে জানান পরিস্থিতি। ছাত্ররা দৌড়ে যায় ঘটনাস্থলে। কিন্তু তাঁকে আর বাঁচানো যায়নি। আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাত দান করুন। আমিন।

শহিদ মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবি রহ.

এই হজরতকে যখন শহিদ করে দেওয়া হয়, তখন সম্ভবত আমি ওখানে ছিলাম। উনিও গাড়িতে করে আসছিলেন। আমেরিকা বিরোধী আলোচনার কারণে তখন উনি

বাতিলের আক্রোশে পরিণত হয়েছিলেন। উনার গাড়িও অ্যাম্বুশ করে ব্রাশ ফায়ার করা হয়। উনিও শহিদ হয়ে যান।

এভাবেই একে একে পরবর্তীতে মুফতি আবদুল মজিদ, মাওলানা মুহাম্মদ সালেহ ওকাড়বি, যাকে আমিই সুপারিশ করে দারুল ইফতায় নিয়োগ দিয়েছিলাম, সেও শহিদ হয়ে যায়। মুফতি আবদুর রহমান সাহেবও শহিদ হন এদের হাতে। মুহাম্মদ বানুরি—আল্লামা বানুরির সন্তান ছিলেন—শহিদ হন দুর্বৃত্তের হাতে। নিউটাউনে শাহাদাতের সিলসিলা এখনো চালু আছে। আলিমদের সাথে মুজাহিদরা মাঝেমধ্যে মজা করে বলত যে, আমরা শাহাদাতের জন্য এত কষ্ট করে হিজরত করি। বছরের পর বছর শাহাদাতের জন্য অপেক্ষা করি। আর আপনাদের ইলমের কী শান! ইলমের সঠিক ব্যবহারের কারণে আল্লাহ তায়ালা শত্রু পাঠিয়ে আপনাদের নিজ নিজ বাসায় এসে শাহাদাত হাদিয়া দিয়ে যায়! কেয়ামত দিবসে ইনশাআল্লাহ নিউটাউনের এই দারুল ইফতা ও এখানকার মুফতিগণ ইলম ও জিহাদের সমন্বিত কাফেলায় থাকবেন, ইনশাআল্লাহ।

অনাকাঙ্ক্ষিত অধ্যায়...

অনেকেই একটি বিষয়ে দ্বিধামুক্ত হতে চায়। যখন নিউটাউনে শিক্ষকতা শুরু করি, সে সময় তো আমাদের এখানে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছিল। দুই দেশের মাঝে সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতির কিছু প্রভাব দীনি মহলেও পড়েছিল। দারুল উলুম করাচিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কিছু বাঙালি ছাত্রভাইকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল। অনেক সময় এই ঘটনাটি ভেবে কিছুটা অবাক হয় অনেকেই। আজ পর্যন্ত এই ঘটনার মূল উৎস, কার্যকারণ ও ফল অনেকে জানতে পারেনি। বিষয়টি একটু খুলে বলি। ভুল ধারণার অপনোদন হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে শেখ মুজিব সাহেব যখন নির্বাচনে জয়লাভ করলেন, তখন পশ্চিমের হিংসুক নেতৃবৃন্দ তাকে ক্ষমতা দিতে রাজি ছিল না। আমি তো সাধারণ পাকিস্তানিদের দেখেছি, তারা শেখ সাহেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। কিন্তু পাক মিডিয়া কেন যেন তাকে ইন্ডিয়ান এজেন্ট হিসেবে তুলে ধরার কাজটি দীর্ঘদিন ধরে করে যাচ্ছিল। পশ্চিমে যেসব বাঙালি থাকতেন, তাদেরকে স্থানীয় সবাই আপন ভাইয়ের মতো করেই দেখত। কোনো বিভেদমূলক আচরণ ছিল না জনগণের মাঝে। কিন্তু পাক-ভারতের কূটনীতির দৈন্যই বলতে হবে যে, তারা সবসময় সব ইস্যুকেই দ্বৈরথ হিসেবে ভেবে থাকে। যখন আমি তাখাসসুস শেষ করি, তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মিডিয়ার

দীর্ঘদিনব্যাপী মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় জনগণের মাঝেও কিছুটা প্রভাব পড়তে শুরু করে। অনেকে সত্যিই ভাবতে বাধ্য হন যে বাঙালিরা মুনাফিক, বেঈমান। তারা ভারতের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। এই সময়ে পাকিস্তানে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে বাঙালি ছাত্রদের সাথে কঠোরতা দেখানো হয়েছিল। এর মধ্যে দারুল উলুম করাচি অন্যতম। তখনো হজরত মুফতি শফি সাহেব বেঁচে ছিলেন। আমার সরাসরি জানা তথ্য থেকে আমি আপনাদের বলব। অন্য কোনো জায়গা থেকে আমি বর্ণনা উল্লেখ করব না। দারুল উলুমে কিছু ছাত্রভাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। তারা অবসরে হয়তো দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অবহেলা, জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় নীতি, জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায় আসতে না দেওয়ার অসহিষ্ণু প্রবণতা এসব নিয়ে তারা পড়াশোনার ফাঁকে হয়তো গল্প করতেন। কোনোভাবে এই খবর মাদরাসা কমিটির কানে চলে যায়। আগেই বলেছি, ততদিনে পাকিস্তানি আমজনতা ও শিক্ষিতসমাজ সবাই বাঙালি জনতাকে ভুল বুঝে বসেছিলেন। অন্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ছিলেন সবাই। মাদরাসা কমিটিও এই অনুভূতির বাইরে ছিলেন না। তারাও ছাত্রভাইদের এই বিষয়গুলো 'ইসলামি শরিয়তের' দৃষ্টিতে গাদ্দারি ভেবে বসেন। দফায় দফায় মিটিং হয়ে সবশেষে তাদের বিদায় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, যা খুবই দুঃখজনক ছিল। বিশেষত ইসলামি ভাবধারার প্রতিষ্ঠান থেকে হুট করে এমন সিদ্ধান্ত কখনোই কাম্য ছিল না। সম্ভবত সকল ছাত্রভাইকেই তারা রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তাভাবনায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ এনে বিদায় করে দেন। সময়টি কত কঠিন ছিল, একবার চিন্তা করুন। দেশে চলছে যুদ্ধ। এদিকে বছরের মাঝামাঝিতে প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায়! আবার পুরো পাকিস্তানি জনগণ ক্ষোভে ফুঁসছেন। বাঙালি মাত্র নিপীড়নের শিকার হবার আশংকা ছিল। এতসব পরিস্থিতির মাঝে মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে গেলে মানুষ কতটা অসহায় হয়ে পড়ে, ভাবতে পারছেন!

আমি তখন নিউটাউনে নতুন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছি। এই দুঃখজনক খবরটি হঠাৎই একদিন কানে এল। এরপর শুনলাম আরো একটি বিমর্ষ হবার মতো সংবাদ। বানুরি হজরতকেও নাকি মুফতি শফি সাহেবের পক্ষ থেকে একজন সিনিয়র শিক্ষক ফোনকল দিয়েছিলেন। তিনি বানুরি সাহেবকেও নিউটাউনের সকল বাঙালি ছাত্রভাইকে বিদায় করে দিতে অনুরোধ করেছেন! কী সাংঘাতিক ভয়ানক সংবাদ! আমি তো শুনে পায়ের নিচের মাটির কাঁপন অনুভব করছিলাম। কত ত্যাগ, কত কষ্ট

সয়ে এখানে আসে আমাদের ছাত্র ভাইয়েরা! হুট করে বিদায় হয়ে গেলে তারা কোথায় যাবে? নিজেকে নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম কিছুটা! সবাই অপেক্ষায় ছিল সেদিন। বানুরি সাহেব কী সিদ্ধান্ত দেন তার উপর নির্ভর করছে তাদের সবার ভবিষ্যৎ। অবশেষে বানুরি সাহেব তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী সাহসী সিদ্ধান্ত জানান। তিনি বলেন, আমার এখানে আপনারা যারা দূর থেকে এসেছেন, এই বিপদের দিনে আমি কাউকে হতাশ করব না। আমি জানি আপনারা মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন। মাতৃভাষায় কথা বলতে পছন্দ করেন। এটা তো একটা ফিতরাত। এই চাওয়াগুলো নিয়ে আমি আপনাদের কখনোই দোষারোপ করতে পারি না। আর ইসলামি আইনে বিদ্রোহের কথা যদি বলতে হয়, এই পাকিস্তান ইসলামের জন্য এবং ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই; কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি ইসলামি আইনও সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। করার চেষ্টাও করেনি একের পর এক ক্ষমতাবদল করে যাওয়া সরকারগুলো। ফলে আক্ষরিক ও প্রায়োগিক অর্থে পাকিস্তান একটি ইসলামি রাষ্ট্র বলার সময় মনে হয় এখনো আসেনি। তাই ইসলামি আইনের পরিভাষায় পাকিস্তানি শাসক ও রাষ্ট্রের অনিয়ম, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আলোচনাকে আমি ইসলামি বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করব না। কখনোই না। হ্যাঁ, এ ধরনের আলোচনা ও চিন্তাভাবনা দেশের স্বার্থবিরোধী বলা যেতে পারে। সেজন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের অধীনস্থদের প্রত্যাহার বা শাস্তিমূলক কিছু করলে করতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্বপাকিস্তান-কেন্দ্রিক বিষয়ে অন্তত তালিবুল ইলম ভাইদের আবেগকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখাই শ্রেয়। আমি আপনাদের সাথে এই আচরণই করতে চাই। আপনারা আমার ভাই, আমার সন্তান! নবীজির নিয়ে আসা ইলম অন্বেষণে মুসাফির মুহাজির আহলে সুফফা! আমি কখনোই আপনাদের সাথে অপমানজনক আচরণ করব না। তবে এতটুকু বলব, ইনসাফের সাথে চলমান পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি রাখবেন। মুলক ও মিল্লাতের স্বার্থের দিকে বেশি নজর রাখবেন। এটাই দারুল উলুমের অনুরোধের জবাবে আপনাদের প্রতি আমার শেষকথা।

সুবহানাল্লাহ! হজরতের কথা আজও আমার কানে বাজে। কতটা ইনসাফপূর্ণ ভাষায় সতর্কতামূলক আলোচনা করতে হয় সেদিন শিখেছিলাম।

দারুল উলুমেও হজরত একই ভাষায় তার জবাব প্রেরণ করেন। উনি জানিয়ে দেন, আমি কোনোভাবেই আমার কাছে ইলম শিখতে আসা অসহায় মুহাজির ভাইদের প্রতি জুলুম করতে পারব না। যদি তারা অপরাধী হয়েও থাকেন, এই

সংকটময় সময়ে আমি তাদের মাথাগোঁজার ঠাঁইটুকু কেড়ে নিতে পারি না। আপনাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের জন্য মোবারক হোক। আমার ছাত্রভাইদের জন্য দোয়া করবেন।

ওদিকে দারুল উলুম থেকে মোটামুটি সবভাইকে বিদায় দিলেও এক ভাইকে পরবর্তীতে বিশেষ সুপারিশে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এই ভাইয়ের নাম ছিল আবদুর রহিম। উনি ছিলেন পটিয়ার মুহতামিম আবদুল হালিম বুখারির ভাই। আবদুর রহিম ভাই আমার কাছে উসমানি মসজিদে বেড়াতে আসতেন। তার নিকট থেকে আমি দারুল উলুমের ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনেছিলাম। চট্টগ্রামের মাওলানা হেফাজতুর রহমান নামে এক বর্ষীয়ান রাজনীতিক ছিলেন। উনি নেজামে ইসলাম পার্টি করতেন। রাজঘাটায় তিনি নির্বাচন করেছিলেন আওয়ামী লীগের বিপক্ষে। এতে স্থানীয় রাজনীতির রোষানলে পড়েন তিনি। লাগাতার হুমকির মুখে জীবনের মায়ায় উনি পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে আসেন। এখানেও উনি বড় রাজনীতিক হয়েছিলেন। করাচির বার্মি কলোনিতে থাকতেন তিনি। এই ভদ্রলোক আবদুল হালিম সাহেবের আত্মীয় ছিলেন। তাঁরই সুপারিশে মুফতি শফি সাহেব আবদুর রহিমকে সেই দফায় ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

অর্থাৎ এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, মুফতি সাহেব তৎকালীন পাকিস্তানের বিরোধিতাকে শরয়ি বিদ্রোহ মনে করতেন। যার কারণে দারুল উলুম থেকে ছাত্রভাইদের বিদায় করা হয়েছিল। আর আল্লামা বানুরি এই বিরোধিতাকে রাজনৈতিক মনে করতেন। ফলে দুজনের সিদ্ধান্ত ভিন্ন হয়েছিল। এখানে বলে রাখি, পাকিস্তানের অন্যান্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানও কোনো ছাত্রভাইকে বিদায় করেনি। সবাই আল্লামা বানুরির অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো, এই ঘটনায় আমারও একটি সাক্ষাতকার একটি পত্রিকা গ্রহণ করেছিল। সেখানে আমি বানুরির শুকরিয়া আদায় করেছিলাম। পত্রিকার নামধাম এখন আর মনে নেই।

দারুল ইফতা : গোড়ার কথা

দারুল ইফতার বিশেষত্ব সম্পর্কে একটু বলি। কীভাবে নিউটাউনের দারুল ইফতা এত বিখ্যাত হয়ে উঠল। বিশ্বজুড়ে কীভাবে কবুল হলো এই বিভাগ।

দেখুন, মকবুলিয়াত তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আমরা শুধু তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমল করি। খ্যাতি আসলেই যে মকবুল হয়েছে এমনটা ভাবারও সুযোগ নেই ভাই। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়।

যাক, যেকথা বলছিলাম, নিউটাউনের দারুল ইফতার একটি বিশেষ অবস্থান জাতির কাছে তৈরি হয়েছিল বেশকিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে।

মূলত তাখাসসুস ফিল ইফতার সিলেবাস এখানে রাখা হয়েছিল দুই বছর মেয়াদি। মুফতি শফি সাহেবের ওখানেও তখন এক বছরের সিলেবাস ছিল। পরবর্তীতে নিউটাউনের আদলে সেখানে সিলেবাস বর্ধিত করা হয়। দুই বছরের তাখাসসুস থাকার ফলে তামরিনের সুযোগ থাকে প্রচুর। ফিকহ-ফতোয়ার জগতের সাথে একটা সখ্য গড়ে ওঠে একজন তালিবে ইলম ভাইয়ের। যেহেতু পাকিস্তানে এত দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স এটিই প্রথম ছিল, তাই এখানকার ফুজালারা দ্রুত দেশের নানান সমস্যা সমাধানে বস্তুনিষ্ঠ ও উপকারী অবদান রাখতে পেরেছিলেন। এজন্য সম্ভবত এখানকার দারুল ইফতা লোকমুখে দ্রুত পরিচিত হয়ে যায়।

এ ছাড়াও কিছু ঘটনার কারণে এমনটি হয়ে থাকতে পারে। আমি দুয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

জনতার জায়গায় কেন নয় মসজিদ

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সময়ে সরকারি মসজিদের জায়গা নিয়ে একটি সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ইস্যুটি ছিল, সরকারি খাস জমিতে তৈরি হওয়া মসজিদে কি নামাজ আদায় সহিহ হবে? অথবা নতুন খাস জমিতে কি জনগণ প্রয়োজনসাপেক্ষে মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে? সরকার-পক্ষের কিছু আলিম এই মাসআলা হাইকোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যায়। সেখানে সিদ্ধান্ত আসে যে, খাস জমিতে নামাজ আদায় সহিহ হবে না। এমনকি যারা এতদিন নামাজ পড়েছে, তাদের নামাজও সহিহ হবে না! অর্থাৎ মসজিদ সংশ্লিষ্ট কোনো ইবাদতই সঠিকভাবে আদায় হয়নি। যেমন ই'তিকাফ, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি। দুঃখের সাথে বলতে হয়, কিছু বাঙালি মুহাজির আলিমও এই কমিশনে ছিলেন, যারা সরকারের পক্ষে এই উদ্ভট মাসআলায় দস্তখত করেছিলেন। তাদের নাম এই মুহূর্তে আর নিতে চাচ্ছি না।

এরপর সারাদেশের সব পত্রিকা-মাধ্যমে যেমন দৈনিক জং, ডন ইত্যাদি থেকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি আলিমরাও ফলাও করে এটি প্রচার করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে ইসতিফতা চেয়ে নিউটাউনের দারুল ইফতায় একটি প্রশ্ন আসে। সেখানে বিস্তারিত আকারে এই বিষয়টি উল্লেখ করে ইনসাফভিত্তিক সমাধান প্রত্যাশা করা হয়।

মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেব এই ইস্যুতে খুবই মর্মাহত হন। উনি এই ফতোয়া নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনার সময় কেঁদে ফেলেন। বলতে থাকেন- লোকদের কী হলো তারা আল্লাহর ঘরকেও নিজেদের বদনিয়ত থেকে রেহাই দিচ্ছে

না! আল-বাইয়্যিনাতে হজরত এই বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর অবস্থান উল্লেখ করেন। মাসআলাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু কঠোর ছিল। কিছু কথা আমার মনে পড়ে। উনি লিখেছিলেন—সারাদেশে মুসলিম জনগণের জন্য মসজিদ তৈরি করে দেওয়া সরকারের উপর ওয়াজিব ছিল। তারা সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপর জনগণ নিজ দায়িত্বে সরকারি কাজ আনজাম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। জনগণের দীনি প্রয়োজনে এবং যা একটি ফরজ প্রয়োজন, তা আদায়ে কোনো অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। তাই এ পর্যন্ত যত মসজিদ তৈরি করা হয়েছে সবকটিতেই নামাজ আদায় সহিহ হবে। সরকারের উচিত দেশের সকল পাড়া-মহল্লায় একটি করে মসজিদ নির্মাণ করে দেওয়া। তা নাহলে জনগণ নিজ দায়িত্বে তাদের ফরজ দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

তুমি কীসের জজ!

হাইকোর্টের বিচার ও রায়সংশ্লিষ্ট জজদেরও মুফতি সাহেব একহাত নিয়ে নেন সেখানে। তাদের ব্যাপারে উনি দুয়েক কথায় শক্তভাবে প্রতিবাদও করেন। সম্ভবত এই কথাও বলেন যে, যেই জজ সাহেব এই মাসআলার জবাব দিয়েছেন, তিনি জজ হবারই যোগ্য নন। দীন সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান শূন্যের কোঠায়। এ ধরনের আরো কিছু শক্ত কথা তিনি বাইয়্যিনাতে লেখেন। আমার ধারণা মুফতি সাহেব জজবার হালতে এভাবে জজদের একটু বকে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তো তাদের সাথে তো তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না।

আল-বাইয়্যিনাত যেহেতু সে-সময় সবচেয়ে পঠিত দীনি মাসিক ছিল, ফলে দেখতে দেখতেই সারাদেশে এই ফতোয়া পৌঁছে যায়। জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের নামাজ সহিহ হবার ফতোয়া পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু বাগড়া বেঁধে যায় সরকারি মহলে। দেশের সর্বোচ্চ স্থান থেকে আসা সিদ্ধান্তের বিপরীতে এত সাহসী বক্তব্যে হইচই পড়ে যায়। উকিল থেকে শুরু করে অ্যাটর্নি জেনারেল পর্যন্ত নড়েচড়ে বসেন। তাদের ধারণা ছিল ধর্মীয় মহল থেকে অনুরোধমূলক আবেদন আসতে পারে, সর্বোচ্চ এতটুকুই; যেখানে বলা হবে, সরকারি জমিতে তৈরি হয়ে যাওয়া মসজিদগুলো স্থায়িত্ব দেওয়া হোক। কিন্তু এমন কিছু না হয়ে সরাসরি সরকারের সর্বোচ্চ আইনি স্থান থেকে আসা সিদ্ধান্তের বিপরীতে ফতোয়া প্রচারিত হলো এবং সর্বোচ্চ শ্রদ্ধেয় জজদেরও একহাত দেখে নেওয়া হলো। এমন ঘটনা আধুনিক ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

এদিকে অন্যান্য দীনি প্রতিষ্ঠানেও এই মাসআলা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়। তবে আল্লাহর রহমতে বেশিরভাগ দীনি প্রতিষ্ঠান গবেষণা শেষে মুফতি সাহেবের সিদ্ধান্তেই একমত হয়। ব্যতিক্রম কিছু মতও এলো। যেমন: দারুল উলুম করাচি। মুফতি শফি সাহেব তখন হায়াতে ছিলেন না। তবে এই বিষয়ে তাঁর লিখিত একটি পুস্তিকা ছিল। আহকামে আরাজি নামে। এখানে তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ মত উল্লেখ করেন। মুফতি সাহেবের মতে খাস জমিতে তৈরি হওয়া মসজিদে নামাজ সহিহ হবে। কিন্তু নতুন করে বিনা অনুমতিতে মসজিদ বানানো যাবে না।

কাঠগড়ায় মুফতি, আদালতে জনতা

এই ঘটনা সারাদেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে শুরু করে। সরকার জনগণের সামনে একধরনের অপদস্থ অবস্থায় চলে যায়। সাধারণ একজন মুফতি সাহেবের এত সুঃসাহস যে, তিনি সরকার ও সর্বোচ্চ আদালতের বিরোধিতা করতে পারেন! এ তো মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে যা হবার তাই হলো। মোকাদ্দমা দায়ের করা হলো। ফতোয়া লেখক হিসেবে মুফতি সাহেব, বাইয়্যিনাতের সম্পাদক হিসেবে ইদরিস সাহেব, পত্রিকার প্রেস মালিকসহ মোট পাঁচজনের নামে মামলা হলো। কিছুদিন পর তাদের এই কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা চেয়ে জারি হলো সমন। সমন অনুযায়ী অভিযুক্তদের যথাযথ ব্যাখ্যা তুলে ধরতে হবে। যদি জজ সাহেবরা সন্তুষ্ট না হন, তাহলে শাস্তিস্বরূপ জরিমানাসহ ছয় মাসের কারাবাসও হতে পারে! এতে করে ইস্যুটি আরো ফুলে-ফেপে বিরাট আকার ধারণ করে বসল।

দারুল উলুমের মুফতিগণ নিরপেক্ষ ভূমিকায় ছিলেন। মুফতি তাকি উসমানি তখন শরিয়াহ আদালতে দায়িত্ব পালন করতেন। একদিন তিনি নিউটাউনে এলেন। মুফতি সাহেব তাকি সাহেবের উসতাদ ছিলেন। মুফতি তাকি সাহেব মুফতি সাহেবের কাছে বিষয়টির নাজুকতা তুলে ধরেন। সরকারের সাথে অযথা দ্বিমতে যাওয়ার ব্যাপারে উনি উসতাদের কাছে কিছুটা ধর্নাই ধরে বসেন; যেখানে ফিকহিভাবে সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষেও মত আছে, সেখানে যেচে পড়ে পেরেশানি টেনে আনার কী প্রয়োজন! মুফতি সাহেব তাকে বুঝালেন যে, 'দেখুন, এই দেশ এখনো ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে পারেনি। শুধু ঘোষণা দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি হয় না। অন্তত আইনকানুনে এর সামান্য হলেও প্রয়োগ থাকতে হয়। আমার মতে, এই দেশ এখনো শরয়িভাবে ইসলামি হতে পারেনি। যদি ইসলামি হতো তাহলে খাস জমিতে বিনা অনুমতিতে মসজিদ তৈরি জায়েজ হতো। কিন্তু বাস্তবতা হলো,

এটি একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এখানে মুসলিমরা তাদের প্রয়োজনে সরকারি জমিতে মসজিদ তৈরি করতে পারবে। জনগণের প্রয়োজনের খেয়াল রাখা সরকারের দায়িত্ব ছিল। তারা সেটি করতে না পারলে এটি তাদের ব্যর্থতা। এটিই আমার শেষমত। আমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন না। আপনার ইলম তো এখনো কাঁচা। মনে রাখবেন, দীনি গাইরত আর ইলমি গাইরত একত্র না হলে মুফতি হওয়া যায় না! আপনার এখনো অনেক সময় বাকি আছে। সরকার যা পারে করুক। আমি মুহাজির মানুষ। জানের পরোয়া করি না। আর আপনি মাফ চাওয়ার কথা বলছেন! এটা কীভাবে সম্ভব? ওয়ালি হাসান কখনো হক বিষয়ে মাফ চাইবে না। আপনি আপনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করুন।' মুফতি সাহেবের এমন শক্ত জবাবে কিছুটা হতাশ আর কিছুটা চিন্তিত হয়ে তাকি সাহেব সেদিন বিদায় নিয়ে চলে যান।

এদিকে মুফতি সাহেব একজন উকিল ঠিক করলেন। তার নাম ছিল ব্যারিস্টার ইকবাল। তিনি এসে করাচি আদালতে মোকাদ্দমা কীভাবে পরিচালিত হবে তাঁর ব্যাখ্যা দেন। এই বেচারাও ধর্মীয় ইস্যু নিয়ে এর আগে কখনো মোকাদ্দমার কাজ করেননি। ফলে তিনিও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। মুফতি সাহেব হুজুরকে একদিন বলেই ফেললেন, মুফতি সাহেব, কেন নিজের উপর জুলুম করছেন? ছেড়ে দিন না বিষয়টা তাদের হাতে! মুফতি সাহেব তাঁর কথা শুনে শুধু হাসতেন। আর বলতেন, উকিল সাহেব, আপনি তো হাদিসের দরসে কখনো বসেননি। কালামে পাক কখনো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েননি। আপনি কী বুঝবেন ঈমান মানুষকে কতটা শক্তিশালী করতে পারে। আপনি শুধু চুপচাপ দেখে যাবেন। মোকাদ্দমা ইনশাআল্লাহ আমিই লড়ব। আইনি কোনো বিষয় এলে আপনি বলবেন। আর আপনার ঘাবড়াবার কিছু নেই।

নির্দিষ্ট দিনে করাচি আদালতে যাই আমরা। মুফতি সাহেব মৌখিকভাবেই তাঁর ব্যাখ্যা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। উনি ভেবেছিলেন, দীনি বিষয় ভেবে জজ সাহেবরা হাল ছেড়ে দেবে। তাই লিখিত আকারে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা তিনি তৈরি করেননি। আমাকে ফতোয়াটি একটু গুছিয়ে দিতে বলেছিলেন। আমি ত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যে ফতোয়াটি গুছিয়ে দিই। এদিকে করাচি আদালতপ্রাঙ্গণ জনসমুদ্রে রূপ নিয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখি প্রাঙ্গণ দিয়ে হেঁটে আদালতকক্ষে যাওয়ার রাস্তাই নেই। এত মানুষ সেখানে! এর মাঝ দিয়েই মুফতি সাহেবকে নিয়ে এগিয়ে গেলাম আদালতকক্ষের দিকে। ভেতরেও বড় বড় আলিম এবং বিজ্ঞ উকিলরা সবাই বসে ছিলেন। আমরা গিয়ে নির্ধারিত কিছু সিটে বসে গেলাম।

অনমনীয় মুফতি : প্রেরণায় দেওবন্দ

আদালতকক্ষে যথাসময়ে জজ সাহেব প্রবেশ করলেন। চিফ জাস্টিস আফতাব আহমেদ এসেছিলেন তখন করাচির আদালতে। মোকাদ্দমা মূলত ইসলামাবাদে হয়েছিল; কিন্তু মুফতি সাহেবের অসুস্থতার কথা খেয়াল রেখে জজ সাহেবরাই করাচি এসে পড়েন। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানিয়ে বসে গেলাম। এরপর জজ সাহেব কথা শুরু করলেন। মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব আছেন?

মুফতি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার উকিল কোথায়?

মুফতি সাহেব তাঁর উকিলের দিকে ইশারা করে বললেন, উনি আমার উকিল। তবে আমি নিজেই আমার মোকাদ্দমা পরিচালনা করব। আপনি দয়া করে আমাকে সুযোগ দেবেন।

তখন জজ সাহেব তাঁর কাছে সরকারবিরোধী ফতোয়া ও জজ সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করার জন্য ব্যাখ্যা চাইলেন। মুফতি সাহেব নাহমাদুহু বলে শুরু করার পর তামিম দারির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিখ্যাত হাদিস আদ-দীনু আন-নাসিহাহ নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। এরপর আলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে তুলে ধরলেন সামান্য কথা। তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগের জবাবে বললেন, আমরা আলিমগণ আল্লাহর উপর ভরসা করে হক কথা বলার চেষ্টা করি। আমাদের কথা কখনো চোরের বিপক্ষে যায়। আবার কখনো সরকারের বিপক্ষেও। আমরা এসব খেয়াল করি না।

মুফতি সাহেবের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল উপস্থিত সবাই। সাদাসিধা পরনের এই মৌলবি সাহেব কী অবলীলায় ও ভয়ডরহীনভাবে প্রধানবিচারপতির সামনে তাঁরই বিপক্ষে নিজের পক্ষের ব্যাখ্যা তুলে ধরছেন! মুফতি সাহেব এভাবে বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ করেই জজ সাহেব তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দেন। আমরা আপনার ওয়াজ শুনতে আসিনি মৌলবি সাহেব! আমার কথার সরাসরি জবাব দিন। মুফতি সাহেবও জজবায় এসে গেলেন।

উনিও জোশের সাথে গম্ভীর গলায় জোর আওয়াজে বলে বসলেন, আপনি আমার থেকে কী চান? আপনার ইচ্ছামতো জবাব চান? মুফতি ওয়ালি হাসান তাঁর নিজের মতই তুলে ধরবে। আমার থেকে সঠিক জবাব শুনতে চান? তাহলে আপনাকে চুপ থাকতে হবে। আমাকে বিনাশর্তে মাফ চাইতে বলছেন? মুফতি ওয়ালি হাসান কখনো অন্যায় বিষয়ে মাফ চাইবে না। আমরা মুহাজির মানুষ। দেওবন্দি

মৌলবিদের থেকে পড়ে এসেছি। আমরা কখনো জোরপূর্বক মাথা নোয়াই না। অতএব মাফ চাইব এমন আশায় বসে থাকলে তা ভুলে যান। হক বিষয়ে কখনো মুফতি ওয়ালি হাসান মাফ চাইবে না। আমাকে জেলে পাঠাতে চান? আমি ব্রিটিশের জেল-জুলুম সয়ে আসা উসতাদের শাগরেদ। আমাকে জেল-জুলুমের ভয় দেখাবেন না। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। দীনি আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে সে সময় প্রভাবিত করেছিল এমন দু লাইন লিখতে। আমি অবাক হচ্ছিলাম দীনি বিষয়ে শূন্যের কোঠায় জ্ঞান ধারণ করে একজন মানুষ কীভাবে প্রধানবিচারপতি হতে পারে!

মুফতিয়ে আজম, জিন্দাবাদ!

এমন ঐতিহাসিক জবাবের সাথে সাথে মুহুর্মুহু স্লোগান শুরু হয়ে গেল। আদালতকক্ষে উপস্থিত আলিমগণ 'মুফতিয়ে আজম জিন্দাবাদ! ওয়ালি হাসান সাহেব জিন্দাবাদ' বলে সেই যে স্লোগান শুরু করলেন, দেখতে দেখতে আদালতপ্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে তা রাস্তায় পৌঁছে গেল। মুফতি সাহেবের চেহারা আমার এখনো মনে পড়ে। আবেগ ও জোশে রক্তিম হয়ে উঠেছিল। আর উনার উকিল সাহেব ভয়ে কাঁপছিলেন। আর সম্মানিত জজ সাহেব রাগে-ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। এদিকে স্লোগান যেন থামার নামই নিচ্ছিল না। আসলে শুধু করাচি থেকে না; বরং অন্যান্য শহর থেকেও দীনদার তাওহিদি জনতা মামলা দেখতে এসেছিল। ফলে তাদের মাঝে একধরনের উৎসাহ ও একইসাথে চাপা উৎকণ্ঠা আগে থেকেই কাজ করছিল। তারা ভেবেছিল মুফতি সাহেবকে মনে হয় জেলে পাঠানো হবে। অনেকে তো শেষ-দেখাও দেখতে এসেছিলেন। তাই মুফতি সাহেবের এমন বীরোচিত জবাবে তারা আর জজবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। আপনারা শুনে বিশ্বাস করবেন না, প্রায় আধাঘণ্টা ধরে থেমে থেমে স্লোগান চলতে থাকে। একপর্যায়ে জজ সাহেবরা ভয় পেয়ে ভেতরে চলে যান।

অনেক কষ্টে জনগণকে থামানোর পর জজ সাহেবরা আবার এসে আদালতে অবস্থান নেন। মুফতি সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, ভাড়াটে লোক নিয়ে এসে ভয় দেখাচ্ছেন মুফতি সাহেব?

উত্তরে তিনি বলেন, আমরা মৌলবি মানুষ। দুইশ রুপি বেতন নিয়ে চলি। আপনাদের মতো জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কাড়িকাড়ি সরকারি বেতন নিই না।

ভাড়াটে লোক আনার জন্য অবৈধ পয়সাও আমাদের নেই। এই মানুষরা নিজের দীনি আবেগ থেকেই এসেছেন।

জজ সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, করাচিতে আপনার অসুস্থতার কারণে আমরা নিজেরাই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে তো আপনি লোকজন নিয়ে আমাকেই ভয় দেখাচ্ছেন। আগামী এজলাস ইসলামাবাদে হবে। সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। এই বলে তিনি উঠে ভেতরে চলে যান। জনতা এই সিদ্ধান্তে আরো ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা 'যাহা বুলাওগে ওহি যায়েঙ্গে' বলে আবার স্লোগান শুরু করে। আমরা মুফতি সাহেবকে নিয়ে কোনোমতে নিউটাউনে ফিরে আসি।

মিশন ইসলামাবাদ!

করাচি আদালতে এই মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। নিউটাউনে শত শত সান্ত্বনামূলক চিঠি আসতে থাকে। মুফতি সাহেবকে চোখের মণি সম্বোধন করে জনগণ তাঁর পেছনে সবখানে থাকার কথা লিখে জানায়। সংবাদপত্রগুলোও রাষ্ট্রের সাথে মৌলবি সাহেবের বিরোধ নিয়ে ধারাবাহিক কলাম ছাপতে থাকে। সম্ভবত সেটা জানুয়ারি মাস ছিল। ইসলামাবাদে হাজিরার দিন ধার্য ছিল মাসের ২৫ তারিখে। মুফতি সাহেব আপন রুটিনে ব্যস্ত ছিলেন। দেশজুড়ে তাকে নিয়ে এত আলোচনা-পর্যালোচনা যেন তাঁর কানেই প্রবেশ করেনি। একদিন উকিল এসে হজরতকে হাজিরার জন্য প্রস্তুতির কথা জানিয়ে গেল। সেদিনই সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে বিষয়ের উপর বিস্তারিত একটি লেখা তৈরি করতে হুকুম দিলেন। পরিস্থিতির কারণে প্রভাবিত হয়ে কোনোরকম শৈথিল্য যেন না রাখি দলিল-প্রমাণে, এ বিষয়ে বিশেষ তালকিন করলেন।

আমিও হুকুম মোতাবেক লেখা শুরু করলাম। টানা এক সপ্তাহ কাজ করে প্রায় দেড়শ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ তৈরি করে হজরতের খেদমতে দিলাম। এদিকে উকিল সাহেবের চিন্তিত মুখে ব্যাকুলতার আনাগোনা চলমান ছিল। একদিন এসে মুফতি সাহেবের টেবিলে প্রবন্ধটি দেখে কিছুক্ষণ তাতে মগ্ন থাকলেন। এরপর হন্তদন্ত হয়ে সোজা আমার কাছে এসে বললেন, 'হুজুর, জারা আসান আলফাজ মে লিখ নেহি স্যাকতে!? আপনে উসতাদ কো মারওয়ায়েঙ্গে কেয়া!'

আমি বললাম, হুজুর এভাবেই লিখতে বলেছেন। সম্পাদনার প্রয়োজন হলে উনি তো আছেনই। আপনি উনার সাথে কথা বলুন।

আমি প্রবন্ধটি আমার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে বিস্তারিত আকারে সাজিয়েছিলাম। সেখানে পূর্ববর্তী আসলাফের কিছু ঘটনা উল্লেখ করি, যেখানে তারা সমকালীন শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাধারণ মুসলিম জনতা ও ইসলামি স্বার্থের পক্ষে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। বিনিময়ে তাদের দিতে হয়েছে চড়ামূল্য। জানমাল এমনকি দেশছাড়াও হয়েছেন অনেকে। আবার অনেকের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে শাসক সসম্মানে তাদের বিদায় দিয়েছে, অনেকে স্থান পেয়েছেন শাসকের দরবারে। এই ধরনের একটি কিতাব হলো আখবারুল কুজাত। দলিলের ব্যাপারে বিষয়ের উপর কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য উপস্থাপনের পর সকল মাজহাবের ইমামদের মত উল্লেখ করি। মুতাকাদ্দিম ও মুতাআখখির আলিমদের মত আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরি। দেওবন্দি আকাবির আলিমদের মতেরও উল্লেখ করি ভিন্নভাবে। এতে করে রিসালাহটি শতাধিক পৃষ্ঠার রূপ লাভ করে। মুফতি সাহেব প্রথম এজলাসের কথা মাথায় রেখে এই রিসালাহটির উপরও দেশের সকল মুফতি সাহেবের স্বাক্ষর গ্রহণ করলেন। মোটামুটি সকলেই স্বাক্ষর দিয়ে রিসালাহটির মূল্য বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দারুল উলুম স্বাক্ষর দিতে অপারগতা জানায়। মুফতি তাকি সে সময় শরিয়াহ কোর্টে সময় দিতেন। আসলে কোন কারণে তারা স্বাক্ষর দেননি তা আমি বলতে পারব না। ফিকহি ইখতিলাফ থাকতে পারে আলিমদের মাঝে। কিন্তু দেশজুড়ে সকলে একমত হলে সেখানে দ্বিমতের সুযোগ কতটুকু থাকে, এটি একটি প্রশ্ন হিসেবে থেকেই যায়। তবু দিনশেষে ইখতিলাফুল ওলামা রাহমাতুন।'

পিন্ডিতে কারফিউ

এদিকে ২৫ তারিখ ঘনিয়ে আসছিল। মুফতি সাহেবসহ মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই বিমানের টিকিট কেটে নিলেন। তেইশ তারিখে হঠাৎ করে সরকার ইসলামাবাদে কারফিউ জারি করে বসল। সেনাশহর পিন্ডির পর অনুমতি ছাড়া আর সামনে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। সরকার ভেবেছিল মুফতি সাহেবের ভক্তরা সবাই করাচিতে থাকে। কিন্তু ইসলামপ্রিয় জনতা যে পাকিস্তানের কোনায় কোনায় বসবাস করে এটা তারা ভুলে বসেছিলেন। ২৪ তারিখ মুফতি সাহেবসহ সকলে করাচি বিমানবন্দর থেকে রওনা দিলেন। আমরা তাদের অশ্রুভেজা চোখে ছেড়ে দিয়ে এলাম। কে জানে সরকার তাদের সাথে কী আচরণ করে। আমার মাকালা যখন মুফতি সাহেব দেখছিলেন তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আবদুস সালাম, আমার দিল ইতমিনান হয়ে গেছে।

প্রথমবার করাচি কোর্টে যাওয়ার সময় একটু উৎকণ্ঠা বোধ করেছিলাম। আলহামদু লিল্লাহ! তোমার (সবাইকে আপনি সম্বোধন করলেও আমাকে তুমি বলতেন কখনো কখনো) মাকালা পড়ে দিল একদম মুতমাইন হয়ে গেছে। এখন যে-কারও সামনে এই মাসআলায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারব। জাযাকাল্লাহ।

মুফতি তাকি উসমানির (হাফিজাহুল্লাহ) অবস্থান

মুফতি সাহেব ইসলামাবাদ রওনা হওয়ার আগের রাতে মুফতি তাকি আরেকবার এসেছিলেন দেখা করতে। মুফতি সাহেবকে এই দফা বিনীতভাবে উনি বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, ইসলামাবাদে অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারে। আপনি আলিমগণের মুরুব্বি। আপনার কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে তা অপূরণীয় ক্ষতি হবে আমাদের জন্য। মুফতি সাহেব স্মিত হেসে তাকে নিজের অবস্থানের কথা আরেকবার জানিয়ে দেন। কিছু মুহাজির আছে খুবই ভীরু প্রকৃতির। আর কিছু মুহাজির যেকোনো জুলুমের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকৃতির মুহাজির হবার চেষ্টা করো। এই বলে তিনি মুফতি তাকি সাহেবকে বিদায় জানান।[৯১] এদিকে আমার রিসালাহয় আইনের প্রতি ইসলামবিরোধিতার অভিযোগও আনা হয়েছিল। এত শক্ত ও কঠোর বাক্যের উপর উকালতি করতে অপারগতা প্রকাশ করেন আমাদের সম্মানিত সুপ্রিম কোর্টের উকিল। উনি মুফতি সাহেবকে নিবেদন করেন রিসালাহর ভাষ্য একটু কোমল করার জন্য। মুফতি সাহেব তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, আপনি শুধু আনুষ্ঠানিকতার জন্য আমার সাথে যাচ্ছেন। না আপনাকে কিছু বলতে হবে, আর না আপনার দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে! নিশ্চিন্ত থাকুন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ও তার ঐতিহাসিক দূরদর্শিতা

এদিকে ইসলামাবাদে তৈরি হচ্ছিল অত্যন্ত ভীতিকর অবস্থা। সরকার-পক্ষের লোকেরা বুঝতে পারছিল না যে মাটি ফুঁড়ে কীভাবে হাজার হাজার জনতার উদয়

---

[৯১] কালের স্রোতে সময় গড়িয়েছে। মুফতি তাকি সাহেব এখন শাইখুল ইসলাম। মুফতি ওয়ালি সাহেবের সেই দরদমাখা নসীহত ও শক্ত অবস্থান শাইখুল ইসলামকে আজ তার উস্তাদের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি জমিতে নির্মিত থাকা মসজিদগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন উঠলে শাইখুল ইসলাম তার উস্তাদের সেই ঐতিহাসিক অবস্থানকেই গ্রহন করেছেন। ফলে বহু মসজিদ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়।
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার এ এক উজ্জ্বল নমুনা হয়ে রইল। বারাকাল্লাহু ফীহি।

হলো। পিন্ডিতে কড়া অবরোধ থাকা সত্ত্বেও এত মানুষের সমাগম তাদেরকে সত্যি ভাবিয়ে তুলেছিল। পরিস্থিতির সার্বক্ষণিক রিপোর্ট সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের কাছেও পাঠানো হচ্ছিল। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এ বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কিন্তু একপর্যায়ে তিনি বিচারকদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়েন; যখন তিনি শোনেন যে, বৃদ্ধ মৌলবিদের করাচি থেকে উড়িয়ে ইসলামাবাদে আনা হচ্ছে।

এক সন্ধ্যায় জেনারেল জিয়া অ্যাটর্নি জেনারেল ও প্রধান বিচারকদের ডেকে আনেন। তাদেরকে কিছুটা ধমকের সুরে বলেন যে, আপনারা কেন এই গোলযোগ আরো বাড়িয়ে তুলছেন? কেন এই মৌলবিদের ডেকে এনে ইসলামাবাদের পরিবেশ ঘোলাটে করছেন? এ সময় উপস্থিত ছিলেন মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতিব। ভদ্রলোক সম্পর্কে আহমাদুর রহমান সাহেবের ভাই হবেন। তিনি এই সময় একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

ইমাম সাহেব জেনারেল জিয়ার নিকট ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের অনুমতি আবেদন করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া তাকে অনুমতি প্রদান করলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতে এসে চলমান বিষয়টির স্পর্শকাতরতা ও গভীরতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। আলিমগণ ঐতিহাসিকভাবেই অত্যন্ত প্রতিবাদী হন। এটি প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেবকে বোঝাতে ইমাম সাহেব সমর্থ হন। বিশেষ করে হকপন্থি আলিমগণ দীনের স্বার্থে এবং মুসলিম জনতার কল্যাণে প্রতিবাদী অবস্থান সর্বযুগেই গ্রহণ করেন এবং এর জন্য যেকোনো পরিণতি তারা বরণ করতে রাজি থাকেন। এ বিষয়টিও তাকে বুঝিয়ে তুলতে সমর্থ হন যে, ঠিক এমনই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ মুফতি সাহেব। জীবন দিলেও তারা মসজিদের স্বার্থে এবং দীনের স্বার্থে পিছপা হবেন না। জেনারেল জিয়া বিষয়টির স্পর্শকাতরতা আঁচ করতে পেরে ইমাম সাহেবকে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে বলেন। ইমাম সাহেব তাকে বলেন, আপনি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রধানবিচারপতিকে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করার আদেশ দিন। ইসলামবিরোধী, জনস্বার্থবিরোধী কোনো আইন বাস্তবায়ন করা হবে না—এই মর্মে তাদেরকে ফরমান জারি করতে বলুন। শুধু এটি করলেই চলমান প্রতিবাদমুখর পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব। ইমাম সাহেবের এই পরামর্শ জেনারেল জিয়ার অত্যন্ত পছন্দ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধানবিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেলকে একটি মাত্র এজলাসে মামলাটি নিষ্পত্তি করার জন্য কঠোর আদেশ জারি করেন।

পেছন দরজায় প্রধানবিচারপতি

শুনানির পূর্বরাতে অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রধানবিচারপতি মুফতি সাহেবের সাথে গোপন বৈঠক করার জন্য মুফতি সাহেবের কাছে একজন ব্যক্তিগত আলোচক পাঠান। মুফতি সাহেবের কঠোর অবস্থান থেকে সরে আসার জন্য তারা তাকে অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু মুফতি সাহেব জানান, আমি যে তিনটি কথার জন্য আজ মামলার শিকার হয়েছি, তার মধ্যে প্রথম দুটি সম্পূর্ণ খালিস দীনি স্বার্থের কারণে করেছি। এই দুটি মত থেকে এক চুল সরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় মতটি অর্থাৎ একজন বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে আমি যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছি তা যুক্তিযুক্ত হলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। যদিও একটি ইসলামি বা মুসলিমরাষ্ট্রের একজন বিচারপতি হবার জন্য অবশ্যই ইসলামি আইনশাস্ত্রে তার পূর্ণ পারদর্শিতা থাকার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমাদের ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রধানবিচারপতির ইসলামি আইনে খুব একটা পারদর্শিতা নেই। যদি তিনি এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলেন তাহলে আমি আগামীকাল কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে রাজি আছি। এসব নিয়ে দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ করবেন না। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রধানবিচারপতি মুফতি সাহেবের সহজ-সরল জীবনধারা এবং অত্যন্ত কঠোর প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্য দেখে অত্যন্ত অবাক হয়ে যান। তারা সে-রাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন।

জনতার আদালতে ইসলামের বিজয়

পরবর্তী দিন মামলার শুনানিতে মুফতি সাহেব এবং তার সঙ্গীরা যথাসময়ে উপস্থিত হন। এরপরে আদালতে উপস্থিত হন অ্যাটর্নি জেনারেল এবং বিচারকের দল। মুহূর্তেই সুপ্রিম কোর্ট ঘেরাও করে ফেলে হাজার হাজার তাওহিদি মুসলিম জনতা। মুহুর্মুহু স্লোগান তুলতে থাকে তারা ইসলামাবাদের রাজপথে। এমনকি এজলাসের ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছিল তাদের তাওহিদি কণ্ঠের আওয়াজ। সম্ভবত কেঁপে উঠেছিল প্রধানবিচারপতির দুর্বল অন্তর। তিনি খুব বেশি শুনানি না করেই মামলা নিষ্পত্তি করে দেন। শুধু মুফতি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে এতটুকু বলেন যে, আপনি ইসলামের অবস্থান প্রমাণ করতে গিয়ে প্রথমত কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। ইসলামি আইনে তো কিছুটা শৈথিল্য দেখানোর সুযোগ রয়েছে। যাই হোক, আপনাদের সাথে

জনগণের সমর্থন রয়েছে। তাই ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো! তবে আপনি আদালত অবমাননার জন্য যে মন্তব্য করেছিলেন তা আমরা তদন্ত করে জানতে পেরেছি যে, এটি আপনি স্বেচ্ছায় ও নিয়ত করে করেননি। বরং ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে এমনটি হয়েছে। যেহেতু আমাদের আইন নিয়তের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাই আপনার সেই ক্ষুব্ধ মন্তব্যটি আমরা ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টি দেখলাম। এভাবে এই ঐতিহাসিক মামলা আলিম ও জনগণের পক্ষে রায় ঘোষণার মাধ্যমে নিষ্পত্তি লাভ করে।

এ ঘটনার পর নিউটাউনের দারুল ইফতার একটি অনন্য অবস্থান তৈরি হয় পাকিস্তানজুড়ে। শুরুর দিকে দারুল ইফতায় মুফতি সাহেব, আহমাদুর রহমান সাহেব এবং শাহেদ দেহলবি সাহেব সহকারী মুফতি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে আমিও দারুল ইফতায় যুক্ত হই। এরপর আরো অনেকেই এই ধারার মেহনতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। মুফতি সাহেব যে অনমনীয়তা ও দীনি আত্মমর্যাদার অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন, তা পরবর্তীরাও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে ধরে রাখেন। যার ফলে বিশ্বজুড়ে আজ প্রতিবাদের অনন্য কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে নিউটাউনের দারুল ইফতা।

আরো কিছু ঘটনা সেই যুগে ঘটেছিল যার ফলে আল্লাহ তায়ালা দারুল ইফতার সম্মান ও মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

‘প্রশ্নবিদ্ধ’ সমান অধিকার!

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ আইনে পারদর্শী কিন্তু ইসলামি আইনে চরম অজ্ঞ কিছু বিচারক একবার প্রশ্ন তোলেন যে, ‘ছেলেমেয়ের সমতার এই যুগে তাদের সকল বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান করা উচিত। ইসলামও একই কথা বলে। তাই ইসলামি আইনে আমরা এখন থেকে পুরুষ-মহিলা ও ছেলেমেয়েকে সমান অধিকার দিতে চাচ্ছি। বিশেষত সাক্ষ্য আইনে ছেলেমেয়েকে আমরা সমান অবস্থান ও মর্যাদা দিতে চাই। অর্থাৎ ব্যভিচারের সাক্ষ্যদানে ইতিপূর্বে মুসলিম আইনে নারীদের স্বাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে যে কঠোরতা ছিল তা আমরা পরিবর্তন করতে চাই। যেকোনো মামলায়, যেকোনো অপরাধে সাক্ষী এখন থেকে মেয়েরাও হতে পারবেন!!’

এই প্রস্তাব নিয়ে কয়েকজন বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়মিত কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে কলাম লেখা শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মাঝে

এর কী প্রভাব পড়ে তা প্রত্যক্ষ করা। দারুল ইফতায় যখন কলামগুলি পৌঁছানো হয় তখন মুফতি সাহেব এগুলো নজর বুলিয়ে দেখেন। অত্যন্ত বিরক্তির সাথে তিনি এই কলামগুলোর একটি কঠোর জবাবমূলক কলাম দৈনিক জংয়ে লেখেন। কিন্তু ইসলামি আইনে অজ্ঞ বিচারকরা মুফতি সাহেবের দলিলসমৃদ্ধ কলামকে নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাসূচক যুক্তি-তর্ক দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালায়। তবে এর মাধ্যমে যে তারা কুরআন-হাদিস অস্বীকার করছিলেন, তা তাদের বোধগম্য হচ্ছিল না।

পালটাপালটি কলাম

অ্যাটর্নি জেনারেল খালেদ ইসহাক একের পর এক কলাম লেখা চালিয়ে যেতে থাকলে মুফতি সাহেব আমাকে আদেশ করেন, আমি যেন তাদের কলামগুলোর প্রতিটি ধরে ধরে বিস্তারিত জবাব লিখি। কিন্তু দাপ্তরিক ব্যস্ততা ও সবকের কর্মসূচি থাকায় প্রথমত আমি অপারগতা প্রকাশ করলেও মুফতি সাহেবের বারবার আদেশে কাগজ কলম হাতে নিতে বাধ্য হই। সেই সময় আমি উসমানিয়া মসজিদের খতিব ছিলাম। কলাম লেখা শুরুর পূর্বে উসমানিয়া মসজিদে ধারাবাহিকভাবে 'ইসলামে সাক্ষ্য ও মহিলাদের অবস্থান' শিরোনামে জুমার আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকি। উসমানিয়া মসজিদ জামশেদ রোডে ইসলামিয়া কলেজের ক্যাম্পাসে অবস্থিত ছিল। এই মসজিদটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শাইখুল ইসলাম শাব্বির আহমদ উসমানির হাত ধরে। তিনিই প্রথম খতিব ছিলেন এখানকার। এরপর তাঁরই একজন দেওবন্দ ফারেগ শাগরেদ ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। পরে মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবের মাধ্যমে আমার নিয়োগ হয় উসমানিয়া জামে মসজিদে। সেখানে হাই সোসাইটির মুসল্লিদের আগমন ছিল তুলনামূলক বেশি। তারা আমার দলিল-প্রমাণসমৃদ্ধ ধারাবাহিক আলোচনায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। আমাকে তারা গ্রন্থাকারে আলোচনাগুলো সাজিয়ে নিতে অনুরোধ করেন। ব্যস্ততার কারণে আমি তাদের কাছে অপারগতা প্রকাশ করলেও আলোচনাগুলো দ্রুত কলাম আকারে প্রকাশ করা শুরু করি। দৈনিক জং বিচারকদের পাশাপাশি আমার কলাম জবাব হিসাবে ছাপতে থাকে। শুরু হয় তাত্ত্বিক পর্যালোচনার একটি ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক আলোচনা। এক সপ্তাহে তারা লিখলে পরের সপ্তাহে আমি লিখতাম। এভাবে কিছুদিন লেখালেখির পর প্রায় আট কিস্তিতে আলোচনার ধারা সমাপ্তিতে আসে। আমি চূড়ান্ত প্রমাণসমৃদ্ধ একটি কলামে আলোচনার সমাপ্তি টেনে ধরি। পরবর্তী সময়ে এসে জং পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধগুলো একত্রিত করে মলাটবদ্ধ করা হয়। গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়- 'ইসলাম মে কানুনে শাহাদাত আউর আউরাতোঁ কা মাকাম'।

অ্যাটর্নি জেনারেল দারুল ইফতায়

এই ঘটনার কিছুদিন পর দারুল ইফতায় তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল—সম্ভবত তার নাম খালিদ ইসহাক—একজন ইংরেজ মহিলা নিয়ে আগমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব এবং মুফতি আবদুস সালাম নামের অজানা সেই কঠোর প্রতিবাদী মুফতি সাহেবের সাথে সাক্ষাত করা। একইসাথে ইংরেজ মহিলাকে ইসলাম গ্রহণ করানো। ইংরেজ মহিলাটি দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উনি জানতে পারেন আমরা উভয়ে ক্লাসে ব্যস্ত রয়েছি। তাই অপেক্ষারত ছিলেন। ক্লাস শেষ করে প্রথমে আমি দারুল ইফতায় প্রবেশ করি। সেসময় নিউটাউনে মাসআলা জানার জন্য মহিলারা নিয়মিত আগমন করতেন। ফলে তাদের জন্য দারুল ইফতার পাশেই ছোট্ট একটি পর্দাঘেরা কামরা রাখা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা সেখানেই অবস্থান করছিলেন। আমি অ্যাটর্নি জেনারেলের তার নাম-পরিচয় জানলেও সাক্ষাতে চিনতাম না। ফলে তাঁকে একজন সাধারণ আগন্তুক মনে করে আমি আমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ভদ্রলোক বিচক্ষণ ছিলেন। আমি আসার পূর্বেই তিনি আমার অবয়ব এবং হুলিয়া সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নিয়েছিলেন। তাই আমাকে চিনে নিতে তার খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। আমি এসে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এগিয়ে এসে আমাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি মুফতি আবদুস সালাম সাহেব? আমি অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিই, জি! আমি আবদুস সালাম। তিনি আমার সাথে দ্বিতীয়বার মুসাফাহা করে বলেন, আমি খালিদ ইসহাক! আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বলি, জি! আপনাকে তো নাম-পরিচয়ে চিনতাম। আপনি বলার পর এখন সরাসরি আপনাকে চিনলাম। নিউটাউনে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি! এরপর আমাদের মাঝে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা চলতে থাকে। তিনি তার কিছু অনুভূতি আমাকে জানান। বলেন, আমি উকিল সমাজে এ সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যাটর্নি জেনারেল। আইনে আমার চেয়ে পারদর্শী বর্তমানে তেমন কেউ নেই। কিন্তু আপনাদের দলিল-প্রমাণসমৃদ্ধ কঠোর অবস্থানসম্পন্ন লেখাগুলোর জবাব আমি আমার অত্যন্ত সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতেও খুঁজে পাইনি। আসলে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান ও আইনশাস্ত্র অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর দূরদর্শিতায় পরিপূর্ণ। আমি ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করব। আমার মনে হয়েছে, একজন বিচারপতির সাধারণ আইনের পাশাপাশি ইসলামি আইনেও পারদর্শিতা অর্জন করা উচিত। তার এই বোধোদয় ও ইতিবাচক অনুভূতির জন্য আমি তাকে মোবারকবাদ জানাই।

কালিমা পড়ানোর সৌভাগ্য

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুফতি সাহেব এসে পড়েন। তাদের মাঝে পূর্বপরিচয় থাকায় খুব ঘনিষ্ঠতা ও অকৃত্রিমভাবে একে অপরের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাওয়ায় অ্যাটর্নি জেনারেল জানান, ভদ্রমহিলা একজন ইংরেজ। তিনি ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইসলাম গ্রহণ করবেন। তাই আমি আপনাদের কাছে তাকে নিয়ে এসেছি। মুফতি সাহেব আমার দিকে ইশারা করে বলেন, আবদুস সালাম সাহেবকে কালেমা পড়িয়ে দিতে বলুন। কিন্তু আমি মুফতি সাহেবকে কালেমা পড়ানোর জন্য অনুরোধ করি। তবে ইশারায় মুফতি সাহেব আমাকে আরেকবার আদেশ করে বলেন, আপনিই এই পুণ্য কাজটি সমাধা করুন। আদেশ পেয়ে এবার আমি অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেবকে বলি, ভদ্রমহিলাকে পর্দার কাছাকাছি আসতে বলুন এবং এও বলুন যে, আমি তাকে যা যা বলব তিনি যেন সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। এভাবে ভদ্রমহিলাকে কালিমা পড়াবার সৌভাগ্য আমার নসিব হয়। পাকিস্তানে ইসলাম গ্রহণের একটি অফিসিয়াল রীতি প্রচলন রয়েছে। প্রতিটি দারুল ইফতায় ইসলাম গ্রহণের একটি বিশেষ ধারা ও কার্যক্রম রয়েছে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর নওমুসলিম ভাই ও বোনদের একটি সনদ প্রদান করেন। কোর্টে গিয়ে তারা এফিডেভিট করে নিতে পারেন। ফলে আইনের কাছে তাদের আর প্রশ্নবিদ্ধ থাকতে হয় না। এ পদ্ধতিটি যদি আমাদের দেশে চালু থাকত তাহলে দারুল ইফতাগুলোর খেদমতের পরিধি আরো সমৃদ্ধ হতো বলে মনে করি।

আমিও কাঠগড়ায়...

করাচি হাইকোর্ট এরপর থেকে ইসলামি যেকোনো ইস্যুতে মতানৈক্য তৈরি হলে মুফতি সাহেব অথবা দারুল ইফতায় যোগাযোগ করতেন। কয়েকবার এমন হয়েছিল যে আমাকেও হাইকোর্টে গিয়ে ইসলামি বিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে আসতে হয়েছে। একবার এমনই এক সাক্ষ্যদানের কেইসে আমাকে হাইকোর্টে যেতে হয়। সেখানে নারীদের অবস্থান নিয়ে বিচারকদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট দ্বন্দ্ব। একটি মামলায় কয়েকজন নারী সাক্ষী উপস্থিত হয়েছিলেন; কিন্তু পুরুষ সাক্ষী একজনও ছিলেন না। ফলে মামলাটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ইসলামি বিধানমতে এখন কী করা যায়? আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি মৌখিক জবাব চাচ্ছেন নাকি লিখিতরূপে আপনাদের জবাব পেশ করতে হবে? জজ সাহেব বলেন, আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন। আমি প্রস্তাব করি, একটি লিখিত কপি

আপনার সামনে থাকলে সেটি পাঠরত অবস্থায় আপনি আমার বক্তব্য শুনলে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে বলে আশা করি। উত্তম প্রস্তাব বলে অভিহিত করে আমাকে লিখিত আকারে পেশ করার অনুমতি দেন। আমি বিস্তারিত আলোচনা তাদের সামনে পেশ করি। সেদিন কয়েকজন উকিল-ব্যারিস্টার দাঁড়িয়ে যান। তারা প্রশ্ন করেন, আপনি কুরআনের আয়াতগুলো তুলে ধরেছেন। সেখানে আরবি ভাষায় তো আমরা কোনো পুরুষ বা মহিলা সাক্ষী দেখছি না! তাহলে তার অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় এবং ফতোয়ায় কীভাবে নারীদের সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বঞ্চিত করছেন? আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বললে আমি শুরুতেই একটু হেসে দুঃখ প্রকাশ করি। আমি বলি জজ সাহেব, আরবিভাষায় সামান্য ধারণা থাকলেও এ প্রশ্নটি সম্মানিত আদালতে উত্থাপিত হতো না। আমাদের মাদরাসাশিক্ষার একজন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রও এ বিষয়টি জানে যে, আরবি ভাষায় পুরুষবাচক শব্দ ও স্ত্রীবাচক শব্দগুলোর আলাদা আলাদা গঠনরূপ থাকে। এখানে ভিন্নভাবে পুরুষ এবং নারী শব্দের উল্লেখ করতে হয় না। সম্মানিত উকিল এবং ব্যারিস্টারগণ ব্রিটিশ বেনিয়াদের আইন কণ্ঠস্থ করলেও কুরআন-হাদিসের আইন এবং আরবি ভাষার ন্যূনতম জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাননি। ফলে আজকে তাদেরকে এত বড় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হতে হচ্ছে। আমার জবাবে জজ সাহেব অত্যন্ত প্রীত হন এবং মামলাটি ইসলামি আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করে দেন। এভাবে বহু ঘটনায় নিউটাউন ও নিউটাউনের দারুল ইফতার একটি সম্মানজনক অবস্থান এবং মর্যাদাময় খ্যাতি দেশব্যাপী বরং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

উলাইকাল কিবার...

এভাবে নিউটাউনে দারুল ইফতায় আমার সময় কাটতে থাকে। বয়সের সাথে বাড়তে থাকে অভিজ্ঞতাও। যখন আল্লামা বানুরি দুনিয়া থেকে চলে যান, নিউটাউনের প্রতিষ্ঠাতার ইনতেকালে এই শোকাবহ পরিবেশে মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবকে মুহতামিমের আসনে বসানো হয়। তিনি যেহেতু দারুল ইফতায় কর্মরত ছিলেন, তাই তার দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে দারুল ইফতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য হয়ে পড়ে। মাওলানা ইদরিস সাহেব হুজুর এবং মুফতি সাহেব পরামর্শ করে আমাকে মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবের আসনে বসিয়ে দেন। আমি নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও উসতাদদের আদেশে ইফতার কার্যক্রম ও দায়িত্ব আনজাম দিয়ে যেতে থাকি। সে সময় দারুল ইফতার কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে। দৈনিক প্রচুর ফতোয়া আসত। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায় থেকে নানা ধরনের প্রশ্নের সমাধান প্রতিদিন দিতে হতো। তাই পরামর্শসাপেক্ষে কয়েকজনকে সহকারী মুফতিপদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

একসময় মুফতি সাহেব হুজুর অসুস্থ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরও দিনরাত দারুল ইফতা নিয়ে চিন্তাফিকির করতেন। শায়িত অবস্থাতেও। একদিন আমি দেখা করতে গেলে তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, আবদুস সালাম, আমাদের এই দারুল ইফতাকে একটু দেখে রেখো। আমি জানি না আমার পরে এটি কীভাবে চলবে। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, আপনি যেই নাহজের উপর একে উঠিয়েছেন, ইনশাআল্লাহ এটি সেই পথেই পরিচালিত হবে। তবু মুফতি সাহেবের পরামর্শে আমরা দারুল ইফতাকে পরবর্তীকালে একটি সমৃদ্ধ ছকে বিন্যস্ত করে ফেলি।

নতুন ছকে দারুল ইফতা

দারুল ইফতার কার্যক্রম একদম ঢেলে সাজানো হয়। যেকোনো একটি প্রশ্ন অথবা ইসতিফতা দারুল ইফতায় এলে প্রথমে কয়েকজন সহকারী মুফতি সমাধান করবেন। এরপর তাদের মাঝে একজন দায়িত্বশীল মুফতি সেটি পাঠ করে তাসহিহ বা শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করে দেবেন। এরপর সেটি আমার কাছে পাঠানো হবে। আমি সাধ্যমতো সেটি দেখে একটি স্বাক্ষর করে দেব। এই স্বাক্ষরকৃত ফতোয়া চলে যাবে মুফতি সাহেবের ডেস্কে। সেখানে মুফতি সাহেব সেটি চূড়ান্ত পর্যালোচনা করে স্বাক্ষর করবেন। এভাবে দারুল ইফতা একটি ফতোয়াকে পর্যায়ক্রমিক শুদ্ধতার মাধ্যমে বিশুদ্ধ হিসেবে জনগণের সামনে পেশ করবে। এই ছকে বাঁধা বিন্যস্ত কার্যক্রমের ফলে দারুল ইফতার কার্যক্রম আরো গুছিয়ে ওঠে। দ্রুততা ও শুদ্ধতার সাথে দেশ ও জাতির খেদমত করে যেতে থাকে।

এভাবে টানা ছয় বছর পর একসময় আল্লাহ তায়ালার হুকুমে মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তার অসুস্থতার পরে মজলিসে শুরা মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবকে সাথে নিয়ে পরামর্শসভা ডাকে। সেখানে প্রধান মুফতির পদ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। অধিকাংশের মত এই পদ মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব এবং আল্লামা ইউসুফ বানুরির দীর্ঘ সান্নিধ্য পাওয়া ব্যক্তিরাই অলংকৃত করতে পারেন। কেননা এ পদের জন্য শাস্ত্রজ্ঞ এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেই মানায়। অর্থাৎ ইঙ্গিত ও ইশারায় সকলেই আমার কথা বলতে চাচ্ছিলেন। মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব এ বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মজলিসে শুরার কাছে আমার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারটি তুলে ধরেন। কিন্তু সে সময়ে আল্লাহর হুকুমে আমিও মাফলুজ (প্যারালাইজড) হয়ে পড়েছিলাম। ফলে মজলিসে শুরা সিদ্ধান্ত নেয়, যতদিন মুফতি সাহেব জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনিই জামেয়া ইসলামিয়া বানুরিটাউনের প্রধান মুফতির পদ অলংকৃত করবেন। আর মুফতি আবদুস সালাম সাহেব প্রধান মুফতির নায়েবের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

দুর্বল কাঁধে সদর মুফতির ভার

যখন মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেব ইনতেকাল করেন, তখন মুফতি সাহেবরা আমার সাথে দেখা করতে এসে দারুল ইফতার পুরো বিষয়টি তুলে ধরেন। আমার মত জানতে চাইলে আমি বলি, দেখুন, আমি একজন বিদেশি মানুষ। বয়সও আমার তেমন হয়নি। মুফতি সাহেবের সামান্য সান্নিধ্য পেয়েছি; কিন্তু সদর মুফতি নিউটাউন পদে আসীন হওয়ার জন্য একজন বয়োজ্যেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুদীর্ঘ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। আমি খুবই ছোট মানুষ। এতবড় পদ অলংকৃত করার যোগ্যতা হয়তো আমার নেই। আপনারা পুনর্বিবেচনা করে আরেকবার পরামর্শ করুন।

মুফতি সাহেবরা আমার মতামত মজলিসে শুরার কাছে পৌঁছে দেন। পরবর্তী সভায় বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত হয় আমাকেই সদর মুফতি পদে আসীন করা হবে। কিন্তু আমার অসুস্থতার দরুন শুধু স্বাক্ষর করা এবং একঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা অফিস করার সুযোগ দেওয়া হয়। আমি আমার সকল অযোগ্যতা মেনে নিয়েই নিউটাউনের দারুল ইফতার সদর মুফতি পদে খেদমত শুরু করি।

ডক্টর হাবিবুল্লাহ মুখতার সাহেব সে সময় অত্যন্ত পরিশ্রমী, কর্মঠ এবং তরুণ জোয়ান আলিম। তিনি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমিও ধারাবাহিক কয়েক বছর ধরে সদর মুফতির পদে খেদমত করে যাই। কিন্তু এক সময় কিছু স্থানীয় তরুণ শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণের কারণে আমি অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে নিউটাউন থেকে ইস্তফা প্রদান করি। মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব খবর জানতে পেরে দ্রুত আমার বাসায় ছুটে আসেন। সে সময় আমার আব্বা অথবা আম্মাজানের ইনতেকাল হয়েছিল। আমাকে সান্ত্বনা দান করার পর মুফতি সাহেব বলেন, মুফতি আবদুস সালাম সাহেব, আপনি আমাদের নিউটাউনের সোনালি অতীত। আপনি যদি কষ্ট পেয়ে ইস্তফা প্রদান করেন, তাহলে এটি নিউটাউনের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে। আপনার কাছে আমি আবেদন করব, আপনি আমার অনুরোধ ফিরিয়ে দেবেন না। আপনি যদি আমার কাছে ইস্তফা দিয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনার ইস্তফা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালাম। আপনি দয়া করে এক ঘণ্টা হলেও নিউটাউনে সময় দেবেন।

মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবের অনুরোধে আমি পরবর্তী সময়ে এক ঘণ্টা করে দারুল ইফতায় যাওয়া অব্যাহত রাখি।

এর কিছুদিন পর মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবের ইনতেকাল হয়ে যায়। ইহতিমামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডক্টর হাবিবুল্লাহ সাহেব। তার সময়ে আবারো আমি কিছু মানুষের আচরণে অত্যন্ত কষ্ট পাই। যদিও দারুল ইফতায় আমি এক ঘণ্টাকালীন অফিস করা অব্যাহত রেখেছিলাম; কিন্তু দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা আমাকে ব্যাকুল

করে তুলত। আমি সবসময় চাইতাম, শেষজীবন যেন দেশের মাটিতে কাটাতে পারি। পরবর্তীকালে হাটহাজারির প্রাণপুরুষ আল্লামা আহমদ শফি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহির উদ্যোগে আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেশের মাটিতে দীনের খেদমত করার সুযোগদান করেন।

স্মরণে সহকর্মীরা

অনেকেই জানতে চায় যে, আমার পরে বা আমার সময়ে কারা নিউটাউনের দারুল ইফতায় কর্মরত ছিলেন। তাদের স্মরণে সামান্য স্মৃতিচারণ করছি।

আমার পরে বেশ কয়েকজন মুফতি সাহেব দারুল ইফতায় কর্মরত ছিলেন। প্রাথমিকভাবে যখন আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন হাবিবুল্লাহ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, মুফতি সাহেব, আপনার জানামতে এমন কোনো ব্যক্তি রয়েছে কি, যিনি আপনার এবং মুফতি সাহেবের দীর্ঘ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। আমরা এমন একজন মুফতি সাহেবকে নিউটাউনে নিয়ে আসতে চাই। আমি মুফতি আবদুল মজিদ দীনপুরির নাম উল্লেখ করি। তিনি আমার এবং মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেবের শাগরেদ ছিলেন। তিনি সেসময় পাঞ্জাবের একটি মাদরাসায় শিক্ষাসচিব অথবা অন্য কোনো দায়িত্বে ছিলেন। তিরমিজি শরিফ পড়াতেন। হাবিবুল্লাহ সাহেব তাকে চিঠি লিখে জানান, আপনি নিউটাউনে দীর্ঘদিন পড়াশোনা করেছেন এবং মুফতি সাহেবদের সান্নিধ্য গ্রহণ করেছেন। এই মুহূর্তে নিউটাউন একজন মুফতির প্রয়োজন অনুভব করছে। আপনি চিঠি পাওয়ামাত্র আপনার কর্মস্থল থেকে ইস্তফা দিয়ে এখানে চলে এলে আমরা বড় উপকৃত হতাম। মুফতি আবদুল মজিদ চিঠি পেয়ে নিউটাউনে এসে পড়েন এবং মুফতিপদে যোগদান করেন।

শহিদ ইউসুফ লুধিয়ানবি নিউটাউনে

উনি মাওলানা লুধিয়ানবি নামে পরিচিত। নিউটাউনে দারুল ইফতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না; প্রথমে উনি নিউটাউনের মাসিক মুখপাত্র আল-বাইয়্যিনাত-এর সম্পাদক ছিলেন। অসাধারণ কলাম-লেখক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তবে আল-বাইয়্যিনাতে 'আপ কে মাসায়িল আওর উন কি হাল' কলামে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তিনি মুফতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। উনি পাঞ্জাবের একটি মাদরাসায় খেদমত করতেন। মাসে ২০ দিন সেখানে এবং নিউটাউনে দাপ্তরিক কাজে ১০ দিন অফিস করতেন। এভাবে একই সাথে দুটি প্রতিষ্ঠানে তিনি দীর্ঘদিন খেদমত করে এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা তার শাহাদাত কবুল করুন।

শহিদ মুফতি নিজাম শামজাই

মুফতি নিজামুদ্দীন শামজাইকে জামিয়া ফারুকিয়া থেকে নিউটাউনে খেদমতের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। আমি যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ি, তখন তিনি তিরমিজি আউয়াল পড়ানো শুরু করেন। পাশাপাশি দারুল ইফতাতেও তাকে নায়েবে মুফতির পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা কিছুটা কম থাকায় সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে যেত। নিয়ম ছিল, নায়েবে মুফতি কোনো ফতোয়ায় স্বাক্ষর করার পর সদর মুফতি সেটি আরেকবার দেখে এরপর স্বাক্ষর করতেন। কয়েকবার এমন হয়েছিল যে, ছাত্রভাইয়েরা কয়েকটি ফতোয়ায় স্বাক্ষর করার পর যখন আমার কাছে নিয়ে আসেন, তখন দেখা যায় ফতোয়ায় কিছু ভুল রয়ে গেছে, যা মুফতি সাহেব শুদ্ধ করে দেননি। এ সময় ছাত্রভাইদের মনে তার ব্যাপারে একটু সংশয় জন্ম নেয়। একবার বাইরে থেকে একটি মাসআলা দারুল ইফতায় আসে। সম্ভবত মাসআলাটি হায়াতি ও মামাতি সংক্রান্ত ছিল। এখানে জবাবে মুফতি সাহেব নিজেই এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করেন, যা মামাতিদের পক্ষে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিপক্ষে যায়। আমি সে-সময় অসুস্থ থাকায় শুধু তার স্বাক্ষরসংবলিত পত্রটি প্রচারিত হয়ে পড়ে। সারা দেশে এটি প্রচার করে ফেলে মামাতি সম্প্রদায়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলিমগণ হায়াতুন-নবীর পক্ষের আলিমদের কাছে এবং ব্যক্তিগতভাবে মুফতি নিজামুদ্দীন সাহেবের কাছে রুজু করেন। এত বেশি রুজু আসতে থাকে যে মুফতি সাহেব নিজেই বিব্রত হয়ে পড়েন। জামিয়া ফারুকিয়ার মুফতি সাহেব হিসেবে সেখানে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতেন তিনি। এতটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে অত্যন্ত হতচকিয়ে যান মুফতি সাহেব। বড় বড় কয়েকটি মাদরাসায় তিনি যখন খতমে বুখারি ও অন্যান্য ইসলামি সম্মেলনে অংশ নিতে যান, তখনও আলিমগণ তাকে আলোচনায় বাধাদান করেছিলেন। শুরুতে তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল আপনি যে ফতোয়া প্রদান করেছেন, তার ব্যাপারে আপনার অবস্থান স্পষ্ট করুন।

এভাবে নিউটাউনের দারুল ইফতা সুশৃংখল কাঠামোর মাঝে থাকায় তার জন্য ফতোয়া কার্যক্রম চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তিনি ইস্তফা দিয়ে দারুল ইফতা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। ডক্টর হাবিবুল্লাহ সাহেব তখন তাকে তাখাসসুস ফিল ফিকহের মুশরিফের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই ভদ্রলোককে তাগুতি বাহিনী ইসলামের পক্ষে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হওয়ার কারণে শহিদ করে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে শহিদদের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন। আমিন। আমাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা শাহাদাতের মরতবা দান করুন। আমিন।

শহিদ মুফতি নিজাম শামজাই

মুফতি নিজামুদ্দীন শামজাইকে জামিয়া ফারুকিয়া থেকে নিউটাউনে খেদমতের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। আমি যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ি, তখন তিনি তিরমিজি আউয়াল পড়ানো শুরু করেন। পাশাপাশি দারুল ইফতাতেও তাকে নায়েবে মুফতির পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা কিছুটা কম থাকায় সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে যেত। নিয়ম ছিল, নায়েবে মুফতি কোনো ফতোয়ায় স্বাক্ষর করার পর সদর মুফতি সেটি আরেকবার দেখে এরপর স্বাক্ষর করতেন। কয়েকবার এমন হয়েছিল যে, ছাত্রভাইয়েরা কয়েকটি ফতোয়ায় স্বাক্ষর করার পর যখন আমার কাছে নিয়ে আসেন, তখন দেখা যায় ফতোয়ায় কিছু ভুল রয়ে গেছে, যা মুফতি সাহেব শুদ্ধ করে দেননি। এ সময় ছাত্রভাইদের মনে তার ব্যাপারে একটু সংশয় জন্ম নেয়। একবার বাইরে থেকে একটি মাসআলা দারুল ইফতায় আসে। সম্ভবত মাসআলাটি হায়াতি ও মামাতি সংক্রান্ত ছিল। এখানে জবাবে মুফতি সাহেব নিজেই এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করেন, যা মামাতিদের পক্ষে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিপক্ষে যায়। আমি সে-সময় অসুস্থ থাকায় শুধু তার স্বাক্ষরসংবলিত পত্রটি প্রচারিত হয়ে পড়ে। সারা দেশে এটি প্রচার করে ফেলে মামাতি সম্প্রদায়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলিমগণ হায়াতুন-নবীর পক্ষের আলিমদের কাছে এবং ব্যক্তিগতভাবে মুফতি নিজামুদ্দীন সাহেবের কাছে রুজু করেন। এত বেশি রুজু আসতে থাকে যে মুফতি সাহেব নিজেই বিব্রত হয়ে পড়েন। জামিয়া ফারুকিয়ার মুফতি সাহেব হিসেবে সেখানে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতেন তিনি। এতটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে অত্যন্ত হতচকিয়ে যান মুফতি সাহেব। বড় বড় কয়েকটি মাদরাসায় তিনি যখন খতমে বুখারি ও অন্যান্য ইসলামি সম্মেলনে অংশ নিতে যান, তখনও আলিমগণ তাকে আলোচনায় বাধাদান করেছিলেন। শুরুতে তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল আপনি যে ফতোয়া প্রদান করেছেন, তার ব্যাপারে আপনার অবস্থান স্পষ্ট করুন।

এভাবে নিউটাউনের দারুল ইফতা সুশৃংখল কাঠামোর মাঝে থাকায় তার জন্য ফতোয়া কার্যক্রম চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তিনি ইস্তফা দিয়ে দারুল ইফতা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। ডক্টর হাবিবুল্লাহ সাহেব তখন তাকে তাখাসসুস ফিল ফিকহের মুশরিফের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই ভদ্রলোককে তাগুতি বাহিনী ইসলামের পক্ষে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হওয়ার কারণে শহিদ করে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে শহিদদের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন। আমিন। আমাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা শাহাদাতের মরতবা দান করুন। আমিন।

মজলিসে হাজিরা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে মুহাজির আলিমগণ বৈপ্লবিক খেদমত আনজাম দিয়েছেন। সময় ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন ভূমিতে নতুন সব মেহনতের ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন। তারই একটি অংশ ছিল 'মজলিসে হাজিরা'। জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যাগুলো নিয়ে সময়ের সেরা আলিমগণ একসাথে বসে এগিয়ে নিয়েছিলেন এই কার্যক্রম। পরবর্তী সময়ে এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানে ধর্মীয় গবেষণার নতুন নতুন ধারা ও ক্ষেত্র তৈরি হয়। সৃষ্টি হয় ইতিহাস। সেসব নিয়ে সামান্য আলোচনা করব। আল্লাহ তায়ালা জীবনে সুযোগ দিলে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত বলার ইচ্ছা আছে। আমার প্রিয় বাঙলাতেও সাহসী আলিমদের গবেষণায় যদি কিছু পরামর্শমূলক সহযোগিতা করতে পারি, এটি আমার সৌভাগ্য মনে করব।[৯২]

এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার শুরুতেই আমি হজরত আল্লামা বানুরির একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনাতে চাই। নিউটাউনের মাসিক পত্রিকা আল-বাইয়্যিনাত-এর একটি বিখ্যাত কলাম 'দূরদর্শিতা থেকে শিক্ষা' এই কলামে একটি অতি পরিচিত প্রবন্ধ-সিরিজ ছিল 'তাফাক্কুহ ফিদ দীন' দীর্ঘদিন ধরে লিখছিলেন আল্লামা বানুরি। এখানে একটি প্রবন্ধে মজলিসে হাজিরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তিনি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। আমি আপনাদের সরাসরি সেই প্রবন্ধ থেকে একটু পাঠ করে শোনাচ্ছি।

"আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সর্বযুগে এমন কিছু ব্যক্তি প্রস্তুত করেন, যারা আসমানি ইলমের সংরক্ষণের জন্য নিজেদের জান-মাল, সময় ও যোগ্যতা বিনাবাক্যে ব্যয় করে থাকেন। এ ধরনের একটি জামাত বর্তমান সময়ে ওলামায়ে কেরাম। তারা আসমানি ইলমের সংরক্ষণের জন্য নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছেন। ইংরেজদের ভারতত্যাগের পর ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের আলিমগণ দীনি পরিবেশে ইলমের প্রচার-প্রসারের জন্য দিনরাত মেহনত করে যাচ্ছেন। তাদের একটি মৌলিক লক্ষ্য হলো, দীনের সংরক্ষণের জন্য আল্লাহভীরু এবং উম্মাহর প্রতি দরদি, গভীর দীনি জ্ঞানসম্পন্ন আলিমদের একটি জামাত তৈরি করা, যাকে আরবিতে তাফাক্কুহ ফিদ দীন বলা হয়। সমাজে এই জামাতের মানুষ খুব স্বল্প পরিমাণে হলেও উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক নতুন নতুন ধর্মীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে। এগুলো সমাধানের জন্য এই জামাতে অত্যন্ত মেধাবী, দূরদর্শী, গভীর

---

[৯২]. তাকদিরের লিখন, এই আলোচনাগুলো করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন, ঠিক এমন সময়েই আল্লাহ তায়ালা তাকে আখেরাতের জীবনে নিয়ে নেন। রহিমাহুল্লাহ!

জ্ঞানের অধিকারী এবং আল্লাহভীরু কিছু মুফতির প্রয়োজন, যারা একত্র হয়ে উম্মতের এই কঠিন সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাধান করবেন।

আমরা এই জামাতে কিছু সংখ্যক মানুষকে রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে বলে মনে করি। প্রথমত আবুল ফয়েজ ও ফাইজির[৯৩] মতো আলিমদের উম্মতের সমস্যা সমাধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ এই মজলিসে কখনোই স্থান দেওয়া যাবে না। কেননা এই ধরনের জ্ঞানী তথা জ্ঞানপাপীরা উম্মতের জন্য সর্বদাই অকল্যাণ বয়ে এনেছে। এরা এদের জ্ঞান শুধু পার্থিব স্বার্থরক্ষায় ব্যয় করে থাকে। ফলে সাময়িক কিছু দিরহাম-দিনার অথবা ডলার পকেটস্থ হলেও পার্থিব জীবনে সম্মান-মর্যাদা এবং আখিরাত কোনোটিই তাদের অর্জিত হয় না।

দ্বিতীয়ত মুফতিপদটি কোনো সাধারণ পদ নয়। চাইলেই যেকোনো আলিম মুফতি হতে পারেন না। এটি এমন একটি পদ, যেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, অভিজ্ঞ, খোদাভীরু ও দরদি আলিমে দীনের প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে হাজার হাজার আলিম রয়েছেন। কিন্তু মুফতিপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মতো আলিম একদম হাতেগোনা। তবে এটিও বাস্তব সত্য যে, ধর্মীয় জ্ঞানের সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা সরকারি ক্ষেত্র থেকে না থাকায় জনগণের প্রিয় পাত্র হবার জন্য আজকাল যেকেউ নিজেদের মুফতি বলে দাবি করছে। সামান্য কয়েকটি কিতাব অধ্যয়ন করে উম্মতের বড় বড় সমস্যার ভুল ও বিভ্রান্তিকর সমাধান দিয়ে উম্মতকে আরো বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে কিছু নামধারী মুফতি। পাকিস্তান সরকার ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামি গবেষণায় কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা আজও সার্বিকভাবে করেনি। এই ক্ষেত্রগুলোতে কোনো জবাবদিহিতাও নেই। ফলে মুফতি পদের মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ পদ আজ হকারের পরিচয়ের মতো সস্তা হয়ে গেছে। এই পদটি গ্রহণের জন্য ব্যাঙের ছাতার মতো ছোট ছোট ভাড়াটে প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানজুড়ে গড়ে উঠছে। আগামী দিনগুলোতে ইলমি খেয়ানতের এই ধারা বন্ধ করা না গেলে উম্মতের জন্য সঠিক ধর্মীয় রাহবার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে।

আলিম তো অনেকই আছেন। কারিও হাজার হাজার আছেন। বক্তার তো আজকাল অভাব নেই। কিন্তু দেশজুড়ে আপনি যোগ্য ও অভিজ্ঞ মুফতি খুব কমই খুঁজে পাবেন। এর কারণ হলো, এই পদটি অলংকৃত করতে একদিকে যেমন ধর্মীয় জ্ঞানে শাস্ত্রজ্ঞ পারদর্শী হতে হয়, অপরদিকে ব্যক্তিজীবনে ধর্মীয় অনুশাসন অত্যন্ত

---

[৯৩]. মোগল সম্রাট আকবরের সময়ের দরবারি শাস্ত্রজ্ঞ, আকবরকে যারা ইসলামের বিভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। যাই হোক, ইসলামি পাকিস্তান গঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এই অবস্থানটির পেছনে কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা আলিমগণ পাননি। তবু আপনি দেখবেন, দেশজুড়ে কয়েকটি বড় বড় দারুল ইফতা জনগণের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সারাদেশ থেকে পাঠানো ধর্মীয় ও যাপিত জীবনের নানা সমস্যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অভিজ্ঞ ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মুফতিগণ দিয়ে থাকেন।

আধুনিক সভ্যতা মুসলমানদের জীবন অনেকটা কঠিন করে তুলেছে। তারা প্রতিপদে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এমতাবস্থায় অভিজ্ঞ মুফতি ব্যতীত কেউ যদি এই সমস্যাগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে তারা ভুল করবেন। যারা স্বাভাবিক ও সাধারণ ধর্মীয় সমস্যাদির সমাধান সঠিকভাবে দিতে পারেন না, তারা কীভাবে কুরআন-সুন্নাহতে সরাসরি উপস্থিত না থাকা এবং গবেষণাপ্রসূত সমস্যাদির সমাধান প্রদান করবেন? এই ধরনের সুবিধাবাদী আলিমদের কাছে ফতোয়া বলতে তো এটাই বুঝায় যে, 'সময়ের স্রোতে ভেসে চলো'। অর্থাৎ এমন একটি সমাধানপদ্ধতি, যা সুবিধাবাদী জীবনধারাকে ইসলামিকরণের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। এমন পরিস্থিতিতে আধুনিক ও জটিল সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে আলিমদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ জামাতকে এগিয়ে এসে একত্রিত হতে হবে। উম্মতের স্বার্থে তাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। বর্তমান সময়ে পশ্চিমাবিশ্ব যেভাবে কুফরি ও জড়বাদী নাস্তিকতার দিকে হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমাপন্থি সমাজ ও রাষ্ট্রগুলো যেভাবে তাদের অন্ধের মতো অনুসরণ করছে, তাতে মনে হয়, পাকিস্তানি সমাজে এই বৈশ্বিক অন্ধকারের ছটা খুব দ্রুত পড়তে যাচ্ছে। এই অন্ধকার পরিস্থিতিতে আলিমগণ এই জামাতকে অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও পারদর্শিতার সাথে জনগণকে দীন ইসলাম ও সুন্নাতে নববির প্রতি আকৃষ্ট রেখে তাদের মূল্যবান ইসলামি জীবনধারাকে অটুট রাখতে সাহায্য করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে পাকিস্তানি আলিমদের একটি বৃহত্তর জামাত এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, আধুনিক সমস্যার ক্ষেত্রে কোনো একক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমাধান গৃহীত হবে না। এটি ইসলামি ও ফিকহি উসুলেরও বিপরীত; বরং উদ্ভূত আধুনিক সমস্যাগুলো বিজ্ঞ মুফতিদের একটি বোর্ড কর্তৃক সমাধা হয়ে জনগণের সামনে আসাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। সেই ধারাবাহিকতায় সমগ্র পাকিস্তান থেকে চারজন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবকে নির্বাচিত করে একটি মজলিস গঠন করা হয়েছে। তারা প্রাথমিকভাবে 'ইসলামি গবেষণা সংস্থার' নামে প্রতিষ্ঠিত সরকারি এই জালি প্রতিষ্ঠানের সকল অপকর্মের জবাবমূলক একটি

পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। জনগণের সামনে সহিহ ফতোয়া আসার পূর্বে ভুল ও বিভ্রান্তিকর সমাধানগুলোর বিস্তারিত আলোচনা আসা প্রয়োজন।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক গবেষণা সংস্থা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যাদের কাজ হলো, জনগণের জীবনে উদ্ভূত ধর্মীয় সমস্যাদির বিশেষত আধুনিক সভ্যতার ফলে তৈরি হওয়া নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়া। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে—এই সংস্থাটি ইসলামি গবেষণার নামে সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারী জীবনধারাকে ইসলামিকরণের সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সব ধরনের আধুনিক সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে না দেখে বরং নামকাওয়াস্তে সহজ সমাধান বর্ণনা করে মূলত ইসলামকেই পশ্চিমীকরণের ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে এই সংস্থার মাধ্যমে।

উদাহরণস্বরূপ এই সংস্থা সম্প্রতি কয়েকটি বিভ্রান্তিকর ও চরম আপত্তিকর ফতোয়া প্রদান করেছে। তারা বলেছে : মানবদেহের অঙ্গ অপর দেহে প্রতিস্থাপন করা বৈধ। যদি এতে দাতার ইচ্ছা ও সম্মতি থাকে।

তারা আরো বলেছে : মেশিনে জবাই দেওয়ার সময় শুধু একবার বিসমিল্লাহ পাঠ করলেই হয়ে যাবে। অর্থাৎ শত শত পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে মেশিনের সুইচ প্রদানের সময় বিসমিল্লাহ একবার পাঠ করলেই সকল জবাই হালাল হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ।

এই ধরনের প্রচুর ফতোয়া তারা কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক দিকনির্দেশনা ব্যতীত জনগণের সম্মুখে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রদান করে যাচ্ছে এবং দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। সম্প্রতি সৌদি আরবে ও মধ্যপ্রাচ্যে—মেশিনে জবাই হালাল—এই ঘোষণার ফতোয়া এই সংস্থা থেকেই তারা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ উম্মাহকে সামগ্রিকভাবে বিভ্রান্ত করার মিশনে এ সংস্থাটি এখন আন্তর্জাতিকভাবেও কাজ করে যাচ্ছে। এটি পাকিস্তানি জনগণের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং হতাশাব্যঞ্জক সংবাদ।

হজরত আল্লামা বানুরির কলামের অংশ ছিল এটি।

লক্ষ্যপানে মুফতিয়ান

এই লক্ষ্যে আলোচিত মজলিসটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে শুরুতে কয়েকজন বিখ্যাত মুফতি একত্রিত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে ছিলেন মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব, মুফতি মাহমুদ মুলতানি, আল্লামা বানুরি, মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবি, মুফতি আবদুল্লাহ মুলতানি প্রমুখ। প্রথম যুগে এই হজরতগণ একত্রে 'মজলিসে হাজিরা'কে এগিয়ে নিয়েছেন। তারা আধুনিক নানান সমস্যা নিয়ে প্রতিমাসে এক অথবা দুবার

আলোচনায় বসতেন। যেসকল মাসআলায় তারা এসব মজলিসে একমত হতেন, সেগুলো লিখিত আকারে ফতোয়া হিসেবে প্রকাশিত হতো। এভাবে মজলিসে হাজিরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। পরবর্তী যুগে এই কয়েকজন হজরতের সাথে আরো কয়েকজন মুফতি সাহেব যুক্ত হন। হজরত আবদুল্লাহ মুলতানি, মুফতি আবদুস সাত্তার মুলতানি, মুফতি আহমাদুর রহমান নিউটাউন প্রমুখ নতুনভাবে মজলিসে হাজিরার সদস্য নির্বাচিত হন। তারা সকলে মিলে কয়েক বছর যাবত এই মজলিসকে সারা পাকিস্তানে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলেন। জনজীবনের সকল জটিল আধুনিক সমস্যার নিরসন তাদের মাধ্যমে হতে থাকে। এ মজলিসের প্রভাব আলহামদুলিল্লাহ জনগণের মাঝে এত বেশি সৃষ্টি হয় যে, আধুনিক ইসলামিক গবেষণা সংস্থার কোনো ফতোয়াই পরবর্তীতে আর গ্রহণযোগ্যতা রাখেনি।

জমিয়তের আদর্শিক বিভাজন

পরবর্তীতে আমরা তৃতীয় পর্যায়ে মজলিসের সাথে যুক্ত হই। আমার ছাত্রাবস্থায় এই মজলিস তার দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম করছিল। সে সময় আমি আল্লামা বানুরিটাউনে তাখাসসুস ফিল ফিকহ্ পড়তাম। মজলিসে হাজিরার নিয়মিত বৈঠকগুলো তিনটি স্থানে হতো। দারুল উলুমে, নিউটাউনে এবং মুফতি রশিদ সাহেবের প্রতিষ্ঠানে। নিউটাউনে অধিকাংশ সময়ই কুতুবখানা অথবা অফিসকক্ষে মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। দারুল উলুমে হাজিরার মজলিস মেহমানখানায় অনুষ্ঠিত হতো আর মুফতি রশিদ আহমদ সাহেব হুজুরের নাজিমাবাদের পুরোনো মাদরাসার (আশরাফুল মাদারিস) বৈঠককক্ষে অনুষ্ঠিত হতো। আমি যখন তাখাসসুসের ছাত্র, তখন এ মজলিস একটি বড় মতপার্থক্যের কবলে পড়ে। সেসময় ৭০-এর নির্বাচন চলছিল। জুলফিকার আলি ভুট্টো সাহেব কৌশলগত কারণে আলিমদের রাজনৈতিক ধারাকে তার অনুকূলে রাখতে চাচ্ছিলেন। সেই হিসেবে তিনি জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তানকে নির্বাচনী ঐক্যের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শাসন সরিয়ে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আদর্শিকভাবে তিনি সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র মতবাদে বিশ্বাস করতেন। তিনি ইসলামি সমাজতন্ত্রের নামে একটি নতুন মতাদর্শের কথা নির্বাচনী ইশতেহারে ও নির্বাচনী জনসভায় আলোচনা করতে শুরু করেন। অত্যন্ত চটকদার মনে হলেও আদতে এটি ছিল তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসুলভ একটি কৌশল। সে সময় জমিয়তের সভাপতি ছিলেন আল্লামা গোলাম গওস হাজারবি। আর সেক্রেটারি পদ অলংকৃত করছিলেন মুফতি মাহমুদ মুলতানি। ভুট্টো

সাহেবের প্রস্তাবের পর এই দুই নেতার মাঝে দ্বিমত তৈরি হয়। হাজারবি সাহেবের মত ছিল, আমরা ইসলামি রাজনীতি ইসলামি পদ্ধতিতে তৈরি করব। অন্য কোনো মতাদর্শের সাথে লিয়াজোঁ করে ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এদিকে মুফতি মাহমুদ মুলতানির মত ছিল, ভুট্টোর সাথে নির্বাচনী ঐক্য তৈরি করলে ইসলামি মতাদর্শে তেমন প্রভাব পড়বে না। বরং ভুট্টোর সাথে ক্ষমতায় গেলে পরবর্তীতে আমরা ভুট্টোর দীনবিরোধী চিন্তাভাবনা পরিবর্তনের সুযোগ পাবো। কিন্তু আল্লামা হাজারবি মনে করতেন, সোশ্যালিজম একটি ভিন্ন মতাদর্শ এবং দীন। এটি এমন একটি দীন, যার চিন্তাধারা, আদর্শ, মৌলিক নীতি এবং লক্ষ্য ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন একটি কুফরি মতাদর্শের সাথে লিয়াজোঁ কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। পরবর্তী লাভ-ক্ষতি খেয়াল না করে বর্তমান বাস্তবতা সামনে রাখা উচিত। মূলত এই মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম দুটো ভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক ধারার জন্ম দেয়।

ভুট্টো-মাহমুদ লিয়াজোঁ

নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে ভুট্টোর সাথে মুফতি মাহমুদ মুলতানি সাহেব যুক্ত হন এবং তাদের ঐক্যজোট পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। ঠিক একই সময়ে পূর্ববঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে বিজয় লাভ করেন। তবু ভুট্টো তাকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে সুযোগ দেননি। ফলে অত্যন্ত দুঃখজনক ৭১ বাস্তবতায় আসে। ভৌগোলিকভাবে এত দূরত্বে থাকা দুটি ভূখণ্ড শুধুমাত্র আদর্শিক কারণে একত্র হয়েছিল। কিন্তু একটি পক্ষের অপর পক্ষের উপর জুলুম, ক্ষমতার অপব্যবহার, বৈষম্যমূলক নীতি তাদের বৃহত্তর ঐক্য বিনষ্ট করে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানরা তাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন করে নেয়। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি আলিমগণ মজলুম বাঙালির পক্ষেই অবস্থান নিয়েছিলেন। যদিও একটি মুসলিমরাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় মানসিকভাবে তারা ছিলেন ব্যথিত। এ বাস্তবতা সকলের সামনে স্পষ্ট থাকা উচিত।

যাই হোক, নির্বাচনে জয়লাভের পর ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং সীমান্তপ্রদেশে[৯৪] মুফতি মাহমুদ মুলতানি মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। মুফতি মাহমুদ

[৯৪]. বর্তমান খাইবার-পাখতুনখাওয়া (KPK) প্রদেশ।

মুলতানি ক্ষমতাগ্রহণের সাথে সাথেই স্বাধীনচেতা ও ধার্মিক পাঠানদের উপর ইসলামি আইন বাধ্যতামূলক করেন এবং সীমান্তপ্রদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করেন। স্থানীয় জনগণ তার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। মুফতি মাহমুদ মুলতানির দূরদর্শিতা এবং জনপ্রিয়তা কিছুদিনের মধ্যে ভুট্টোকে চিন্তিত করে ফেলে। সার্বিক পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ভুট্টো একবার সীমান্তপ্রদেশ সফরের পরিকল্পনা করছিলেন। ঠিক এই সময় মুফতি মাহমুদ তাকে চিঠি লিখে জানান, আপনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, এটি একটি বাস্তবতা। তবে আমি সীমান্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, এটিও একটি বাস্তবতা। স্থানীয় জনগণের প্রশাসক হিসেবে তাদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে জানাতে চাই, আমাদের সীমান্তপ্রদেশ ইসলাম বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। এখানে মদপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং একটি অমার্জনীয় অপরাধ। ফলে আপনি আমার মেহমান হিসেবে যতদিন সীমান্তপ্রদেশে থাকবেন, ততদিন এই হারাম বস্তুটি কল্পনাতেও আনতে পারবেন না। অন্যথায় স্থানীয় জনগণের আদালতে আপনাকে দাঁড়াতে হতে পারে। মুফতি মাহমুদের এমন কঠোর চিঠিতে ভুট্টো অত্যন্ত হতচকিয়ে যান। সে দফা তিনি আর সীমান্তপ্রদেশ সফরে যাননি। এরপরে আরো বেশ কয়েকবার দুজনের মাঝে চিঠিপত্র ও ফোনালাপ সংঘটিত হয়। ভুট্টো এ কথা বারবার বলেছেন, বর্তমান সময়ের পৃথিবীতে আমার মতো কৌশলী রাজনীতিক আর দ্বিতীয়জন নেই এবং এই মৌলবির মতো বিজ্ঞ ও কৌশলী রাজনীতিক মোল্লাও দ্বিতীয়টি নেই। মুফতি মাহমুদ মুলতানির সাথে ভুট্টোর মতানৈক্য ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে ভুট্টো-মুফতি মাহমুদের মাঝে চরম মতপার্থক্য হওয়ায় তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যান। মজলিসে হাজিরার সাথে এই পৃথক হওয়ার একটি যোগসূত্র ছিল।

ভুট্টো পাকিস্তানে সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন। সোশ্যালিজমের মতে, জনগণের কোনো জমিদারি স্বত্ব থাকতে পারবে না। রাষ্ট্রের সকল ভূমির কর্তৃত্ব শুধুমাত্র রাষ্ট্রের থাকবে। এই আইন মুফতি মাহমুদকে অত্যন্ত বিচলিত করে। মজলিসে হাজিরায় এই বিষয়টি আলোচিত হলে সকলেই একে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন এবং ভুট্টোকে প্রতিহত করতে মুফতি মাহমুদকে অনুরোধ করেন। এরপরই মুফতি মাহমুদ অত্যন্ত সোচ্চার হন এবং দুজনের মাঝে রাজনৈতিক লিয়াজোঁর ইতিহাস সমাপ্ত হয়।

মজলিসে অংশগ্রহণ

এরপর যখন আমি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাই, তখন মজলিসে হাজিরার তৃতীয় পর্যায় চলছিল। নিউটাউন থেকে আল্লামা মুফতি আহমাদুর রহমান, মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি এবং আল্লামা বানুরি এই তিনজন তখন মজলিসে নিয়মিত অংশ নিতেন। ততদিনে মুফতি শফি সাহেব ইনতেকাল করেছিলেন। দারুল উলুম থেকে সেজন্য দুই ভাই শুধু অংশ নিতেন। নিউটাউনে কখনো আল্লামা বানুরি উপস্থিত না থাকলে আমি উপস্থিত থাকতাম। আমাদের সময় জাকাত প্রদানকেন্দ্রিক একটি ফতোয়া অত্যন্ত আলোচিত হয়ে ওঠে। মূল ঘটনা হলো, পাকিস্তান সরকার জেনারেল জিয়াউল হকের সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে জাকাত গ্রহণ করে তা আদায়ের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছিল। সেই লক্ষ্যে তারা বেশকিছু মুফতি সাহেব থেকে ফতোয়া গ্রহণ করেছিল। এই বিষয়টি যখন মজলিসে উপস্থাপিত হয়, তখন অধিকাংশ মুফতি সাহেব এর বিরোধিতা করেন। তাদের যুক্তি ছিল, রাষ্ট্র যতক্ষণ না সম্পূর্ণ আমানতদারি ও দরদি মনোভাব প্রদর্শন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর আস্থা রেখে জাকাত প্রদান করা সম্ভব নয়। এটি একটি ফরজ বিধান। এর খাতসংখ্যা নির্দিষ্ট। এটি আদায় করা জনগণের উপর প্রথমত ব্যক্তিগতভাবে ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু যখন শাসনভার ইসলামি হুকুমত ও পরিপূর্ণ ইসলামি শাসকের হাতে থাকবে, তখনই শুধু জাকাত কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু মুফতি তাকি সাহেব এবং মুফতি রফি সাহেবের মত ছিল ভিন্ন। তারা কুরআন ও হাদিসে ইসলামি শাসকের সকল গুণাবলি তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকদের জন্য ব্যবহার করছিলেন। তাদের মত ছিল, কেন্দ্রীয়ভাবে জাকাত গৃহীত হলে জনকল্যাণমূলক কাজ অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কিন্তু অন্য মুফতিরা এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন। একজন মুফতি সাহেব (আমি তার নাম উল্লেখ করব না) কিছুটা ক্রোধান্বিত হয়ে এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলেন, যেই সরকার কাদিয়ানিদের কাফের হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারে না, তারা কীভাবে জাকাত গ্রহণের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে আমানতদারি বজায় রাখতে পারবে? এটি সম্পূর্ণরূপে একটি বোকামি সিদ্ধান্ত হবে। এই বলে তিনি মজলিস থেকে উঠে চলে যান। এতে করে মাসআলাটি মজলিসে হাজিরার কাছে অমীমাংসিত রয়ে যায়। কিন্তু সরকারি চাপ বাড়তে থাকায় একদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের লক্ষ্যে নিউটাউনে মজলিসের আয়োজন করা হয়। মজলিসে মুফতি মাহমুদ মুলতানিও উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি একসময় ভুট্টোর সাথে

লিয়াজোঁ করলেও এই সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তার মত ছিল, কেন্দ্রীয়ভাবে জাকাত প্রদান বৈধ হবে না। সেজন্য তিনি এই মতের পক্ষে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণসহ ২ ঘণ্টা আলোচনা করেন। আল্লাহর কী শান! সেদিনই তার ইনতেকাল হয়ে যায়। ফলে মাসআলাটি অমীমাংসিত থাকা অবস্থাতেই এই মজলিসের ঐতিহ্যবাহী ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়।

মতের অমিল

এ ছাড়াও বিগত সময়ে আরো কিছু মাসআলায় মজলিস একমত হতে পারেনি। মুফতি তাকি এবং মুফতি রফি উসমানি হাফিজাহুমুল্লাহ ভ্রাতৃদ্বয় আধুনিক মাসআলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শিথিল আচরণের অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। অপরদিকে মুফতি রশিদ সাহেব এবং মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব আধুনিক মাসআলায় কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করার পক্ষে ছিলেন। ফলে অধিকাংশ আধুনিক মাসআলায় মজলিস দ্বিমতের সাথে সমাপ্ত হতো। তাই এটা সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র যে, মজলিসের ধারাবাহিকতা যেকোনো দিন সমাপ্তির মুখ দেখবে। জাকাত-কেন্দ্রিক ইস্যুতে মুফতি মাহমুদের ইনতেকালের ফলে সেই সমাপ্তিরেখা সূচিত হয়।

মূলত মতপার্থক্যের ধারাবাহিকতা বহুদিন পূর্ব থেকেই চলে আসছিল। মানবদেহের অঙ্গ প্রতিস্থাপন বৈধ কি না এই মাসআলাতে মজলিস অনেক বড় মতপার্থক্যের শিকার হয়। দারুল উলুম করাচির মুফতিদের মত ছিল, এটি বৈধ হওয়া প্রয়োজন। সময়ের বাস্তবতা এটিকে অনেক কল্যাণকর প্রমাণিত করেছে। কিন্তু অন্যান্য মুফতি সাহেব এই মাসআলায় একমত ছিলেন না। ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে, দারুল উলুমের মুফতি আবদুর রউফ এবং নিউটাউনের মুফতি আবদুস সালাম আলোচ্য বিষয়ে দুটো প্রবন্ধ লিখবেন। প্রবন্ধদুটি পরবর্তী মজলিসে উপস্থাপিত হবে। এরপর চূড়ান্ত ফয়সালা গ্রহণ করা হবে। সেই হিসেবে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। বিস্তারিতভাবে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করি যে, সাময়িকভাবে এটি কল্যাণকর মনে হলেও পরবর্তীতে এটি অসাধু ব্যবসায়ী ও অযোগ্য ডাক্তারদের ব্যবসায় পরিণত হবে। সাধারণ মানুষ নিজেদের অজান্তেই অপারেশন করাতে গিয়ে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো হারাতে থাকবেন। আমার প্রবন্ধটি প্রায় শত পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ছিল। মুফতি আবদুর রউফ সাখরাবি সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন; কিন্তু সেটি মাত্র বিশ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছিল। তবে পরবর্তী মজলিসে দুপক্ষ পূর্বের মতোই দ্বিমত পোষণ করেন এবং নিজ নিজ মতের উপর অটল থাকেন।

জাকাতের মাসআলাতেও দারুল উলুম ব্যতীত সকল মুফতি সাহেব সরকারকে জাকাত দিতে একমত ছিলেন না। এই বিষয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যা সে-সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'জাকাত একটি ফরজ বিধান, কোনো ট্যাক্স নয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি ব্যাপক সাড়া ফেলে। মোটকথা আধুনিক প্রতিটি মাসআলাতেই দারুল উলুমের মুফতিগণ এবং অন্যান্য মুফতির মাঝে প্রতিনিয়ত মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছিল।

ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিংপ্রশ্নে চরম মতপার্থক্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়। মজলিসের সকল মুফতি একমত ছিলেন যে, সময়ের বাস্তবতা যত কঠিনই হোক ইসলামি ব্যাংকিং নামে কোনো বিষয়ে তারা একমত হবেন না। কেননা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মেরুদণ্ড এই ব্যাংকিং সিস্টেমকে ইসলামিকরণ করার অর্থই হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়া। কিন্তু দারুল উলুমের ভ্রাতৃদ্বয় ইসলামি ব্যাংকিং সমর্থন করছিলেন এবং ইসলামি ব্যাংকিংয়ের উপর নির্ভর করে অর্থনীতির মূলধারা তৈরির পক্ষে ছিলেন। এসব বিষয়ে মুফতি তাকি উসমানি সাহেবের গবেষণাগুলো এখন অবশ্য সারাবিশ্বে সমাদৃত হয়েছে; কিন্তু আদতে অন্যদের সাথে এখানে আজও মতপার্থক্য রয়ে গেছে। ফলে দেখা গেল, প্রতিটি মাসআলায় মজলিস দ্বিমত পোষণ করছে এবং কোনো সমাধান না হয়েই মজলিসগুলো সমাপ্ত হচ্ছে।

সর্বশেষ জাকাতের মাসআলায় দ্বিমত পোষণ ও মুফতি মাহমুদের ইনতেকালের ফলে মজলিসে হাজিরার ধারাবাহিকতা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়।

মুফতি মাহমুদের ইনতেকাল

মুফতি সাহেবের ইনতেকাল মজলিসেই হয়েছিল—একথা ইতিপূর্বে বলেছি। আজ শুধু ইনতেকালের ঘটনাটি তুলে ধরছি।

জাকাতের মাসআলায় মজলিস একমত হবার লক্ষ্যে পুনরায় একদিন নিউটাউনে একত্রিত হয়। মুফতি মাহমুদ সাহেবসহ আকাবির মুফতি সাহেবরা সরকারকে জাকাত দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেদিনের আলোচনায় শুরুতে তিনিই প্রায় দুঘণ্টার দলিলসমৃদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন। এই পক্ষের মুফতি সাহেবদের পক্ষ থেকে তিনি বিষয়ের হক আদায় করে দেন। জোহরের সময় হয়ে আসছিল। মুফতি সাহেবের আলোচনার পর সকলের একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সামান্য বিরতি দেওয়া হয়। এই সময় মুফতি তাকি ও রফি উসমানি সাহেবদের সামনে পান পরিবেশন করা হয়। সিন্ধি মুহাজিররা পানে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিলেন। যেকোনো সময় তারা পান খেতে পারতেন!

হিন্দুস্থানি সংস্কৃতির এই রূপ পাকিস্তানে বলা যায় নতুনই ছিল। মুফতি সাহেব একটি বালিশে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এসময় মুফতি তাকি সাহেব তাকে একটি পান মুখে নেওয়ার প্রস্তাব করেন। মুফতি সাহেব পানে অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু মুফতি তাকি সাহেবের অনুরোধে পান মুখে নেন। এসময় তিনি খালি পেটে ছিলেন। জর্দাওয়ালা পান সাথে সাথে তার অনভ্যস্ত পাকস্থলিতে বিক্রিয়া শুরু করে। মুহূর্তেই কাতরাতে থাকেন মুফতি মাহমুদ মুলতানি। বসে থাকাবস্থাতেও মাথা ঘুরানো শুরু হলে তিনি বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়েন। হন্তদন্ত হয়ে উসমানি ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য খাদেম তাকে সোজাভাবে শুইয়ে দেন। একজন ছাত্রভাই ডাক্তার আবদুর রাযযাক ইস্কান্দার সাহেবকে ডেকে আনে। তিনি দৌড়ে এসে নাড়ী পরীক্ষা করে জানান নার্ভ খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। কিন্তু মুফতি সাহেবের খালিপেটে পান-জর্দা এত বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, তিনি মৃত্যুকালীন যাতনা অনুভব করতে থাকেন। মুখ দিয়ে 'ফাতায়ালাল্লাহুল মালিকুল হাক্ক' এই আয়াত বের হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহর বান্দা মরদে মুমিন ও মুজাহিদ আখেরাতের পথে যাত্রা করেন। আমি সেসময় নামাজ পড়াতে উসমানিয়া মসজিদে গেছিলাম। ফিরে দেখি মুফতি সাহেব আর নেই! আহ! মুফতি সাহেব! রহিমাকাল্লাহ!

পরবর্তীকালে সরকার তাঁর মৃতদেহ সসম্মানে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে মুলতানে নিয়ে যায়। করাচি থেকে অসংখ্য আলিম সরকারি বিমানে তাঁর জানাজা পড়ে আসেন। এ ছাড়াও একটি জানাজা নিউটাউনে আরেকটি নিজ এলাকা ডেরা ইসমাইল খানে অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই নামটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই মানুষটির হাত ধরেই কাদিয়ানিরা আনুষ্ঠানিকভাবে কাফির হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার নতুন দিগন্ত

এরপর শুরু হয় আধুনিক সমস্যাদি নিয়ে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গবেষণার একটি নতুন যুগ। দারুল উলুম তার নিজস্ব চিন্তাধারার অধীনে আধুনিক সমস্যাগুলো নিয়ে গবেষণা শুরু করে। তাদের ফতোয়াগুলো যেহেতু সরকারি চিন্তাধারার সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, তাই সরকার তাদেরকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উঁচুপদে দায়িত্ব দিতে শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায় মুফতি শফি সাহেবের সুযোগ্য পুত্রগণ একে একে সরকারের নানা উঁচুপদে আসন গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তাদের গবেষণাপ্রসূত চিন্তাধারা বাস্তবায়ন করা শুরু করেন। মুফতি তাকি সাহেব ইসলামি শরিয়াহ কোর্টে

চাকরি গ্রহণ করেন। ইসলামি ব্যাংকিং এবং এ বিষয়ে তারা তাদের চিন্তাধারা সরকারের সাথে আলোচনা করে একটি ইসলামি অর্থনীতির সূচনা করার চেষ্টা করেন। এভাবে তাদের কয়েকজন ভাই সরকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। আমার ধারণা আজও এই ধারা তারা অব্যাহত রেখে দেশ, জাতি ও উম্মাহর যথাসাধ্য খেদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। বারাকাল্লাহু ফিহিম!

এদিকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের গবেষণা অব্যাহত রাখে এবং মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তাদের ফতোয়া সারাবিশ্বে প্রচার করে থাকে। নিউটাউনের দারুল ইফতা বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় দারুল ইফতা। সারাবিশ্ব থেকে আগ্রহী মুসলিম ভাই ও বোনেরা ইফতার সেবা গ্রহণ করে থাকে। সরকারের সাথে মতের মিল না হওয়ায় প্রথম যুগ থেকেই নিউটাউন তার নিজস্ব গবেষণা নিজ দায়িত্বেই প্রচার ও প্রসার করে আসছে। তবে সরকারের সাথে সম্পৃক্ত না থাকায় তারা প্রয়োজন অনুপাতে কঠোর ব্যবস্থা ও প্রতিবাদমূলক অবস্থান সহজেই গ্রহণ করতে পারেন।

ফোকলা ইসলামি ব্যাংকিং

ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে বর্তমান সময়ে অনেক গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ গবেষণায় ব্যাংকিং খাতকে ইসলামিকরণের চেষ্টাই চালানো হয়েছে বলে মনে হয়। তবে আলহামদুলিল্লাহ নিউটাউনের প্রাতিষ্ঠানিক, দেশের শতকরা নব্বইভাগ মুফতি এবং আমার ব্যক্তিগত মত হলো, ব্যাংকিং খাতের মতো সম্পূর্ণ ইহুদি মস্তিষ্কপ্রসূত একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ইসলামিকরণ করার কোনো যুক্তি নেই। ইসলাম তার নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে হাজার বছর পৃথিবী পরিচালনা করে দেখিয়েছে। তাওয়াক্কুলবিহীন এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি বর্তমান বিশ্বের মানুষকে স্থবিরতার চরম সীমায় নিয়ে গেছে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে আখেরাতের অবস্থান থাকলেও এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির কারণে মুসলিমসহ সকল ধর্মের মানুষ আখেরাতকে ভুলতে বসেছে। সত্য বলতে, মুসলিম ব্যতীত কোনো ধর্মের মানুষই আর আখেরাতের বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে লালন করে না। ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের উপর আমি সামান্য গবেষণার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়ে আমার একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে।[৯৫]

আমাদের দেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে যে ধারণা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মোটেই ইসলামি নয়। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছি, এ দেশের

---

৯৫. ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থনীতি-মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী

অত্যন্ত বিজ্ঞ মুফতিগণ কীভাবে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মতো নিরেট সুদি পদ্ধতিকে এভাবে জনপ্রিয় করছেন। মুফতি তাকি সাহেব ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে তার একটি মত এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ৩০% সুদি লেনদেন হয়। এ ছাড়া অন্যান্য লেনদেন স্বাভাবিকভাবেই করা যায় এবং করা সম্ভব। যদিও আমি এই মতের সাথে একমত নই। মনে রাখতে হবে, মুফতি তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহুম একজন বিশ্বমানের গবেষক। তবে সবক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা সারাবিশ্বের একমাত্র ফতোয়া নয়। এদেশে তাঁকে একজন ইমামের মর্যাদা দিয়ে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর মতকেই ইসলামের একমাত্র মত ও ফতোয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়; এই ব্যাপারটা আমাকে খুবই অবাক করে।[৯৬] আধুনিক মাসায়িল আলোচনা ও প্রচারের সময় সমকালীন জমহুর আলিমের মতামতে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়, এগুলো বিজ্ঞ আলিমদের খেয়াল করা উচিত। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছি, মুফতি তাকি সাহেব কিছু পার্থক্য দেখালেও এদেশের বিজ্ঞ মুফতিগণ ব্যাংকিং খাত ও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মাঝে তেমন কোনো পার্থক্যই খুঁজে পাননি। শুধুমাত্র তারা পুঁজিবাদী ব্যাংকার সোসাইটির অনুরোধে ব্যাংকিং নামের লোগোর উপর ইসলামি শব্দের রং চড়িয়ে দিয়েছেন। মুফতি আবদুর রহমান সাহেব, পটিয়ার মুফতি শামসুদ্দীন সাহেবসহ অনেকেই আমাদের দেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের পুরোধা হিসেবে পরিচিত। তারা যেহেতু এসব অভিধায় পরিচিত, তাই আমি তাদের নাম উল্লেখ করলাম। আমি তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে এ কথা বলতে পারি যে, ব্যাংকিং খাতকে ইসলামিকরণ করা মোটেই উচিত হয়নি। এটি উম্মতকে আল্লাহর রহমত থেকে এবং কবুলিয়ত অর্জন থেকে বহুদূরে ঠেলে ফেলেছে।

দুঃখজনক স্মৃতি

আমি দেশে ফিরে আসার পর বহু প্রতিষ্ঠান বহু ধরনের প্রলোভন ও প্রস্তাব আমাকে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মতো দুর্বল মানুষের পক্ষে নীতির বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দেশের একজন বিখ্যাত মাওলানা সাহেব—যিনি মুফতি হিসেবে ততধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইফতা না পড়েও যিনি মুফতিপদবি গ্রহণ করেছিলেন—আমাকে একবার এই চোরাবালিতে আটকানোর জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। শুনলাম

[৯৬]. সমকালীন বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞদের মাঝে গবেষণার পদ্ধতিগত বিষয়ে ভিন্নমতকে নিছক একাডেমিক মতানৈক্য হিসেবেই দেখা উচিত। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দলিলনির্ভর পক্ষপাত শ্রদ্ধার সাথে পালনযোগ্য।

ভদ্রলোক ইনতেকাল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করুন। তার নেক কাজগুলো কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন।

আমাকে একবার তিনি ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। আমি সে সময়ে ঢাকাতেই অবস্থান করছিলাম। ফরিদাবাদ মাদরাসায় আমার এক সাথির কাছে দুয়েকদিনের জন্য মেহমান হয়েছিলাম। মাওলানা সাহেব এই সংবাদ জানতে পেরে আমার সাথে দেখা করতে আসেন। গল্পে গল্পে তিনি একটি প্রস্তাব রাখেন। তিনি জানান আগামী অমুক দিন একটি ইলমি কনফারেন্স আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে আপনি একজন আলোচক ও অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অন্যান্য আকাবির আলিমও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। ইসলামি অর্থনীতির উপর আপনার গবেষণা থেকে আমরা উপকৃত হতে চাই। আমি তার এই প্রস্তাবে সাধুবাদ জানিয়ে একমত হই। কিন্তু মাওলানা সাহেব প্রস্থান করার পরেই আমার মস্তিষ্কে একটি খেয়াল আসে! আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি মাওলানা সাহেব ইসলামি অর্থনীতির ব্যাপারে ব্যাংকিং পদ্ধতির একজন সমর্থক ও প্রচারক মনীষা! এদেশে তিনি এই মতকে তার পত্রিকা ও লেখনীর মাধ্যমে অত্যন্ত জোরালোভাবে হাওয়া দিয়েছেন। তখনই আমি বুঝতে পারি আমাকে এই কনফারেন্সের দাওয়াত দিয়ে হয়তো কোনোভাবে তাদের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ানো হবে। কলমের আঁচড় বা আলোচনার ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে তা প্রচারও করা হতে পারে। এটি মন্দ ধারণাপ্রসূত কোনো ধারণা নয়। কেননা আমি মাওলানা সাহেবের এই অভ্যাসের ব্যবহার নিয়ে নিজেই ভুক্তভোগী ছিলাম।

একবার তিনি আমাকে করাচিতে সাক্ষাত করে জানান যে, ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে তিনি আমার কয়েকটি প্রবন্ধ ও কিতাব অনুবাদ করে বাংলায় প্রচার করতে চান। আমি তাকে সরলভাবে অনুমতি প্রদান করি। কিন্তু তিনি এরপর প্রস্তাব রাখেন আমার লেখাতে যদি কোনো কিছু তার কাছে আপত্তিকর বা সংশোধনমূলক মনে হয়, তাহলে তিনি সেটি পরিবর্তন বা টীকা আকারে ব্যাখ্যা করবেন। আমি সাথে সাথে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। কেননা তার ব্যাপারে আমি জানতাম তিনি কোনো অভিজ্ঞ মুফতি তো ননই; বরং তিনি কোনোদিন কোনো অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবের কাছে ইফতার পড়াশোনাও করেননি।

একবার তার সাথে দেখা হলে আমি তাকে এটি জিজ্ঞাসা করি। তিনি জানান, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আল্লামা শাইখ জাফর আহমদ উসমানি সাহেবের কাছে ইফতা পড়েছি। আমি তাকে হেসে জানাই, আপনি মুহাদ্দিস সাহেবের কাছে ইফতা কীভাবে পড়েছেন!? এভাবে কখনো মুফতি হওয়া যায় না মাওলানা সাহেব!

যা হোক, আমি আমার সাথির মাধ্যমে কনফারেন্সে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত আদবের সাথে অপারগতা প্রকাশ করি। আমার এই আচরণে মাওলানা সাহেব অত্যন্ত ব্যথিত হন বলে তিনি পরবর্তীতে আমাকে জানান। কিন্তু আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলাম একথা শুনে যে, তিনি একজন প্রবীণ মুফতিকে এ কথা বলেছেন, মুফতি আবদুস সালাম হুজুরকে আমি ৫০ হাজার টাকা খরচ করে দাওয়াত করেছিলাম। তিনি আমার পরিশ্রমের কোনো তোয়াক্কা না করেই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অথচ সেখানে অন্যান্য আলিমের উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। আমার বিশেষ উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সেই প্রোগ্রামে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা আমার জানা ছিল না। তিনি আমাকে এসব কিছু না জানিয়েই অন্যদের কাছে কীভাবে এমন কথা বলতে পারলেন! আল্লাহ তায়ালা তাকে ও আমাকে ক্ষমা করুন!!!

আলোচিত মরহুম মাওলানা সাহেবকে আমরা সবাই মহব্বত করি। ভালোবাসি অন্তর থেকে। কিন্তু বিষয়টি হলো, সরলমনা আলিমদের সাথে কৌশলী আচরণ প্রায়শই হয়ে থাকে। সবখানে সবযুগে। ঘটনাগুলো শুধু তাদের জন্য সতর্কতারমূলক নিয়তে বলে গেলাম। আশা করি সবাই ইতিবাচকভাবে নেবেন।

নিউটাউনের পত্র-পল্লব

নিউটাউনের শাখা-প্রশাখা কতগুলো, কীভাবে পরিচালিত হয় কার্যক্রম অনেকেই জানতে চান বিধায় একটু বলে যাচ্ছি।

নিউটাউন মূলত জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরিটাউন করাচিতে অবস্থিত। আল্লামা ইউসুফ বানুরি এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার সুযোগ্য জামাতা মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবের সময়ে এই মাদরাসার বেশ কয়েকটি, আমার ধারণা ৩টি শাখা তৈরি হয়। এরপর পরবর্তী মুহতামিম আল্লামা ড. হাবিবুল্লাহ মুখতার সাহেবের সময় ১০টি শাখা তৈরি হয়। প্রতিটি শাখাতেই প্রায় দেড় হাজারের অধিক ছাত্রভাই পড়াশোনা করতেন। বর্তমানে তো অবশ্যই আরো বেশকিছু শাখা তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। এই শাখাগুলোতে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিটি শাখাতেই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হতো এবং শিক্ষকরাও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানেই আবাসিক সুবিধায় অবস্থান করতেন। অন্যান্য প্রত্যেকটি শাখা মিশকাত জামাত পর্যন্ত চালু আছে। এই শাখাগুলোর সার্বিক খরচ বানুরিটাউনের কেন্দ্রীয় দফতর বহন করে থাকে। দাওরা হাদিসের বছরে সকলেই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে চলে আসেন। নিউটাউনের দৈনন্দিন রুটিনের ব্যাপারে এবং ছাত্র-শিক্ষকের সুবিধার ব্যাপারে সম্ভবত আমি অন্য কোথাও আলোচনা করেছি। নমুনাস্বরূপ নিউটাউনকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনি চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করতে পারেন।

বানুরিয়া আলামিয়া! সাইট অ্যারিয়া

বানুরিয়া আলামিয়া নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইনে অত্যন্ত পরিচিত। অনেকেই ভেবে থাকেন এই প্রতিষ্ঠানটি কি নিউটাউনের শাখা নাকি এর অন্য কোনো পরিচিতি রয়েছে? তাদের জ্ঞাতার্থে তথ্যটি জানিয়ে দিচ্ছি।

এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতি নাঈম সাহেব, যিনি আমার সুযোগ্য শাগরেদ। যে বছর আমি কানযুদ দাকাইক পড়ানোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম এবং ৫ জন ছাত্রভাইকে সর্বোচ্চ নম্বরের জন্য পুরস্কৃত করেছিলাম, এই মুফতি নাঈম সাহেব তাদের একজন ছিলেন। এই মাওলানার পরিবার মাত্র একপ্রজন্ম পূর্বে বিভ্রান্ত ইসলাম থেকে সহিহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার বাবা অনেক বড় মুবাল্লিগ, দায়ী এবং কারি ছিলেন। তিনি বহুদিন আমেরিকায় বসবাস করেছেন। ফলে বিশ্বব্যাপী তার একটি পরিচিতি তৈরি হয়। তার প্রতিষ্ঠানের মৌলিক লক্ষ্য হলো, সারা বিশ্বের সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলো থেকে মুসলিম সন্তানদের গ্রহণ করে আদর্শ আলিম তৈরি করা, যাতে তারা নিজ নিজ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা মুফতি নাঈম সাহেবের হায়াত ও কার্যক্রমে ভরপুর বরকত দান করুন।[১৭] আমিন।

জনগণের সেবায় নিউটাউন

নিউটাউনে খণ্ডকালীন কোর্স সম্পর্কে কিছু স্মৃতি মনে পড়ছে। সামান্য আলোচনা হোক।

নিউটাউনে সারাবছর নিয়মিত পড়াশোনা চলত। ছুটির সময় বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হতো। এখানে তারা দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল, দোয়া-দরুদ এবং সুরা-কেরাত শিক্ষা করতেন। ছুটির সময় যেসকল উসতাদ স্থানীয় হবার কারণে অথবা অত্যন্ত দূরদেশে বাড়ি হবার কারণে মাদরাসায় অবস্থান করতেন, তারাই এই কোর্সগুলো পরিচালনা করতেন। এই কোর্সগুলো সাধারণ জনগণকে অত্যন্ত উপকৃত করেছে।

আর রমজানে মাসব্যাপী বিভিন্ন কোর্স অনুষ্ঠিত হতো। এগুলো ছিল সবই বিশেষায়িত কোর্স। যেমন বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন, তাফসির, আরবি ব্যাকরণ কোর্স ইত্যাদি। আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তি তাফসিরশাস্ত্রের একজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। রহিম ইয়ারখানে তার একটি মাদরাসা ছিল, যেখানে রমজান মাসে

---

[১৭]. অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, বিগত ২০শে জুন ২০২০ তারিখে এই ক্ষণজন্মা মনীষী ও শিক্ষাবিদ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনী দেখতে এই ভিডিওটি দেখুন। https://www.youtube.com/watch?v=MmiT93WfgSo

তাফসিরের উপর বিশেষভাবে একটি কোর্স অনুষ্ঠিত হতো। এই প্রোগ্রাম সারা পাকিস্তানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বিখ্যাত হয়েছিল। আল্লামা আহমদ আলি লাহোরি থেকেই এই কোর্সের সূচনা। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তার সাক্ষাত লাভ করতে পারিনি। তবে আবদুল্লাহ দরখাস্তির সাথে আমি সাক্ষাত করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। যেসকল ভাই নিউটাউনের কোর্সগুলোতে অংশ নিতেন, তাদেরকে মাস শেষে একটি ভাতা, ঈদি এবং একসেট করে জামা দেওয়া হতো!! আমাদের দেশে রমজান মাসে যেসকল কোর্স অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সম্ভবত অংশগ্রহণকারীদের থেকে উলটো উচ্চমূল্যের ব্যয়ভার বা কোর্স-ফি গ্রহণ করা হয়। এটি নিউটাউনে কখনোই কল্পনা করা যায় না। আশা করি আমাদের দেশেও কিছু হাদিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে কোর্স পরিচালকরা ভাববেন।

এজন্য আপনাদেরকে আমি বারবার বলেছি একটি আদর্শ ও যুগোপযোগী কওমি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিউটাউনকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করা যায়।

তিলকাল আইয়াম

করাচি থাকাকালীন সময়ে আকাবিরদের অনেকের সাথে প্রচুর স্মৃতি রয়ে গেছে। সময় পেলে একদিন বিস্তারিত বলতে চাই। এখানে খুব সংক্ষেপে টুকরো কিছু স্মৃতি আলোচনা করছি।

আমি যখন বানুরিটাউন করাচিতে ভর্তি হই, তখন সেখানে পাকিস্তানের প্রথম যুগের সকল আকাবির জীবিত ছিলেন। সকলেরই আসা-যাওয়া ছিল নিউটাউনে। সেই সুবাদে সবাইকেই দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নিউটাউনে তো আমার সবচেয়ে বেশি সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে হজরত মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেবের। আল্লামা ইউসুফ বানুরির সাথেও খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি ব্যবস্থাপনার কাজে বেশি ব্যস্ত থাকতেন, বিধায় আমি তাঁর সান্নিধ্য মনভরে খুব কমই গ্রহণ করতে পেরেছি। এ ছাড়া ইদরিস মিরাঠি সাহেব হুজুরের সাথে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। উনি খুব সূক্ষ্ম মেজাজের মানুষ ছিলেন। পরীক্ষার খাতাতেও তাঁর এই মেজাজের ছাপ পড়ত। আমি প্রথম ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় তাঁর খাতায় ৬০ নম্বর পেয়েছিলাম। বেশি পেতে পারতাম এমন একটি মনোভাব নিয়ে উনার সাথে দেখা করতে গেলে উনি নম্বর শুনে হেসে বললেন, আমার খাতায় ৬০ মানে অন্যের খাতায় ৯৫; বুঝেছ? আগামীতে আরো ভালো করে লিখবে। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুব মহব্বত করতেন। উনিই আমাকে তাখাসসুস ফিল হাদিসের কামরায় বসে অধ্যয়নের অনুমতি দিয়েছিলেন। এই সময়টাতেই আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এত বেশি অধ্যয়ন করার সুযোগ হয় যে, আমি সেজন্য আজও আল্লাহর শুকরিয়া

আদায় করি। আমার যখন দাওরার বছর চলে তখন তিনি বেফাকের চেয়ারম্যান ছিলেন। পরবর্তী বছর তিনি তাখাসসুস ফিল হাদিস বিভাগের দায়িত্ব বুঝে নেন আল্লামা বানুরির নিকট থেকে। ফলে বেফাকের দায়িত্বটি ছেড়ে দেন সেসময়। দাওরার পর আমি ফিকহের উপর তাখাসসুস করি। আমার গবেষণাপত্রটি আল্লামা ইসহাক সন্ধলবি দেখে দিয়েছিলেন। উনার কাছে আমরা হুজ্জাতুল্লাহ পড়েছিলাম। এই মানুষটি দীর্ঘ সময় ক্লাস নিতে পারতেন। এমনকি টানা ছয় ঘণ্টাও তাকরির করতে পারতেন। সুবহানাল্লাহ।

আহমাদুর রহমান সাহেব ছিলেন বানুরি সাহেবের জামাতা। উনি বড় মুফতি ছিলেন। উনার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আমার। রসিক মানুষ ছিলেন। বানুরির পরে উনিই নিউটাউনের মুহতামিম ছিলেন। আমি তখন নায়েবে মুফতির পদ গ্রহণ করি। পরবর্তীতে আমি সুপারিশ করে আরো দু'তিনজনকে দারুল ইফতায় নিয়েছিলাম। এদের সবাই এখন ভালো অবস্থানে থেকে খেদমত করে যাচ্ছেন। একজন ছিলেন মুফতি আবদুল কাদির। আরেকজন মুফতি ইনআমুল হক। অপরজন মুফতি শিহাবুদ্দীন। এরা সবাই নানা সময়ে আমার সহযোগী ছিলেন। আমার ফালিজের (প্যারালাইসিস) বছর শেষোক্তজন দেশে চলে যান। মুফতি ইনআম খুব ভালো লেখক ও আলিম। উনি এই পর্যন্ত প্রায় আশির অধিক কিতাব রচনা করেছেন। মুফতি আবদুল মজিদকেও আমি নিয়োগ দিয়েছিলাম। পরে তাকে শহিদ করে দেওয়া হয়। এখন ইনআম সাহেব সেখানে প্রধান মুফতি। তিনি সম্প্রতি জাকাতের উপর বিস্তারিত একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লিখেছেন। নজরে সানির জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এই যে- এটি আমার সামনে রয়েছে এখন।

মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি সাহেবের বড়ভাই মাওলানা হামিদ মিয়াঁ সাহেব ছিলেন নাজিমে তালিমাত। উনার সাথেও খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ভর্তির পর আমাকে একবার চা খেতে ডেকেছিলেন। আমি লজ্জায় ভুলভাল করে ফেলেছিলাম। সেই স্মৃতি এখনো মনে পড়লে হাসি পায়। উনিও ক্লাসের ফাঁকে আমার দিকে তাকালে মুচকি হাসতেন। আরেকজন ছিলেন মাওলানা ফজল মুহাম্মদ সোয়াতি সাহেব। উনি খুব দরবেশি জীবন যাপন করতেন। লম্বা জামা পড়তেন। আমাদের দেশের আকাবির শিক্ষকদের মতো। আমি উনার পোশাকের জন্য শুরুতে উনার পেছনে পেছনে ঘুরতাম। ভাবতাম অন্তত একজন দেশীয় মানুষ পাওয়া গেছে! মানুষ হিসেবে খুবই সরল ও মুত্তাকি ছিলেন।

মূলত সকল আসাতিজার সাথেই আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। অপরিচিত বা যোগাযোগ হয় না এমন কেউ ছিলেন না। এমন নাহলে দীর্ঘ তিন দশক খেদমত করা সহজ বিষয় নয়। আমার উপর এতেমাদ (নির্ভরতা ও অগাধ আস্থা) ছিল তাদের।

মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব খুব চুপচাপ থাকতেন। কম কথা বলতেন। ইদরিস সাহেব হাসি-মজা করতেন আমার সাথে। আদেশ-উপদেশও দিতেন। এই আকাবিরদের থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার জীবনের সকল পাথেয় আমি পেয়েছি তাদের খেদমতে থেকে। একদিনে আসলে তাদের সব স্মৃতি তুলে আনা সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক আমাকে সুস্থতা দিলে কয়েকদিন ধরে বিস্তারিত আলোচনা করব। জাযাহুমুল্লাহ।

মুফতির স্মরণে

মুফতি সাহেব হুজুরের কথা মনে পড়লেই আমার গলা ভারী হয়ে যায়। অনেকেই হয়তো লক্ষ করে থাকেন। কেনই-বা হবে না বলুন, উনি তো আমার পিতার সমতুল্য! উনাকে নিয়ে সামান্য আলোচনা করি। তাকে নিয়ে আমি সপ্তাহব্যাপী বলে যেতে পারব। এই মুহূর্তে হয়তো পারব না। আল্লাহ তাওফিক দিন।

আসলে আমার ফিকহি জীবন এই মানুষটিই গড়ে দিয়েছেন। তাফাক্কুহ অর্জনের পথে প্রধান মুরুব্বি ছিলেন এই হিন্দুস্থানি মুহাজির আলিম। উনার সাতপুরুষ মুফতি ছিলেন। ফিকহ-ফতোয়ার গভীর জ্ঞান ও বুঝ উনাদের মিরাস ছিল। মুফতি সাহেবের সময়েই নিউটাউন দেশ ও বিদেশে তাঁর অনন্য অবস্থা তৈরি করে নেয়। আমি অনেক কঠিন ও জটিল সমস্যায় পড়লে বানুরি সাহেবের শরণ নিতাম। কিন্তু তিনি স্মিতহাস্যে আমাকে মুফতি সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। মুফতি সাহেব আমার রুহানি ও ইলমি পিতার মতো ছিলেন। প্রশ্ন করলে বা মাশওয়ারা চাইলে সবসময় আমাকে মুনাসিব পরামর্শই দিতেন। (কেঁদে ফেলেন মুফতি সাহেব! -অনুলেখক)

আপনাদের একটা কথা বলি। ছাত্র-উসতাদের সম্পর্ক মূলত চার ধরনের।

প্রথম ধরনটি হলো আম উসতাদ আম ছাত্র। এদের মাঝে বিশেষ কোনো সম্পর্ক থাকে না। শিক্ষক ঘণ্টা নিতে আসেন। ছাত্রও উপস্থিত হয়। সবক শোনে। কোনো প্রশ্নও করে না। এর বাইরে তাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। একে বলা হয় আম উসতাদ আম ছাত্রের সম্পর্ক।

দ্বিতীয় প্রকার হলো খাস উসতাদ খাস ছাত্র। এদের মাঝে ক্লাসের বাইরেও একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্লাসে প্রশ্ন করে। কামরায় গিয়েও দেখাসাক্ষাত করে। একটা আত্মিক সম্পর্ক থাকে এদের মাঝে। এটি হলো খাস উসতাদ খাস ছাত্রের সম্পর্ক।

তৃতীয় প্রকার হলো উসতাদে আখাসসুল খাস শাগরেদে আখাসসুল খাস সম্পর্ক। এই ধরনের সম্পর্কে উসতাদ-ছাত্রের মাঝে গভীর আত্মিক বন্ধন গড়ে ওঠে।

উসতাদের চিন্তাধারায় গড়ে ওঠে এমন ছাত্র। তাঁর চিন্তার বাস্তবায়ন করতে চায় আখাসসুল খাস ছাত্র।

চতুর্থ প্রকার হলো উসতাদে রশিদ বা উসতাদে মুকাওয়াম। এমন উসতাদ, যার চিন্তা ও চারিত্রিক প্রভাব হুবহু শিক্ষক থেকে তাঁর ছাত্রের মাঝে স্থানান্তরিত হয়। এমন ছাত্রকে শাগরেদে রশিদ বা মুকাওয়াম বলা হয়।

উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন শাগরেদে মুকাওয়ামের উদাহরণ। নবীজির রঙে উনি একদম পুরোটাই রঙিন হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং উবাই বিন কা'ব হলেন আখাসসুল খাস শাগরেদের উদাহরণ। হজরত মুফতি সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল করিবে মুকাওয়াম ধরনের। সাধ্যমতো উনার রঙে রাঙার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কতটুকু পেরেছি।[৯৮]

মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকির ওফাত

মুফতি সাহেব শেষবয়সে এসে মাফলুজ (প্যারালাইজড) হয়ে যান। বাসাতেই থাকতেন। উনার ছেলে মাহমুদ—আমার শিষ্য—এখন ডাক্তার। মাঝেমধ্যে ছেলের গাড়িতে করে মাদরাসায় আসতেন। মাহমুদ তার বাবার দেখাশোনা করত। দীর্ঘ পাঁচ বছরের অধিক সময় অসুস্থ থাকার পর এক রাতে হজরত খুব বেশি অসুস্থ হয়ে যান। উনার হার্ট অ্যাটাক হয় সম্ভবত। রাতেই উনাকে লিয়াকত আলি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি খবর পেয়ে রাতেই দেখা করতে হজরতের ওখানে চলে যাই। সেখানে তিনি অক্সিজেন লাগানো অবস্থায় শুয়ে ছিলেন। তাই কথা বলার সুযোগ ছিল না। ডাক্তাররা জানালেন এখন মোটামুটি সুস্থ মনে হচ্ছে। বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। আমরাও তার পরিবারকে একই পরামর্শ দিলাম। ফলে সকলে মিলে হজরতকে নিয়ে আসার প্রস্তুতি শুরু হয়। এভাবেই সেই রাতটি কেটে যায়। আমরা অবশ্য মাদরাসায় এসে পড়ি। বাসায় ফেরার পর ভোররাত পাঁচটার দিকে উনি ইনতেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সকালে আমি বাসায় গিয়ে দেখি হজরত ইনতেকাল করেছেন। উনার ছেলেকে তাজিয়াত করি। ইনতেকালের ঘটনা বিস্তারিত শুনি। মুফতি সাহেবের চেহারা মোবারক সুবহানাল্লাহ কী উজ্জ্বল ছিল! আপনাদের যদি বোঝাতে পারতাম! উনাকে গোসল করাই আমি, মাহমুদ এবং আরো কজন। এরপর কাফন পরানো হয়। মুফতি

---

[৯৮]. হজরতের ব্যাপারে আরো জানতে তার জীবনী দেখুন- https://bit.ly/3aMbOSG

তাকি সাহেব ফোন করে জানান যে, হজরতের দাফন দারুল উলুমেই হবে। মুফতি সাহেবের অসিয়ত আছে। মুহাজির সকল আকাবিরের জন্য সেখানে জায়গা রয়েছে। আমি বাসায় চলে আসি। আমিও এক বছর পূর্বে মাফলুজ হয়ে পড়েছিলাম। আবদুর রশিদ নুমানি সাহেবকে জানালে উনি বাচ্চার মতো কাঁদতে শুরু করেন। সম্ভবত এই দুজনের বন্ধুত্ব খুবই গভীর ছিল। মাদরাসায় আমরা পরামর্শে বসি যে দাফনের ব্যাপারে কিছু করতে পারি কি না। নিউটাউনে কোনো আম গোরস্থান নেই। শুরুযুগে আল্লামা বানুরি সাহেব এদিকে তেমন তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার সুযোগ পাননি। উনি যদিও নিউটাউনেই মাদফুন; কিন্তু অন্যকারও জন্য সেভাবে জায়গা এখানে নেই। কিছুক্ষণ পরে মুফতি সাহেবের বাসায় যোগাযোগ করে জানতে পারলাম, হজরতের অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে দারুল উলুমেই দাফন করা হবে। যখন উনি দারুল উলুমে শিক্ষকতা করতেন তখনই সম্ভবত মুফতি শফি সাহেবকে উনি বলে গিয়েছিলেন যেন তাকে দারুল উলুমে সুযোগ দেওয়া হয়। সেদিন জুমাবার ছিল। দশ-এগারোটার দিকেই নিউটাউন সম্পূর্ণ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। দূরদূরান্ত থেকে উনার শিষ্য-ভক্তরা জমায়েত হতে থাকে। সাড়ে বারোটার দিকে উনার মৃতদেহ মাদরাসায় নিয়ে আসা হয়। এদিকে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ আবদুর রশিদ নুমানি সাহেব ঘোষণা করেন, জানাজা নিউটাউনেই হবে। ওদিকে দারুল উলুমেও চলছিল জানাজার প্রস্তুতি। নুমানি সাহেবের উপরে তো কেউ কিছু বলার সাহস রাখত না। তাই সবাই চুপই ছিল। উনি আবেগে বলছিলেন—ইয়ে মেরে সাথি থে। ম্যায় ইনকা জানাজা পাড়হুঙ্গা ওর পাড়হাঊঙ্গা ভি! উসকে বা'দ তুমলোগ ইসে যাহা লে যানা চাহতে হো লে যাও! আমরা সবাই চুপচাপ উনার কথা শুনে যাই। অবশেষে নামাজান্তে উনি জানাজার ইমামত করেন। আমিসহ অনেক আসাতিজা এখানেই জানাজায় শরিক হই। মুফতি সাহেবের পরিবারের সদস্যরা সকলে দারুল উলুমে চলে যান। সেখানেই যেহেতু দাফন, তাই তাদের উপস্থিতি জরুরি ছিল।

নামাজের পর হাজারো মানুষের ঢলের সাথে হজরতের মৃতদেহ কোরাঙ্গির দিকে রওনা হয়। আমি অসুস্থ থাকলেও হজরতকে বিদায় দিতে রওনা হই।

দারুল উলুমে পৌঁছে দেখি ওখানেও আবেগঘন দৃশ্য। সবাই নীরবে অশ্রু ঝরাচ্ছে। দারুল উলুমে মূলত দুটি গোরস্থান। একটি পুরোনো, যেখানে মুফতি সাহেবসহ ডাক্তার আবদুল হাই[৯৯] ও অন্যান্য মুরুব্বি শুয়ে আছেন। এর অবস্থান

---

[৯৯]. প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। পাকিস্তানের প্রথম সারির দীনি ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৮৯৮ সালে ব্রিটিশ ভারতে জন্ম নেওয়া এই মনীষী লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এঙ্গলো-মোহামেডান ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ আইনজীবী। পরে হোমিওপ্যাথি

মসজিদের পেছনের দিকে। আমি গিয়ে দেখি সেখানে দাফন করার মতো জায়গা আর নেই। মনটা খারাপ হয়ে যায়। হিন্দুস্থান থেকে হিজরত করে আসা মুরুব্বিরা সবাই একসাথে থাকতে পারলে কতই-না ভালো হতো! কিন্তু এখন উত্তর দরজার কাছে আরেকটি গোরস্থান করা হয়েছে। সেখানেই হজরতের জন্য কবর খোড়া হয়েছিল। ওখানে হজরতের কবরটিই ছিল প্রথম কবর। দ্বিতীয়বার জানাজা হলো দারুল উলুমে। ইমামতি করলেন মুফতি রফি সাহেব। আমরা নীরবে অশ্রুসজল নয়নে হজরতকে চিরবিদায় জানালাম। নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু।

দারুল উলুমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মাওলানা নুর আহমদ বার্মি সাহেব একজন জাইয়েদ আলিমে দীন। উনি বার্মা থেকে দেওবন্দে পড়তে গিয়েছিলেন। পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরবেন এমন সময় ৪৮ এর দেশবিভাগ শুরু হয়। এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফেরা প্রায় অসম্ভব ছিল তার জন্য। সেজন্য তিনি সেখানে মুফতি শফি সাহেবের খেদমতে থেকে যান। মুফতি সাহেবকে কিছুদিনের মাথায় পাকিস্তান সরকার আইন ও সংবিধান প্রণয়নের জন্য যখন হিজরতের প্রস্তাব দেয় আর তিনি প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পরিবারসহ হিজরতের পথে পা বাড়ান, তখন এই বার্মিজ আলিমও তার শায়েখের সাথে যাওয়ার ইরাদা করেন। মুফতি শফি সাহেব দেখলেন একজন চৌকস আলিম, ওখানে গিয়ে কোনো না কোনো কাজে আসবেই। তাই তাকে সাথে নিয়ে নেন। এভাবেই দারুল উলুমে তার নতুন জীবন শুরু হয়।

এই ভদ্রলোক খুবই রসিক এবং চৌকস ছিলেন। মানুষের সাথে মেলামেশায় পটু ছিলেন খুব। লিয়াকত আলি খান সাহেবের সাথে কীভাবে যেন তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি তার এই সম্পর্ক ব্যবহার করে একবার খান সাহেবকে বলেন- খান সাহেব, মুফতি সাহেবকে তো আপনারা নিয়ে এসেছেন ভালো কথা। কিন্তু তিনি এই ফ্ল্যাট বাসায় থেকে ছোট্ট একটা মাদরাসা পরিচালনা করেই জীবন কাটিয়ে দেবেন!? উনি তো দেওবন্দের সদর মুফতি। উনাকে এনেছেন, উনার কদর করুন।

চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন। ধর্মীয় জীবনে তিনি হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবির অন্যতম মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। ==

==দারুল উলুম করাচির প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ শফি ইনতেকাল করলে প্রায় দশ বছর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন। তার স্নেহধন্যদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি, মুফতিয়ে আজম মুফতি রফি উসমানী।

১৯৮৬ সালের ২৭শে মার্চ তিনি ইনতিকাল করেন। দারুল উলুম করাচিতে মুফিত শফি উসমানি সাহেবের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

খান সাহেব জানতে চান কীভাবে কী করতে পারি আমাকে বলুন, যাতে মুফতি সাহেব তাঁর সর্বোচ্চ খেদমত দেশ, জাতি ও উম্মতের জন্য রেখে যেতে পারেন। নুর আহমদ সাহেব তখন একটি বড় জায়গার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে দারুল উলুম দেওবন্দের মতো একটি প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠতে পারে। খান সাহেব খুশি হয়ে বলেন এটা কোনো ব্যাপারই না। আপনি নিজেই খোঁজ নিয়ে আমাকে জায়গা দেখান, আমি ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা করে দেব।

নুর আহমদ সাহেব এই কথোপকথনের কথা মুফতি সাহেবের সাথে আলোচনা করেন। এরপর মুরুব্বিদের পরামর্শ নিয়ে করাচির এই বিশালায়তন জায়গা তারা নির্বাচন করেন, যা তৎকালীন করাচি শহর থেকে কিছুটা বাইরে এবং কোলাহলমুক্ত পরিবেশে অবস্থিত ছিল। পরামর্শ মোতাবেক এই জায়গার কথা খান সাহেবকে জানানো হলে উনি এই জায়গাটি দারুল উলুমের জন্য ওয়াকফ করে দেন। দারুল উলুমের মসজিদ-মাদরাসার জন্য জায়গাটি লিখে দেওয়া হয়। শুরুতে তো ফাঁকা পড়ে ছিল দারুল উলুমের সুবিশাল জায়গা। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে প্রয়োজন মতো নির্মাণ করা হয় বিভিন্ন ভবন, মসজিদ ও লাইব্রেরি। আমার তো মনে হয় আগামী এক হাজার বছরও যদি আল্লাহ তায়ালা দারুল উলুমের বাকা (স্থায়িত্ব) রাখেন আর প্রয়োজনসাপেক্ষে নানাধরনের ভবন নির্মাণ হতে থাকে তবু সেখানে জায়গার অভাব হবে না! এখনো যেসব জায়গা খালি পড়ে আছে সেগুলো বড় বড় কোম্পানিকে গুদাম হিসাবে ভাড়া দেওয়া আছে। আকামাহাল্লাহু ওয়া নাফাআনা বিহা।

আসানিদে হাদিস

জিরিতে আমি এই হজরত আসাতিযায়ে কেরামের কাছে হাদিসের সনদ অর্জন করেছি।

মাজমাউল বাহরাইন শাইখুল হিন্দ ও আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির শাগরেদ আবদুল ওয়াদুদ সন্দ্বীপী, সালেহ আহমদ সাহেব, মাদানি রহিমাহুল্লাহর নৈকট্যধন্য শাগরেদ মাওলানা মুফতি নুরুল হক সাহেব এবং মাওলানা আবুল খায়ের দৌলতপুরি সাহেব। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের ফারেগ ছিলেন। শাইখুল হাদিস জাকারিয়া ও খলিল আহমদ সাহারানপুরির বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন। আবদুর রহিম ক্যমলপুরির একান্ত শিষ্য ছিলেন তিনি।

করাচিতে এসে নানা দিক থেকে সনদ অর্জনের সৌভাগ্য হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সনদের কথা বলছি।

আল্লামা বানুরি সাহেবের কাছে বুখারির সনদ।

আল্লামা শামসুল হক আফগানির থেকে সনদ। উনি একসময় ভাওয়ালপুর ইউনিভার্সিটির ভিসি ছিলেন।[১০০] সীমান্তপ্রদেশ চারসাড্ডায়[১০১] উনার একটা মাদরাসা ছিল। সেখানে উনি জীবনের শেষদিনগুলো কাটিয়েছেন। সেই মাদরাসায় কিছুদিন তার সান্নিধ্যে থাকার আমারও খুব ইচ্ছা ছিল। উনার কাছে এই মর্মে চিঠি দিয়েছিলাম। জবাবে উনি উল্লেখ করেন, বানুরির কাছে তো শাহ সাহেবের ইলম আছে। উনার কাছে বুখারি পড়ার পর আমার কাছে আসার আর প্রয়োজন মনে করি না। আপনি বরং মুতালায়া করতে থাকুন। ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। আমিও আর তাই এগোনোর কথা ভাবিনি। আর সেই মাদরাসার নিজাম একটু কঠিনই ছিল। উনি প্রতিটি তালিবে ইলমকে জায়গির রাখতেন। বাসাবাড়ি থেকে গিয়ে গিয়ে খাবার এনে খেতে হতো। আমার কাছে এটি কষ্টকর মনে হওয়ায় আর যাওয়া হয়নি তাঁর সান্নিধ্যে।

আমার করাচিতে থাকাকালে আল্লামা শামসুল হক আফগানি বেশ কয়েকবার নিউটাউনে এসেছিলেন। একবার আমার ছাত্রজমানায় আর দুবার আমার শিক্ষকতার সময়। প্রথমবার যখন এলেন তখন আমি দাওরায়। ছাত্ররা বানুরির কাছে বায়না ধরল আফগানি সাহেবের তাকরির শুনবে। উনার থেকে সনদের ইজাজত নেবে। বানুরি সাহেব তাকে অনুরোধ করলে উনি না করে দেন। কিন্তু বানুরি সাহেব যখন তাঁর মাজমাউল বাহরাইন হবার কথা উল্লেখ করেন তখন তিনি হেসে মসনদে বসে যান। শাইখুল হিন্দের শিষ্য হিসেবে উনি কিছু ফায়েজ বিতরণে আমাদের মাহরুম করতে চাননি।

আফগানি সাহেবের তাকরির এক কথায় অসাধারণ ছিল। আজও আমার কানে বাজে। প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা বাক্য। খুব থেমে থেমে তাকরির করতেন। আর এত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল উরদু! অথচ পাঠান মানুষ! তথ্যসূত্রে ভরে গেলেও তাকরির শুনতে ও বুঝতে একটুও কষ্ট হতো না। সুবহানাল্লাহ! বুখারি শরিফের প্রথম সবক পড়ানোর পর আমাদের সনদের ইজাজত দেন তিনি।

দ্বিতীয়বার যখন এলেন আমি তখন তাখাসসুসে। এবার তিনি বুখারির মধ্যখান থেকে কিতাবুল মাগাজির একটি হাদিস বর্ণনা করে তাকরির করলেন। মনে হচ্ছিল সাহাবিদের সময়ে ফিরে গেছি। জিহাদের ময়দান সাজানো। আর আমরা সবাই শাহাদাতের জন্য পাগলপারা! এবারেও তিনি আমাদের সনদ প্রদান করেন।

---

[১০০]. মুফতি সাহেব রহ. ভিসি উল্লেখ বলেছেন। কিন্তু তাহকীক করে জানা গেল, শামসুল হক সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খুত তাফসির ছিলেন।

[১০১]. খাইবার প্রদেশের একটি জেলা। এখানেই শাইখুল হিন্দের রেশমি রুমাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সূচিত হয়েছিল হাজি সাহেব তুরাঙযাইয়ের হাত ধরে।

তৃতীয়বার যখন আসেন তখন আমি উসতাদ হয়ে গেছি। এবারেও সনদ নিয়েছিলাম।

আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি হজরতও এসেছিলেন নিউটাউনে। উনার থেকেও সনদ লাভে ধন্য হয়েছি। উনি সবক প্রদান করেছিলেন আল্লামা বানুরি সাহেবের মসজিদের পেছনের বাগানে, গাছের নিচে হেলান দিয়ে। দেওবন্দের স্মৃতিচারণ করেন উনি সেই পরিবেশে। ভিন্ন একটি পরিবেশ ছিল সেদিন।

দারুল উলুমেও যেতাম ছাত্রজমানায়। তখন মুফতি শফি সাহেব জীবিত। আমরা একবার একটি মজলিসে শরিক ছিলাম। তো উনি সনদ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, এখানে উপস্থিত সকল উলামা-তুলাবাকে আমি ইজাজত দিলাম। এভাবে মুফতি সাহেবের ইজাজত লাভে ধন্য হই।

শাইখুল হাদিস জাকারিয়া সাহেবের ইজাজতও লাভ করি যখন উনি উমরার সফরে নিউটাউনে এসেছিলেন। তিনি এখানে কয়েকবারই আগমন করেন। সকল সিনিয়র ছাত্রভাইকে হাদিসের ইজাজত দিয়েছিলেন।

মুফতি মাহমুদ মুলতানি সাহেবের থেকেও ইজাজত লাভ করি। উনি তো প্রায়ই আসতেন। আর উনার সাথে একটা সম্পর্কও ছিল। আলহামদুলিল্লাহ।

মোল্লা মাহমুদ গিলগিতি সাহেবের থেকেও সনদ লাভ করি। এই সনদটি একটু ভিন্ন ও উঁচুমানের। এই মানুষটি শতোর্ধ্ব ছিলেন। যখন আমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করি, সে সময় প্রায় ১৩০ বছর বয়স ছিল। উনি নিউটাউনে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল উমরাতে যাবেন। উমরা ও হজে যাওয়ার জন্য দেশ-বিদেশের অনেক আলিম নিউটাউনে এসে একটু আরাম করে তারপর সফরে যেতেন। এই সুবাদে পৃথিবীর বিশেষত হিন্দুস্থানের তৎকালীন প্রায় সকল আকাবিরের পদধূলি পেয়েছিল নিউটাউন। মোল্লা সাহেব সেবার দাওয়াত নিয়েছিলেন মুফতি নিজামুদ্দীন শামজাইর বাসায়। মুফতি সাহেব আমাকে এশার পর বললেন, একটু পর আমার বাসায় চলে আসবেন। উনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হাতছাড়া করবেন না যেন।

আমি এশার জামাত পড়ানোর পর মুফতি সাহেবের বাসায় গেলাম। খাওয়াদাওয়ার পর কিছুক্ষণ গল্পসল্প চলল। গল্পে গল্পে জানতে পারলাম মোল্লা সাহেব হজরত গাঙ্গুহির শাগরেদ। সুবহানাল্লাহ! মনে হচ্ছিল মানুষ না জিনের সাথে দেখা করছি। উনি হাসছিলেন আমার অবাক হওয়া দেখে। স্বাস্থ্য ছিল একদম অটুট। আমি উনার হাতে চুমু খাই। হাদিসের ইজাজত লাভের কথা স্বভাবতই উঠে আসে। উনিও খুশিমনে আমাকে আর মুফতি সাহেবকে ইজাজত দিয়ে দেন। উনার ইজাজত লাভের গল্পটাও শুনিয়ে দেন। উনি সেসময় মিশকাত জামাতের ছাত্র। হজরত গাঙ্গুহির নিকট

মিশকাত শরিফ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। এক মজলিসে হজরত গাঙ্গুহি মিশকাতের ছাত্র ভাইদেরকেও হাদিসের সকল কিতাবের ইজাজত দেন এবং বলেন, আগামীতে হয়তো আমি আর আপনাদের তাকরির করতে পারব না। ঠিকই উনি সেই বছর ইনতেকাল করেন। আমি মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দিকে। উনি বিদায়ের সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে এত জোরে চাপ দিলেন মনে হলো আমার পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে যাবে। সুবহানাল্লাহ। অথচ আমি ছিলাম মধ্যবয়সি জোয়ান আর উনি শতবর্ষ পেরোনো নওজোয়ান! নাহ, আর কিছু বলতে চাই না। আল্লাহ তায়ালা উনাকে জান্নাতের আ'লা মাকাম দান করুন।

হাটহাজারির দারুল ইফতা

দারুল ইফতার নেসাব নিয়ে সামান্য স্মৃতি। অনেক ছাত্রভাইয়ের জানার ইচ্ছা থাকে বিধায় বলে যাচ্ছি।

নেসাব বলতে মুফতি জসিম সাহেব আর মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সাহেব আসার পূর্বে সংশ্লিষ্টরা দুররে মুখতার, আলমগিরি, উকুদু রসমিল মুফতি এগুলো ভাগ ভাগ করে পড়াতেন। তখন এক বছরের কোর্স ছিল। উনারা দুজন আসার পর কিছুটা পরিবর্তন আসে। উন্নতিও হয় বেশ। আমি হাটহাজারিতে এলে এরা আমার সাথে পরামর্শে বসেন। পাকিস্তানে এরা আমার শাগরেদ ছিলেন। ফলে চিন্তাচেতনা ও ইলমি ভাবনা সমধারার ছিল। তাই একটি উপসংহারে পৌঁছাতে আমাদের কোনো বেগ পেতে হয়নি। আমরা নিউটাউনের আদলে দু বছরের একটি সিলেবাস প্রণয়ন করি, যেখানে বেশ কয়েকটি মারহালা থাকে। প্রথম বছরকে দরসি রাখা হয়। আর তামরিনের জন্য দ্বিতীয় বছর। একটি গবেষণাপ্রবন্ধও লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু আফসোস! স্বেচ্ছায় কেউ আজ পর্যন্ত একটা ভালো মাকালা লিখে জমা দিল না আমাকে। কিছু ভালো ছাত্র যা দেখতাম, তাদের আমরাই জোর করে মাকালা লিখতে বাধ্য করতাম। বিশেষায়িত কোর্স করবে কিন্তু গবেষণা করবে না, এটা যে কেমন একটা অভ্যাস এখানকার ছাত্রদের, আমি বুঝি না ভাই!

এরপর আমাদের দু বছর মেয়াদি কোর্সের প্রথম যুগের দুজন ফারেগিন ভাই উচ্চতর পড়াশোনা বাইরে থেকে করে এসে যোগদান করেছেন। তাদের সহযোগিতায় এখন ছেলেরা একটু আগ্রহী হয়েছে, এটা শুনি আজকাল। আল্লাহ তায়ালা তাদের উম্মতের ইলমি রাহবারির অনুভূতি ও মর্ম উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন। এভাবেই এখনো নিউটাউনের দারুল ইফতার আদলে আল্লাহর দয়ায় আমাদের এই দারুল ইফতা ও তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা চলমান আছে।

জিহাদে আফগান...

পাকিস্তানে ছিলেন অথচ আফগান জিহাদ নিয়ে কোনো স্মৃতি নেই—অনেকে এমন ভাবতে পারেন। তাদের জন্য কিছু আলোচনা।

আফগানিস্তান শব্দটি আল্লাহ তায়ালা এমন ঈমানি নুর দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন, যে এই শব্দ শ্রবণে মুমিনের হৃদয় তৃপ্ত হয় আর কাফিরদের অন্তর কেঁপে ওঠে। ইসলামি ইতিহাসের চৌদ্দশত বছরের সুদীর্ঘ সময়ে মুসলিমরা অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়েছে। শত শত বিদ্রোহ, অভ্যন্তরীণ ফিতনা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ধেয়ে এসেছে একের পর এক। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ককেশাস, মুসলিম মধ্য-এশিয়াকে ধ্বংস করেছে, এরপর ধীরে ধীরে আমুদরিয়া পেরিয়ে অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ড তছনছ করার চেষ্টা করেছে; সামরিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এমন ভয়াবহ ফিতনার সম্মুখীন মনে হয় ইসলামি বিশ্ব কখনো হয়নি। একদিকে জান-মালের উপর আঘাত, দেশের পর দেশ দখল, তার উপর চাপিয়ে দেওয়া বিজাতীয় কুফরি ও ইলহাদি সংস্কৃতি। আমার জানামতে রুশবিপ্লব-পরবর্তী সময়কে আমি এ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত হয়ে আসা সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ফিতনা বলব। এই ফিতনা তার নখর বিস্তৃত করে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানে আসতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল করাচি ও গাওয়াদার বন্দরের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরকে তার নাপাক কব্জায় নিয়ে আসা। আফগানিস্তানে প্রবেশের পূর্বে তারা তো সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিল যে, সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মধ্যে তারা তোরখাম ও খায়বার বর্ডারে পৌঁছে যাবে। কিন্তু আমার আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি দম্ভ চূর্ণকারী, তিনি সোভিয়েতের দম্ভের ইতি টানার ফয়সালা করে ফেলেছিলেন। আল্লাহর সুন্নাত হলো, তিনি সমমানের শক্তি কখনো অবাধ্যদের উপর ব্যবহার করেন না। এটা মহান রবের একটি অসাধারণ সুন্নাত। ইতিহাসের ব্যাপারে সামান্য ধারণা-রাখা-ব্যক্তিও এই ব্যাপারে জ্ঞান রাখে। তিনি হাতির বিপরীতে ক্ষুদ্রকায় পাখি ব্যবহার করেছেন। তিনি মিথ্যা খোদা দাবিদারের বিপরীতে তরল পানির ব্যবহার করেন। ইতিহাসের এই মহা দাম্ভিকদের বিপরীতেও তাই এমন অসহায় ও দুর্বল জাতি তিনি নির্ধারণ করেছিলেন, যারা ঠিকমতো দুবেলা খেতেও পারত না। খোদার জানাজা-বের-করা এই জালিমদের তিনি পুনরায় আমুদরিয়া পেরুবার সুযোগ দেন ঠিকই; কিন্তু নিজেদের ভাগ্যললাটে পরাজয়ের কালিমা নিয়ে হিন্দুকুশের পর্বতমালার ভেতরে ঈমানদীপ্ত এই আফগান জাতিকে তারা চিনতেই পারেনি। আজ তো তাদের পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা তো দেখেছেন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের দাবিদারদের কীভাবে আল্লাহ তায়ালা আফগানের মাটিতে নাজেহাল করছেন।

আশির দশকের শেষভাগে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানে প্রবেশ করে, আমি নিজেই দেখেছি পাকিস্তানের আকাবির-আসলাফ রাতে কেউ ঘুমাতেন না। সারারাত সিজদায় থেকে রবের কাছে ফরিয়াদে লিপ্ত থাকতেন। এমন কোনো ঈমানদার শক্তির উত্থান হোক, যারা এই ফিতনার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, এই দোয়া তারা দিবানিশি করতেন। সত্তর বছর যাবত ত্রিশটির মতো ঐতিহ্যবাহী প্রদেশ যখন একের পর এক দখল হচ্ছিল নাপাক এই নাস্তিকদের হাতে, তখনও হয়তো সেখানকার আকাবির আলিমগণ দোয়ায় লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু নওজোয়ানদের মধ্যে সাংগঠনিকভাবে এই শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য কেউ হয়তো প্রস্তুত ছিল না। ফলে আকাবির আলিমদের দোয়ার বাস্তব নমুনা কেউ হতে পারেনি।

কিন্তু কাবুল আর হেলমান্দ নদীর বরফগলা পানিতে অজু করা কিছু সাহসী ঈমানদার প্রতিজ্ঞা করেন তারা এই ফিতনার সামনে বুক উঁচু করে দাঁড়াবেন। অনেক হয়েছে পালানো, এবার প্রতিরোধে নামতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে তারা একটি শুরা গঠন করেন। হাতে সামান্য যা কিছু ছিল; তাই দিয়ে বিশ্বপরাশক্তির বিরুদ্ধে নেমে পড়েন। এই কয়েকজন সাহসী মুজাহিদের মাঝে একজন ছিলেন জালালুদ্দীন হাক্কানি। এরপরের ইতিহাস তো সবাই জানেন। ঈমানি শক্তির বলে এবং নববি সুন্নাতের উপর চলার ফলে কীভাবে খালি হাতে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ সময়ের পরাশক্তির বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়, তা সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি বেশি ভেতরে যাব না। আপনারা তো এখন এইসব ইতিহাস ভালোভাবেই জানেন। আমি শুধু বলব, প্রতিরোধ শুরু করার জন্য সাহস, হিম্মত, সুউচ্চ মনোবল, ঈমানি শক্তি ও চেতনা, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা এই গুণ কোনো জাতির মাঝে না পেলে তারা তো প্রতিরোধ করতে পারবে না। বাগদাদ থেকে গ্রানাডা পতনের ইতিহাস আপনারা জানেন। সংখ্যাধিক্য আমাদের কখনোই বিজয়ের পথে সহায়ক হয়নি। আফগান জাতির মাঝে বিজয়ের মৌলিক গুণাবলি থাকায় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকেই নির্বাচন করেছেন এই দাম্ভিক পরাশক্তির উপসংহার টানার জন্য। টানা দশ বছর যুদ্ধ চলেছে সেখানে।

ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের কথা বলতে হলে অনেক কথাই বলা যাবে। সবকথা মুনাসিবও মনে করছি না। আমি তো শেষের দিকে যখন পরিস্থিতি মুজাহিদদের খুব অনুকূলে ছিল, তখন মা'জুর হয়ে যাই। নিউটাউনে তো জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে ইজনে আম ছিল। যেকেউ ছুটিতে জিহাদে শরিক হতে পারত। বরং পূর্বদিকের জেলাগুলো স্বাধীন করার পেছনে পাকিস্তানি তলাবাদেরই অবদান বেশি। করাচিতে মুজাহিদরা যখন আসতেন, নিউটাউনে প্রথমে আসতেন। এখানে তারা বয়ান-বক্তৃতা করতেন। তাশকিল হতো। ছাত্রভাইদের মধ্যে যারা জিহাদে শরিক হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তারা উসতাদদের অনুমতিক্রমে মুজাহিদদের সাথে রওনা হয়ে যেতেন। আমরা বসে বসে মুজাহিদদের ঈমানদীপ্ত চেহারা দেখতাম! কতবড় নেয়ামতের

অধিকারী তারা! শেষদিকে তো ছুটির সময় উসতাদগণও জিহাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য যাওয়া শুরু করলেন। একবার মুফতি রফি উসমানি সাহেব ও মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবি রহ. গিয়েছিলেন। আমাদের দারুল ইফতার কিছু নওজোয়ান উসতাদও এই মোবারক জিহাদে শরিক হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, দারুল ইফতার নানাবিধ ব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি সেই জিহাদি সফরে শরিক হতে পারিনি!

মুজাহিদ-নেতৃবৃন্দের মাঝে যারা নিউটাউনে এসেছেন, তাদের অনেকের সাথেই দেখা করেছি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনে আছে জালালুদ্দীন হাক্কানি[১০২] ও ইউনুস খালিস[১০৩] সাহেবের নাম। প্রথমজন তো এখন সারাবিশ্বে পরিচিত নাম। আমি দেশে আসার পর আর তেমন খোঁজখবর রাখতে পারিনি। হয়তো তিনি এখনো বেঁচে আছেন। দখলদার মার্কিনিদের সাথে যুদ্ধ করছেন। যখন নিউটাউনে উনার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল, তখন উনার বুকে একটি সুদৃশ্য সামরিক বেল্ট বাধা ছিল। সবাই বলত এটা নাকি খুব বরকতময়। পরে জেনেছিলাম, এই বেল্ট পরা অবস্থায় নাকি তাঁর উপর মর্টারের হামলা হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর কিছুই হয়নি। তাই বরকতের জন্য এই বেল্ট কখনো তিনি খুলতেন না।

আরব মুজাহিদরাও অনেকেই আসতেন নিউটাউনে। সবার নাম ও পরিচয় এই মুহূর্তে আমার মনে নেই। তবে কোনো মেহমান এলে আমি সাক্ষাতের সুযোগ নষ্ট করতাম না। একজন ফিলিস্তিনি শাইখ আসতেন, আমি তার মাঝে লক্ষ করতাম অসামান্য দীনি দরদ। তার নামও আমার মনে নেই। খোদার রাহে জীবন কুরবান করে দেওয়া মানুষদের সামান্য সান্নিধ্যও যদি শাহাদাতের সুযোগ করে দেয় জীবনে, কে বলতে পারে!

আফগানি বৈশিষ্ট্য

আফগান জাতির কিছু বৈশিষ্ট্য আমি দেখেছি। নিউটাউনে অনেক বিদেশি ছাত্রভাই পড়াশোনা করতেন। তন্মধ্যে আফগানরা ছিলেন সংখ্যায় দ্বিতীয়। আমার সহপাঠীও ছিলেন কয়েকজন আফগান। এরা সময় খুব হিসেব করে ব্যয় করত। এদের বেশিরভাগই প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধাকারী ছিল। অযথা গালগল্প কম করত। খুবই কম কথা বলা ছিল এদের চিনে ফেলার মতো একটা বিশেষত্ব। প্রকৃতি ছিল খুবই সহজ সরল। বেশি প্যাঁচগোজ এদের মাঝে ছিল না। সবচেয়ে যেই গুণটি

---

[১০২]. বিখ্যাত হাক্কানি নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা।

[১০৩]. আফগান দেওবন্দি আলিম। আফগান জিহাদে একটি বড় গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আমাকে প্রভাবিত করেছে তা হলো এদের পাহাড়সম আত্মমর্যাদা। এরা নিজের দীন ও ঈমান, সমাজ ও সংস্কৃতিতে কোনো আঁচড় আসতে দেয় না। এগুলোর জন্য জীবন বিলিয়ে দেওয়া আফগানদের জন্য খুব সহজ। মাওলানা আনওয়ার বাদাখশানিকে[১০৪] আমি দেখেছি। নিউটাউনে আমার এক বছর পরের সাথি ছিলেন। এমন প্রখর মেধা, গভীর জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, উন্নত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ আমি জীবনে দ্বিতীয়জন দেখিনি। উনি ইলমি মহলে এখন একজন দুনিয়াজোড়া বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। হজরত বানুরি তাকে ছাত্র জমানাতেই চিনে ফেলেছিলেন। পরবর্তীতে তাই বানুরির জামাতা হবার সৌভাগ্য হয় আনওয়ার সাহেবের। আমেরিকার সাথে যুদ্ধের খবর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে আমি এই জাতির ব্যাপারে হলফ করে বলতে পারি, এরা তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখতে পারলে কোনো পরাশক্তিই তাদের হারাতে পারবে না।

ভ্রান্তদের বিভ্রান্তি

(পাকিস্তানের আহলে বাতিলদের ব্যাপারে কিছু আলোচনা।)

লিকুল্লি ফিরয়াউনা মুসা। এই প্রবাদ আলিমগণ সবাই জানেন। ঠিক একে একটু বিপরীতমুখী অবস্থানে ব্যবহার করুন। পাকিস্তান খেলাফত পতনের পর একমাত্র মুসলিমরাষ্ট্র, যার ভিত্তি কোনো বৈষয়িক ও পার্থিব চেতনার উপর রাখা হয়নি। রঙ, জাতীয়তা, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি নেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের। বরং কালিমার উপর পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপিত। পরবর্তী ইতিহাস যদিও ইতিবাচক নয়; কিন্তু এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনের নিয়ত ও চেতনা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। এই দেশে ইসলামের যে পরিমাণ ইতিবাচক খেদমত হয়েছে এবং হচ্ছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও আপনি তার নজির খুঁজে পাবেন না। বাহ্যিক উপায়-উপকরণের স্বল্পতা সত্ত্বেও এখানকার আলিমগণ যেভাবে বিশ্বজুড়ে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা ইতিহাসে বিরল। ফল ঠিক অনুরূপই হয়েছে। এদেশের ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ইসলামি চেতনা ও ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান জনগণকে নানাভাগে বিভাজিত করার জন্য নিজেদের সকল নাপাক প্রচেষ্টা একত্র করেছে। আপনি বিগত একশ বছরের সকল ফিতনা—হোক সেটা ইসলামের মুখোশে অথবা আধুনিক সভ্যতার আড়ালে—কোনো না কোনোভাবে দেখবেন পাকিস্তান-কেন্দ্রিক তাদের একটি বড় পরিকল্পনা রয়েছে।

[১০৪]. জামিয়া ইসলামিয়া বানুরি নিউটাউনের মুহাদ্দিস। জাতিতে আফগান। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন। অসংখ্য কিতাবের রচয়িতা। আল্লামা বানুরির জামাতা। আলিমদের কাছে তার পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই।

কাদিয়ানি থেকে শুরু করে ইসনা আশারিয়া শিয়া, খারেজি, গোঁড়া আহলে হাদিস, বিদাতি, আগাখানি সবারই কেন্দ্রীয় কার্যক্রম পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত। আবার আধুনিক ফিতনার দিকে তাকালে সেক্যুলারিজম, কম্যুনিজম, সেপারেটিজম, হাল আমলের ফেমিনিজিম সবাই পাকিস্তানে তাদের বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই সকল বুদ্ধিবৃত্তিক ফিতনার মোকাবেলার জন্য আলিমদের মাদরাসা-মসজিদের চৌহদ্দি থেকে বের হয়ে বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। তাই পাকিস্তানে আপনি দেখবেন আলিমরা নানা ধরনের দাওয়াতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাংগঠনিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত।

পাকিস্তানের আলিমদের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা মারহালা ও অবস্থান অনুযায়ী আত-তাওলিয়া ও আত-তাবরিয়া করে থাকেন। অর্থাৎ ফিতনার রূপ ও ঢং অনুসারে তারা একত্র হন। যেমন : ধরুন কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন পরিচালিত হলে দেশের সকল ঘরানার ওলামা ও জনতা একত্র হন। এখানে শিয়া আলিমরাও একই স্টেজে অংশ নেন। আবার আহলে তাশাইয়ুর বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে দেওবন্দি-বেরেলবিদের আপনি একই মঞ্চে দেখতে পাবেন। আবার কখনো এই দুপক্ষও তাদের মাঝে থাকা মতানৈক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চ থেকে জনগণকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই ধরনের সমঝোতাপূর্ণ আবস্থানিক বৈচিত্র্য আপনি শুধু পাকিস্তানেই দেখতে পাবেন।

সফরে হেজাজ

এই সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলব। কারণ হেজাজের সফরকে আমি ব্যক্তিগত মনে করি। এই সফরের আবেগ-অনুভূতি ও প্রেমের কথামালা একান্ত আমার করে রাখতে চাই। একাকিত্বে ভাবনা ও একক স্মৃতির উপকরণ হিসেবেই থাকুক এগুলো। সেটুকুই বলব, যেটুকু বলা সঙ্গত মনে করব।

নিউটাউনে আমি দশ বছর খেদমত করার পরও হজে যাওয়ার সুযোগ আমার এলো না। আমি সেজন্য একটু চিন্তিত থাকতাম। নিউটাউনের প্রায় সকল উসতাদ প্রতি বছর হজ-উমরা করতেন। এটা দেখে মনের অবস্থা আরো অস্থির হয়ে পড়ত। খোদায়ে পাকের দরবারে মনের সকল আকুতিকে একত্র করে দোয়া করতাম, যেন তাঁর পবিত্র ঘর সফরের তাওফিক দেন। নবীজির রওজা পাকে উপস্থিত হয়ে যেন সালাম পেশ করতে পারি।

একবার দারুল ইফতায় বসে ছিলাম। মুফতি সাহেবও ছিলেন। মুফতি সাহেবকে মনের কথা খুলে বললাম। উনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, দেখুন, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছাড়া কবে কী হয়েছে বলুন! আমরা তো সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে যাই।

ফল তো তাঁর হাতে। উনি চাইলে ইনশাআল্লাহ আপনি হেজাজভূমির সফরে যাবেন। আমি আপনার জন্য দোয়া করি। কিছু আমলের জন্য পরামর্শ চাইলে উনি অভ্যাসের চেয়ে বেশি দরুদ পড়ার আদেশ দিলেন। আমি তৃপ্ত মনে কামরায় ফিরলাম।

আমলের বরকত

এরপর মুফতি সাহেবের উপদেশমতো আমল শুরু করি। অন্তরে আশা অনুভূত হতো। তিন মাস এভাবে নিয়মিত আমল করার পর একরাতে স্বপ্ন দেখলাম। হেজাজের ভূমিতে আমি সফর করছি। বাইতুল্লাহর হেরেমে বসে বাইতুল্লাহ দেখছি। এমন সময় সেখানকার বার্মিজ কলোনির মুসলমানরা আমাকে দেখতে পেয়ে ঘিরে ধরে। কোনো এক মাসআলায় তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে, যা আমাকে সমাধা করে দিতে হবে। তাদের সমস্যা সমাধা করে যেই হারামে ফিরলাম, তখনই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। মুফতি সাহেবকে পরদিন স্বপ্ন খুলে জানালে উনি আশ্বাস দিলেন, আমল জারি রাখুন। এর ঠিক একমাস পর একদিন দারুল ইফতায় বসে ছিলাম। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এলেন। মুফতি সাহেবের ভক্ত। অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা। উনার হাতে দেখলাম একটি ছোট্ট পুস্তিকা। মুফতি সাহেবের সাথে আলোচনার ফাঁকে উনি জানালেন, উনি কিছু পড়াশোনা করে হজের সহায়িকা একটি পুস্তিকা লিখেছেন, যেখানে প্রয়োজনীয় মাসআলা ও দোয়াসমূহ একত্র করা হয়েছে। এখন উনি চান যেন পুস্তিকাটি একটু সম্পাদনা করে দেওয়া হয়। সে উদ্দেশ্যে তিনি মুফতি সাহেবের কাছে এসেছেন। প্রতিবছর এই ভদ্রলোক হজের সফরে যেতেন। তার ইচ্ছা, পাকিস্তানের সকল হাজি সাহেবকে তিনি এই পুস্তিকা হাদিয়া করবেন। মালদার মানুষ। বোঝাই যাচ্ছিল। মুফতি সাহেব উনার অনুরোধ শুনে বললেন, জনাব, আমি তো ইদানীং খুবই ব্যস্ত থাকি। হাদিস ও ফিকহের দরসের পাশাপাশি নানাবিধ ব্যস্ততার কারণে আমার পক্ষে সময় বের করা বেশ কঠিন। আপনি আমার এই সহযোগী আবদুস সালাম সাহেবের সাথে কথা বলুন। তার শাস্ত্রীয় যোগ্যতায় আমার পূর্ণ আস্থা আছে। যদি তার হাতে সময় থাকে, তাহলে আমার বিশ্বাস সে আপনার এই কাজ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। ভদ্রলোক তখনই মুফতি সাহেবের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমার কাছে এসে সালাম করলেন। আমি জবাব দিয়ে খোঁজখবর নিলাম। পরিচিত হলাম। এরপর তিনি আমার হাতে পুস্তিকাটি দিয়ে বলতে থাকলেন, দেখুন, আমি এই বইয়ের পেছনে বেশ পরিশ্রম করেছি। আপনি দয়া করে একটু সতর্কতা ও দ্রুততার সাথে নজরে সানি করে দেবেন। আমার হাতে সময় একটু কম। আমি ইনশাআল্লাহ আপনাকে খুশি করব। আমিও তাকে দু সপ্তাহ পর আসতে বলে জানাই, মুফতি সাহেবের কাজ। আপনি তার সাথেই হাদিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করবেন। জাযাকাল্লাহ বলে উনি বিদায় নেন। এদিকে মুফতি সাহেব আমার দিকে

তাকিয়ে মুচকি হাসছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন হাদিয়ার ব্যাপারে কিছু বলেছি কি না! আমি জানালাম জি না। কিছু বলিনি। আপনার সাথে আলোচনা করতে বলেছি। উনি খুশি হয়ে বললেন, ধরে নিন আপনার কাজ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ!! আমল জারি রাখুন।

এরপর পুস্তিকাটি নিয়ে কিছুদিন সময় দিই। উনি বেশ পরিশ্রম করে সেটি সাজিয়েছিলেন। হক্কানি আলিমদের কিতাব থেকেই তথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ফলে আমাকে সেটি সম্পাদনা করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। এখানে যা করা ছিল না তা হলো তথ্যসূত্র সংযোজন। আমি সামান্য পরিশ্রম করে সেসব গুছিয়ে ফেলি। এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পাদিত কপি মুফতি সাহেবের টেবিলে রেখে দিই। মুফতি সাহেব একবার আমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেন, সবকিছু ঠিক আছে তো? আমি ইতিবাচক জবাব দিলে উনি তাতে একটা ভূমিকা লিখে দেন।

গায়েবি ইশারা

ঠিক একমাস পর সেই ভদ্রলোক মুফতি সাহেবের সাথে দেখা করতে এসে পড়েন। কেমন আছেন মুফতি সাহেব? আমার কাজ কি সম্পন্ন হয়েছে? আমি খেয়াল করতাম মুফতি সাহেব সাধারণ আম মানুষের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। ফলে তারা তাকে আপনজন মনে করত। ইলমের কারণে যে গাম্ভীর্যের দেয়াল তৈরি হয়, তা মুফতি সাহেবের মাঝে ছিল না। মুফতি সাহেব তাকে বলেন, কাজ হয়ে গেছে। তিনি শুনে খুব খুশি হয়ে যান। হাদিয়ার ব্যাপারে মুফতি সাহেবকে উনি জিজ্ঞাসা করলে আবার আমাকে দেখিয়ে দিলেন। সে যেহেতু মূল কাজটি করেছে, হাদিয়া দিলে তাকেই দিন। আমি তো শুধু কিছু কথা লিখে দিয়েছি। ভদ্রলোক উঠে এসে আমার সামনে বসলেন।

মুফতি সাহেব! হাদিয়া হিসেবে আপনি কী পছন্দ করবেন?

আমার তো পয়সার তেমন প্রয়োজন নেই। আমরা খেদমতেই ব্যস্ত থাকি। তবে আমি আপনার কাজটি একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে করেছি।

বলুন, আমাকে বলুন; যদি মুনাসিব মনে করেন।

জি, আমি অনেক দিন ধরে হজের সফরে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু সুযোগ হচ্ছিল না। মুফতি সাহেবের পরামর্শে আমি এই খেদমতটি করার চেষ্টা করেছি, যাতে হাজি সাহেবদের খেদমতের বরকতে আমার হজের সফরের সুযোগ হয়।

খুব ভালো, মাশাআল্লাহ। আমি খুব খুশি হলাম মুফতি সাহেব। দোয়া করবেন যেন আমি আপনার আশা পূরণের মাধ্যম হতে পারি।

এতটুকু কথোপকথনের পর সেদিনের মতো উনি বিদায় নিয়ে চলে যান।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমি উসমানি মসজিদে আসর পড়িয়ে বসে ছিলাম। দৈনিক মামুল অনুযায়ী আসরের পর মসজিদের বাইরের অংশে বসে থাকতাম। নিয়মিত মুসল্লিরা তাদের নানা ধরনের মাসআলা জেনে নিতেন। এরপর বাকি সময় জিকিরে মশগুল থাকতাম। সেদিনও মাসআলা জানাচ্ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম সেই ভদ্রলোক পেছনে বসে আছেন। আমি তাকে ইশারায় একটু অপেক্ষা করতে বলি। লোকজন বিদায় হলে তিনি আমার কাছে এসে বসেন। সালাম-মুসাফাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুফতি সাহেব, এই বছর হজে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার কী ইরাদা? আপনার সম্পাদনা আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি চাই আপনার সান্নিধ্যে থেকে এই বছর হজ করব। তখন সম্ভবত শাবান মাস চলছিল। আমার সে-বার রমজানে দেশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। উনাকে জানালাম, আমি শাওয়াল মাসে দেশ থেকে ফিরে আসব। উনি বললেন, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। ইনশাআল্লাহ সময়মতো এসে যাবেন, এই আশা রাখি।

মায়ের দোয়া!

আমি রমজানে দেশে চলে আসি। তখন আব্বা জীবিত নেই। আম্মার সাথেই বেশি সময় কেটে যেত। উসতাদদের সাথে দেখা করতাম। আমার আম্মা আমাকে খুব মহব্বত করতেন। দেশে গেলে সহজে কোথাও যেতে দিতেন না। শাওয়ালের শুরুতেই করাচি চলে আসতে চাচ্ছিলাম। ওই ভদ্রলোকের কথা মাথায় ছিল। যেহেতু উনি দ্রুত যেতে বলেছেন, নাহয় আবার আবেদনের সময় শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আম্মাকে আমি এই ব্যাপারটি চূড়ান্ত না হবার আগে বলতে চাচ্ছিলাম না। কাজ আছে বলে তাড়া দিচ্ছিলাম। কিন্তু আম্মাও এবার কোনোভাবেই যেতে দিচ্ছিলেন না। অন্তত এক সপ্তাহ আরো থাকতে বলছিলেন আম্মা। আমি তবু টিকিট কেটে ফেলি। মনের তাড়নায়। আবেগের বশে। আসলে আমরা তো বাহ্যিক উপকরণ দেখে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি; তাই গায়েবের প্রতি পূর্ণ আস্থা সবসময় বাস্তব জীবনে দেখা যায় না। আম্মা বারবার বলছিলেন, তোর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এক সপ্তাহ থেকে যা! আমি অবশেষে উপায় না পেয়ে হজের কথা বলে ফেলি। আম্মা এবার আমাকে কাছে টেনে দোয়া দেন। যদি তুই এক সপ্তাহ থাকিস, দেখবি আল্লাহ তোকে অনেক হজ করাবেন। আর যদি চলে যাস, তাহলে আমার মন খারাপ হবে। আমি আম্মার এসব কথা নিছক আবেগ মনে করে রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। নির্ধারিত দিনের একদিন আগেই ঢাকা পৌঁছে যাই। সেখানে আমার ছোটবেলার সাথি ইয়াকুব থাকত। তার সাথে দেখা করে একটা হোটেলে উঠি। ইচ্ছা ছিল দ্রুত করাচি গিয়ে

হজের জন্য প্রস্তুতি শুরু করব! এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু আল্লাহর মর্জি ছিল ভিন্ন। মাঝরাতের দিকে আমার প্রচণ্ড বুকব্যথা শুরু হয়। মনে হচ্ছিল মারাই যাব। দ্রুত ইয়াকুবের সাথে যোগাযোগ করি। সে এসে আমাকে স্থানীয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি জানান আমার বুকে ব্যথা (মাইল্ড স্ট্রোক) হয়েছে! সুবহানাল্লাহ! ডাক্তার আমার সব হিস্টোরি নেন। সতর্ক করেন যে, বিমানের সফর আপনার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। বাসেও সফর করতে পারবেন না। কমপক্ষে এক সপ্তাহ। কিছু ঔষধ দিয়ে বিদায় দেন আমাদের। আমি ভাবতে থাকি মায়ের দোয়ার প্রভাবের কথা। বায়েজিদ ও উয়াইসের কথা। কেন আমি মায়ের কথার খেলাফ করলাম! খুব আফসোস হচ্ছিল। ভালোও লাগছিল যে মা আমাকে আবার দেখতে পাবে। ভাই ইয়াকুবের সাথে পরামর্শ করে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিই।

বাড়িতে আম্মা আমাকে দেখামাত্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নাড়ীর টান তো অনুভব করা যায়। তা ছাড়া আমার চেহারাও বলছিল বড় কোনো ঝড় যেন বয়ে গেছে আমার উপর দিয়ে। আম্মাকে তবু প্রথমদিন বলিনি। কিন্তু ঔষধ খেতে দেখে বুঝে ফেলেন। পরে বাধ্য হয়ে বলে ফেলি যে আমি স্ট্রোক করেছি। আম্মা তো কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা! আমাকে খুব করে বকাঝকা করলেন। কেন আমার কথা শুনলি না! তোরা সবাই মৌলবি হয়ে মাকে কিছুই মনে করিস না! এখন কষ্ট পাচ্ছিস! একদম ভালো না হয়ে আর যাবি না! আমি হেসে আম্মার কথা মেনে নিই।

বাড়িতে থাকার ফলে সেবা বেশি পাচ্ছিলাম। ফলে এক সপ্তাহের চেয়ে সামান্য বেশি লাগল সম্পূর্ণ সুস্থ হতে। এই সময়ের মধ্যে আমার মনে শুধু বাইতুল্লাহ আর মদিনার কথা স্মরণ হতো। তাই সুস্থ হবার সাথে সাথেই আমি করাচি ফেরার প্রস্তুতি নিই। টিকিট এবার চট্টগ্রাম থেকেই করি। ভাড়া বেশি লাগলেও আমার জন্য সুবিধা হয়। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা হয়ে করাচি পৌঁছি।

ওদিকে নিউটাউনে আমার অসুস্থতার সংবাদ পৌঁছে গেছিল। সবাই খুব পেরেশানির সাথে দোয়া-কালাম করছিল আমার জন্য। এর মধ্যে সেই ভদ্রলোকও কয়েকবার এসে আমাকে খোঁজ করে ফিরে যান। আমি করাচি ফেরার দিনই উনি আমার সাথে দেখা করেন। আসরের পরে সেই একই সময়ে। আমাকে সুস্থ দেখে খুব খুশি প্রকাশ করেন ভদ্রলোক। এরপর একটি খাম বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেন, মুফতি সাহেব, আমার মনের তামান্না ছিল আপনার সাথে হজের সফর করব। কিন্তু আপনার আসতে দেরি হওয়ায় আমাদের আবেদন জমা হয়ে গেছে। এখানে আপনার পথখরচ আমি হাদিয়া করলাম। আপনি একটু আবেদন করে সফরের ব্যবস্থা

করুন। যদি ভিন্ন কোনো ট্রানজিট পথেও আপনি পৌঁছাতে পারেন তবু চেষ্টা করুন। আমি অতিরিক্ত খরচও ইনশাআল্লাহ বহন করব। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

পদে পদে পেরেশানি

আমি খাম খুলে দেখি ত্রিশ হাজার রুপি। মোটামুটি ভালোভাবে হজ করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই মুহূর্তে আবেদন করলে কি ভিসা দেবে? পরদিন নিউটাউনে গিয়ে কিছু উসতাদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করলাম। বেশিরভাগ শিক্ষকই এই মুহূর্তে ভিসা পাওয়া অসম্ভব বললেন। এদের মাঝে এমনও কজন ছিলেন, যারা আবেদন করে ভিসা পাননি। মুফতি শাহেদ ছিলেন এদের একজন। কিন্তু এই মাওলানা হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। আমাকে সাথে করে আবার যেতে চাইলেন অ্যাম্বেসিতে। পরদিন আমরা আবার অ্যাম্বেসিতে যাই। মাওলানার একটা গাড়ি ছিল। উনিই ড্রাইভ করেন। অ্যাম্বেসিতে গিয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট অফিসারের সাথে দেখা করলাম। উনি জানালেন এই মুহূর্তে বিশেষ আবেদনও করা সম্ভব না। আপনারা আরেকটু আগে এলেন না কেন! অফিসারের কথা শুনে মনটা ভেঙ্গে গেল। আমরা সেদিনের মতো ফিরে এলাম।

মুফতি সাহেবের সাথে অবস্থা নিয়ে আলোচনা করলাম। উনি একটা ছোট্ট স্লিপে সুপারিশ লিখে দিলেন। বললেন সাফিরের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের চেষ্টা করুন। আশা করি একটা পথ বের হবে। মুফতি শাহেদ সাহেবকে মুফতি সাহেবের কথা জানালাম। উনি বললেন মুফতি সাহেবের সুপারিশ অনেকেই ব্যবহার করে। তাই খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না। তবু উনি বলেছেন যখন, তো যাওয়া যাক।

আবার পরেরদিন আমরা অ্যাম্বেসিতে যাই। গিয়ে দেখি দারোয়ান দরোজা বন্ধ করে বসে আছে। আমরা নিউটাউনের পরিচয় দিলে তারা ভেতরে বসতে দেয়। সাফির[১০৫] সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, উনি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে বসেছেন। মুফতি শাহেদ সাহেব নেতিবাচক ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন। মনে হলো তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন। আমি চট করে একটা স্লিপ বের করে কিছুটা আবেগপূর্ণ ভাষায় সাফির সাহেবকে একটা চিরকুট লিখলাম। এরপর মুফতি সাহেবের সুপারিশসহ চিরকুটটি পিওনকে দিয়ে জানালাম, সাফির সাহেবের কাছে একটু পৌঁছে দিতে। অন্য কারও হাতে যেন না যায়। পিওন আমার দিকে একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আমিও মাথা হেলিয়ে জবাব দিলাম। ভেতরে গিয়ে পিওন আমার পাঠানো কাগজ-দুটো সাফির সাহেবকে পেশ করে। উনি মিটিং চলাকালেই

---

[১০৫]. রাষ্ট্রদূত

সেগুলো খুলে দেখেন। এরপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে গর্জে ওঠেন, আপনারা এই দুই মৌলবি সাহেবকে কেন ভিসা দেননি! তারা তো নিউটাউনের মুফতি। এই ধরনের মানুষকে বাইতুল্লাহর জিয়ারত থেকে বঞ্চিত করার কোনো মানে হয় না। কোনো এক অফিসারকে তখনই আদেশ দেন যেন আমাদের ভিসা সঙ্গে সঙ্গে করে দেয়। পিওন বাইরে এসে আমাদেরকে এসব জানাল। আমরা সাথে সাথে পাসপোর্ট তার হাতে দিয়ে দিই। সে ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর হাসিমুখে পাসপোর্ট দুটো নিয়ে ফিরে এল। খুলে দেখি হারামাইনের মুসাফির হিসেবে আমাদের তারা অনুমতি দিয়েছে! খুশিতে তাকে আমরা একশ রুপি বখশিশ দিলাম। মুফতি শাহেদ সাহেব আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

নিউটাউনে ফিরে এসে সবাই যখন শুনল আমাদের দুজনের ভিসা হয়ে গেছে, সকলেই অবাক হয়ে গেল। অনেকে এসে মোবারকবাদ জানিয়ে গেল। মুফতি সাহেব শুনে বললেন এটা 'মিন জানিবিল্লাহ'! সালাতুশ শুকর আদায় করুন। হজরতের আদেশে জায়নামাজে দাঁড়ালাম। মনের গভীরতম স্থান থেকে শুকরিয়া এসে অশ্রুবিন্দু হয়ে সিজদায় গড়িয়ে পড়ল। সবকিছুর প্রথম অনুভূতিটা আসলেও বোঝানোর সাধ্য থাকে না।

আর কত দেরি পাঞ্জেরি!

ভিসা হয়ে যাওয়ার পর এখন নতুন যেই মাসআলাটি আমাদের সামনে এলো, সেটি হলো টিকিট সংগ্রহ করা। মুফতি শাহেদ সাহেব আমাকে সাথে নিয়ে এজেন্সিতে গেলেন। কিন্তু সেখানে আমরা ইকোনোমি ক্লাসে কোনো টিকিট পাচ্ছিলাম না। বিজনেস ক্লাসের টিকিট ইকোনোমির চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের ছিল। আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না বিজনেস ক্লাস টিকিট ক্রয় করা। তবু সাহস করে যখন কাউন্টারে গেলাম, আমাদের শোনানো হলো এখানেও সকল টিকিট বিক্রয় হয়ে গেছে। আবার পরীক্ষার পালা! আমরা নানা কাউন্টারে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলাম। সবখানে খোঁজ নিয়ে একই রিপোর্ট আসতে লাগল। হঠাৎ একজন আমাদের বুদ্ধি দিল আপনারা দুবাই হয়ে জেদ্দার ফ্লাইট ধরতে পারেন। তখনই দুবাইয়ে আমার এক সাথির কথা মনে পড়ল। তাকে ফোন করলাম। তিনি জানালেন আপনার দুবাই আসা আমি নিশ্চিত করতে পারব। কিন্তু এখান থেকেও আপনি টিকিট পাবেন কি না আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। যদিও আমি আপনাকে সুপারিশ করতে পারব। কিন্তু একদম শেষমুহূর্ত হওয়ায় আমি নিশ্চিতভাবে কথা দিতে পারছি না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাব বলে ফোন রেখে দিই। এমন এক পরীক্ষায় পড়ে গেলাম—কাউকে কিছু বলে কোনো লাভও নেই। এমন অবস্থায় আমরা লাউঞ্জের এক কর্নারে গিয়ে সালাতুল হাজতে দাঁড়িয়ে গেলাম। যেই রবের কাছে কোনো কিছুই অসাধ্য নেই, তার

কাছে নিজের সকল অসহায়ত্ব তুলে ধরে মিনতি করতে লাগলাম। ইয়া আল্লাহ, আপনার ঘরের মেহমান হতে হলে তো প্রথমে কবুল হতে হয়। অর্থবিত্ত ও শারীরিক সামর্থ্য থাকলেই কেউ আপনার ঘরে পৌঁছতে পারে না। হেজাজের মুসাফিরদের জন্য তো আসমানে ভিসা দেওয়া হয়। হে মা'বুদ, আপনি চাইলে দুনিয়াবি কোনো মাধ্যম ছাড়াই আমাদের আপনি আপনার ঘরে নিতে পারেন। এই মুহূর্তে বাহ্যিক কোনো মাধ্যমই আমাদের হেজাজে নিতে পারছে না। শুধু আপনার রহমত আর কুদরতই আমাদের সহায়। আপনি আমাদের মাঝপথে এসে বঞ্চিত করবে না হে রব! আপনা থেকেই দুচোখ থেকে লবণাক্ত ধারা বয়ে এসে চেহারা ও দাঁড়ি ভিজিয়ে দিল।

নামাজ থেকে উঠে মুফতি শাহেদ সাহেব আর আমি এক জায়গায় বসে পড়লাম। এই সময় গায়েবি সাহায্য হিসেবে এক ঊর্ধ্বতন অফিসার আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। আপনারা কি নিউটাউনের মুফতি সাহেবান? 'জি, আলহামদুলিল্লাহ' বলে আশাভরা চোখে তাকালাম তার দিকে। উনি বললেন, আসুন আমার সাথে। আমরা বুকভরা আশা নিয়ে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকি। উনি ডিপার্টমেন্টপ্রধানের অফিসে ঢুকে প্রধানের চেয়ারে বসে পড়লেন। আমরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম! তো মুফতি সাহেবান, আপনাদের ভিসা আছে; কিন্তু টিকিট পাচ্ছেন না। এই তো? আমাদের এয়ারলাইন্সে একটা মাসআলা হয়ে গেছে। বিজনেস ক্লাসের দুজন যাত্রী অসুস্থতাজনিত কারণে এবার হজে যেতে পারছেন না। একদম শেষসময়ে এসে তারা টিকিট ক্যান্সেল করেছেন। জরিমানাও গুনতে হয়েছে তাদের। কিন্তু আমাদের সিটদুটো ফাঁকাই যাবে জেদ্দায়। হঠাৎ আমাকে জানানো হলো দুজন মৌলবি সাহেব টিকিট পাননি। আমি শুনতে পেয়ে আপনাদের সরাসরিই খবরটি দেওয়ার জন্য এগিয়ে যাই। এখন বলুন বিজনেস ক্লাসে ইকোনোমির ভাড়া দিয়ে হেজাজের মুসাফির হতে কেমন লাগছে? আমরা খুশিতে একে অপরকে আলিঙ্গন করলাম। সিনিয়র অফিসার আমাদের এই আনন্দের মুহূর্ত উপভোগ করছিলেন। সেসময় আমাদের ত্রিশ হাজার রুপি দিতে হয়েছিল। আমরা দুজন টিকিট গ্রহণ করে ফিরে আসি।

এর দুদিন পরেই সম্ভবত ফ্লাইট ছিল। পিআইএর ফ্লাইট। ১৯৮৪ সাল। এটি ছিল আমার প্রথম হজের সফর। এরপর আরো কয়েকবার হজ ও উমরার তাওফিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ! আব্বা ও আম্মার জন্যও হজ করেছি একে একে। এটা আমার জীবনের অনেক বড় পাওয়া।

স্মৃতিপাতায় হেজাজ

হজের সফরগুলোতে বেশ কিছু ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল। একবার ড. হাবিবুল্লাহ মুখতার সাহেবের সাথে হারামে বসে ছিলাম। উম্মেহানিতে পাকিস্তানি আলিমরা বিকেলে

বসতেন। আমি বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে কাবার স্নিগ্ধতা অনুভব করছিলাম। হঠাৎ একটা আজব বিষয় আমার চোখে পড়ল। কাবার ঠিক উপরে আগুনের হলকার একটা চলমান ধারা বয়ে চলছিল। আমি ভয় পেয়ে কেঁপে উঠি।[১০৬] হায়! এটা কী হচ্ছে! হাবিবুল্লাহ সাহেবের বাহু ধরে ঝাঁকি দিই আমি। দেখুন! কাবায় আগুন লেগে গেছে! ফায়ার সার্ভিস ডাকুন। আমার অবস্থা দেখে প্রথমে উনি ভড়কে যান। এরপর একটু সময় নিয়ে আমাকে বোঝার চেষ্টা করেন। আমি কিন্তু একটানা আগুনের প্রবহমান প্রজ্বলিত ধারা ঠিকই দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু উনারা কেউ দেখছিলেন না। ফলে আমার 'ওয়াহম' হয়েছে বলে ড. হাবিবুল্লাহ সাহেব চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু কাবা শরিফ থেকে অনবরত এই নুরের ছটা আমার চোখে আসতে থাকে। পরবর্তী সময়ে বুঝতে পারি এটি সারা দুনিয়ার জন্য কাবার উপরে প্রেরিত আল্লাহ তায়ালার রহমতের নুর। এখান থেকেই সারা বিশ্বে এই নুর বণ্টিত হয়।

আরেকবারের ঘটনা। এটি সম্ভবত আমার তৃতীয় হজ ছিল। আমি বাবে শামিতে বসে ছিলাম। পাকিস্তানি আলিমদের সঙ্গ উপভোগ করছিলাম। বাবে উম্মেহানিতে বাঙালি আলিমরা বসতেন। সেদিন জোর করে আমাকে পাকিস্তানি আলিমরা তাদের সাথে বসিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর একাকী একটি পরিবেশ পেয়ে যাই। চারপাশে কোনো পরিচিত মানুষ ছিল না। এমতাবস্থায় কাবার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে খেয়াল করি সুলতান সাহেব নানুপুরি আমাকে সালাম দিচ্ছেন। আমি হতচকিয়ে তার সালামের উত্তর দিই। তিনি আমার পাশে বসেন। বলেন—আমি দূর থেকে আপনার চেহারার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিলাম। একটি অনুপম অবর্ণনীয় আলোকচ্ছটা আপনার চেহারায় সুশোভিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আপনি আগুনে ঝলসে যাচ্ছেন। এটা নিঃসন্দেহে আপনার উপর আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত বর্ষণ। আমি সুলতান সাহেবের এমন আলাপে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

মতানৈক্যেই রহমত

এ সংক্রান্ত আরো দু-একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একবার আমি উসমানিয়া মসজিদে জোহরের নামাজ পড়ে আমার কামরায় আরাম করছিলাম। ক্লান্তি সেদিন এত বেশি শরীরকে ভারী করে তুলেছিল যে দুই রাকাত সুন্নাত পড়ার ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ আরাম করে জিরিয়ে নিয়ে সুন্নাতের নিয়ত করব এই ভেবে শুয়ে পড়ি। ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখি, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের বড় বড় আলিমগণ একটি মজলিসে রয়েছেন।

---

[১০৬]. এর কবছর পূর্বে কাবা শরিফ আক্রমণের শিকার হয়েছিল। ফলে পরবর্তী সময়ে হাজি সাহেবান অত্যন্ত আতংকে থেকেছেন।

আমারও সেখানে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছে। তারা খানা গ্রহণ করে সকলেই একটু আরাম করছিলেন। এমন সময় অনেকেই আমাকে জানায় যে আমাদের মাঝে হজরত থানবি, শাইখুল হিন্দ এবং মুজাদ্দিদে আলফেসানি রয়েছেন। এমন মহান ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাতের আশায় আমি একে একে সামনে এগিয়ে যেতে থাকি। প্রত্যেকে একেকটি খোলা জায়গায় নিজ চৌকিতে বিশ্রাম করছিলেন। এগিয়ে যাওয়ার পর আমি হুসাইন আহমদ মাদানি, শাহ সাহেব, মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সাহেবকে দেখতে পাই। তারা সকলেই আমাকে চুপচাপ এগিয়ে যাওয়ার ইশারা দেন। আরো কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর খেয়াল করি, হজরত থানবি একটি চারপায়াতে বিশ্রাম করছেন। সাদা শুভ্র চাদরে তার পুরো শরীর ঢাকা রয়েছে। শুধু চেহারাটুকু খোলা রয়েছে। আমি ইশারায় তাঁকে সালাম করলে তিনি জবাব দেন। এত মহান ব্যক্তির সান্নিধ্যের সৌভাগ্য হওয়ায় নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আমি একটি প্রশ্ন করতে পারি কি না!? তিনি ইশারায় সামনের দিকে ইঙ্গিত করেন অর্থাৎ সামনে এগিয়ে যাও। সেখানে যাকে পাবে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। আমি উঠে আরেকটু সামনে এগিয়ে যাই। অবাক হয়ে লক্ষ করি, সামনের চারপায়াতে মুজাদ্দিদে আলফেসানি, সাইয়েদ আহমদ সিরহিন্দি বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাকে ইশারায় সালাম করে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি ইতিবাচক ইশারা দিলে আমি প্রশ্ন করি, হজরত, আলিমদের মাঝে এত ইলমি ইখতেলাফ। তাদের মেধা, শ্রম অনেকাংশেই এই পথে ব্যয় হয়। এটাকে কি একমুখী করার কোনো সম্ভাবনা নেই? তিনি আঙুল উঁচিয়ে আড়াআড়িভাবে নাড়ান অর্থাৎ এটি সমাধানযোগ্য কোনো মাসআলা নয়। কেয়ামত পর্যন্ত এটি বহাল থাকবে। ঠিক এ সময় আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়। আমি ঘুম থেকে জেগে ভাবতে থাকি, জোহরের সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ার পরেও কীভাবে আমি সুন্নাতের অত্যন্ত কঠোর পালনকারী দেওবন্দি আকাবিরদের সাক্ষাত লাভ করলাম!! পরবর্তীতে সুলতান সাহেব নানুপুরিকে পুরো ঘটনা জানালে তিনি বলেছিলেন, সব বিষয়ে আলিমদের ঐক্য কখনোই সম্ভব হবে না। আলিমদের পরস্পরের মাঝে সংযম ও শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে চলতে হবে।

আরেকবার আরেকটি স্বপ্ন দেখি। দেওবন্দি আকাবিরগণ মুজাদ্দিদে আলফেসানির সভাপতিত্বে একটি মজলিসে বসে আছেন। তার দুপাশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি এবং সাইয়েদ আহমদ শহিদ বসে আছেন। আমি মজলিসে প্রবেশ করে এক কোনায় হজরত খলিল আহমদ সাহারানপুরির পেছনে বসে পড়ি। তারা অত্যন্ত স্পর্শকাতর গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। একপর্যায়ে হঠাৎ

করে মুজাদ্দিদ সাহেব, খলিল আহমদ সাহেবকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি এই ছেলেটির নাম আমাদের খাতায় তুলেছেন? সাহারানপুরি না-সূচক জবাব দিলে তাকে তাগাদা দিয়ে বলেন, আপনি এই ছেলের নাম আমাদের রেজিস্টার খাতায় তুলে নিন। ঠিক এই সময় আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। সে সময় আমি টানা দশদিন ধরে তাজকিরাতুল খলিল অধ্যয়ন করছিলাম। সম্ভবত এর প্রভাবে এমন স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

হেজাজ সফর নিয়ে যদি বলি, তাহলে আমি মোট চারবার হজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। দুবার মা-বাবার জন্য, একবার ফরয হজ ও একবার নফল হজ। পবিত্র রমজান মাসে কয়েকবার উমরা করার সৌভাগ্য হয়েছে। অধিকাংশ হজ এবং উমরা পাকিস্তান থাকাকালীন, তবে দেশে আসার পরে একবার হজ ও একবার উমরা করার সৌভাগ্য হয়। আমি সকল মুসলিম ভাইবোনের জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে জীবনে একবার হলেও হারামাইন শরিফাইন সফর করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

গণতন্ত্র ও ইসলাম

একটি সামসময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করব। আপনারা অবগত আছেন, উসমানি খেলাফতের পতনের পর কুফরিবিশ্ব তাদের কুফরি রাজনৈতিক চিন্তাধারা সারাবিশ্বে প্রচার ও প্রসার করেছে। রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতির জন্য তারা বেশ কয়েকটি পদ্ধতি প্রণয়নপূর্বক পৃথিবীর বহু দেশে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়েছে। আমরা দেখেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম বিশেষত আমেরিকা এবং ইউরোপে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জোয়ার আসে। ঠিক একইভাবে দূরপ্রাচ্য এবং আশপাশের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটে। অচেনা হয়ে পড়ে ইসলামি রাজনীতির সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিক্রমা। গণতন্ত্র যখন সারা বিশ্বকে তার কুফরি ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আটকে ফেলছিল, ঠিক সেসময় মুসলিমবিশ্বে নব্য স্বাধীনতা গ্রহণ করা দেশগুলো এই পদ্ধতিকে ইসলামিকরণের চেষ্টা শুরু করে। বিজ্ঞ ইসলামি রাজনীতিকরা ইসলামি গণতন্ত্রের নামে নতুন একটি ভেজালপূর্ণ রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তনের ডাক দেন। এ বেড়াজালে আটকে পড়ে মুসলিমদেশগুলো। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার চলছিল। একের পর এক দেশ বাধ্য হয়ে ইসলামি সমাজতন্ত্রের নামে একটি অপুষ্ট এবং স্পষ্ট দীনবিরোধী রাষ্ট্রচিন্তাকে আপন

করে নিচ্ছিল। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক মৃত্যু ঘটে। কয়েক বছর পরেই শতগুণ শক্তি নিয়ে নতুনরূপে এবং নতুনভাবে আবির্ভূত হয় আধুনিক যুগের গণতন্ত্র। গুটিকয়েক জালিম, প্রতারক এবং অসাধু লোকের হাতে চলে যায় সারাবিশ্বের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে এই পদ্ধতিকে মুসলিমবিশ্বে ইসলামিকরণের ঘৃণ্য অপচেষ্টা শুরু করেন কিছু ইসলামি গবেষক। দশকের পর দশক বেঁধে দেওয়া ছকের ভেতর আন্দোলন করে যেখানে কোনো ফল লাভ করেনি বহু ইসলামি দল। অনেকেই জানতে চান যে, ইসলামি সমাজতন্ত্র এবং ইসলামি গণতন্ত্র বলতে কোনো বিষয় কি সত্যিই ফিকহের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব!? এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত তুলে ধরছি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে আমার পড়াশোনার পরিধি ততটা গভীর নয়। সমাজতন্ত্র! এই শব্দটি আমি প্রথম শুনেছি করাচিতে গিয়ে। জুলফিকার আলি ভুট্টো সমাজতন্ত্রের ভাষ্যকার ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে সমাজতন্ত্র আনতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন আমি ইসলামি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করব! তার এই স্লোগানে মুগ্ধ হয়ে মুফতি মাহমুদ মুলতানি রাজনৈতিক স্বার্থে তার সাথে ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। দুজনে মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সরকারব্যবস্থা। কিন্তু পাকিস্তানের অন্যান্য আলিম ভুট্টোর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে একমত হননি। ইসলামি সমাজতন্ত্র একটি সম্পূর্ণ ভেজাল ও কুফরি মতবাদ ছিল। এই মতাদর্শ মেনে মুসলমান কখনো ইসলামি রাষ্ট্রপরিচালনা করতে পারে না। মূলত এগুলো সবই ভিন্ন ভিন্ন দীন। আর ইসলাম আল্লাহ তায়ালার কাছে একমাত্র মনোনীত দীন। ফলে এসবের মাঝে কোনো সখ্য, কোনো মিল বা কৌশলগত ঐক্য হতে পারে না বলে আমি মনে করি। এভাবে রাজনীতিতে মেহনত করার ফলে আপনারা দেখবেন কোনো ইসলামি দল আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের তেমন বড় কোনো সাফল্য এনে দিতে পারেননি। আর এটি হবে বলেও সম্ভব মনে হয় না।

সাম্প্রতিক আফগানিস্তান : বিশ্বমুসলিমের মুক্তি

সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিক্রমা ভিন্ন একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ঘোর অমানিশার মধ্যেও এ অঞ্চল থেকে আশার আলো জাগতে শুরু করেছে। সুদীর্ঘ ৪ দশক ধরে চলা যুদ্ধের সম্ভবত আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামি ইমারতের সোনালি অধ্যায় ছিল। দুই দশক পর দ্বিগুণ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আবারো তা ফিরে আসছে বলে মনে

হচ্ছে। নানা দিক থেকে আজকাল তাদের বিজয়ের সংবাদ শুনে পুলকিত হই; কিন্তু আশ্চর্যবোধ করি না। কেন করি না, একটু খুলে বলছি।

দেখুন, ইসলাম আসলে নবীজির আদর্শ মেনে চলার নাম। নবীজির দেখানো পথে চললে সে যত দীন-দরিদ্র, অসহায়, দুর্বল ও শক্তিহীন হোক না কেন আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই সাফল্য দান করবেন। এটি আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা। আর মনে রাখবেন আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা কখনো ভঙ্গ হয় না। এটি আমরা যারা সাহস সঞ্চয় করে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা ও শর্ত পূরণ করতে পারি না, পরে পরিবেশ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে কোনোভাবে টিকে থাকার জন্য কাফিরদের পদ্ধতিতেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ইসলাম পালনের ভঙ্গুর চেষ্টা করে থাকি! আপনি আফগান তালেবানদের কথা ভাবুন। আমি তাদের অনেককে খুব কাছে থেকে দেখেছি। তাদের বড় বড় আলিম, শাইখুল হাদিস, তালিবান আমলের বড় বড় কমান্ডার এবং জজ-যারা শরিয়াহ কোর্টে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন; এমন অনেকেই আমার সাথি এবং শাগরেদ। আমি এজন্য প্রথমত গর্ব অনুভব করি। মাওলানা বানুরির একজন জামাতা ছিলেন। আনওয়ার বাদাখশানি! গত শতাব্দীর অন্যতম তীক্ষ্ণ মেধাবী মানুষ। এ মানুষটি যখন পড়াশোনা করতেন, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাকে সরাসরি দেখার এবং তার সঙ্গলাভ করার। আমি দেখতাম, ইসলাম আমরা পড়াশোনা করি আর আফগানিরা ইসলামচর্চা করে। ইসলামের উদাহরণ আমরা সালাফের যুগ থেকে দেখানোর চেষ্টা করি আর আফগানিরা নিজেদের জীবনে ইসলামকে ফুটিয়ে তোলে। আমরা ইসলামকে পড়াই, তারা ইসলামকে দেখায়। এই জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের ঝান্ডা তুলে দেবেন না তো আর কার হাতে তুলে দেবেন! আপনি আফগানিস্তানের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখবেন ইসলামপূর্ব যুগেই তারা কখনো বহিরাগত শক্তির কাছে মাথানত করত না। পারস্পরিক কোনো কলহের কারণে শক্তিহীন অবস্থায় অনেকবার তারা বহিরাগত শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছিল; কিন্তু ইসলামের আগমনের পর আফগানিস্তানের ইতিহাস যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখবেন প্রতিটি যুগের পরাশক্তিগুলো আফগানিস্তানে এসেই তাদের সাম্রাজ্যবাদী মুখটি সম্পূর্ণরূপে খুইয়ে বসেছে। ব্রিটিশ বেনিয়া থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাল আমলের আমেরিকা সকলেই আফগানিস্তানে এসে তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিশ্বপরিচিতি হারিয়েছে। এই মানুষগুলো আল্লাহ তায়ালার খাস বান্দা। আমি মনে করি সুদীর্ঘ চার দশক ধরে যে মাটি থেকে আল্লাহ তায়ালা উম্মতের উত্থানের জন্য এত রক্ত গ্রহণ করেছেন, এত স্বাদ গ্রহণ করেছেন, নিশ্চয়

নিশ্চয়ই এই মাটি থেকে বড় পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ! আমি তো এত খবর রাখার সুযোগ পাই না। কিন্তু ইতিহাস থেকে এবং আফগানদের সাথে মেলামেশার সুবাদে বলতে পারি, তারা যদি আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল এবং পারস্পরিক ঐক্য ধরে রাখতে পারেন, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি অথবা সমগ্র পৃথিবীও তাদের মাথানত করাতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

তাদের ব্যাপারে এমনই ধারণা রাখি। আল্লাহ তায়ালা তাদের মাধ্যমে উম্মতকে বিজয় দান করুন এবং তাদের পথ আরো দৃঢ় করুন। তাদের হিম্মত, তাদের ঈমান, তাদের ঐক্য আরো সংহত করুন। আমিন।

দারুল উলুম মুঈনুল ইসলামের দারুল ইফতা

দেশে আসার পর হাটহাজারির দারুল ইফতা কেমন ছিল কীভাবে এই প্রকল্প এগিয়েছে এবং বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা।

দেশে আসার ব্যাপারে আমার কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। আমি তো পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলাম। নিউটাউনেই থাকতাম। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর দৈনিক এক ঘণ্টা সময় দিতাম সেখানে। সুদীর্ঘ তিন দশক শিক্ষকতা করার কারণে তারা আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিত। একবার হাটহাজারির সম্মানিত মুহতামিম সাহেব, আল্লামা আহমদ শফি রহিমাহুল্লাহ আমাদের ওখানে এলেন। উনার উমরায় যাওয়ার কথা ছিল। করাচি অবস্থানকালে একদিন আমার জামশেদ রোডের উসমানিয়া জামে মসজিদের বাসায় কিছু ছাত্রভাই নিয়ে সাক্ষাত করতে এলেন। দেখা-সাক্ষাতের পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে আর কতদিন থাকবে তুমি? দেশে চলো!

আমি বললাম হজরত, এখানে অনেকদিন ধরে খেদমতে আছি। একটা মহব্বত হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া আমি তো মাজুর হয়ে গেছি। এই অবস্থায় আমাকে নতুন জায়গায় কেউ খেদমতে নিতে চাইবে না!

উনি বললেন, তুমি যাবে কি না সেটি ভাবো! নেওয়ার ব্যাপারটি আমি দেখব। আমি উমরা থেকে এসে দেখা করব। তুমি চিন্তাভাবনা করো।

আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। এতদিনের মহব্বতের কর্মস্থল ছেড়ে দেশে যাব? আবার এখানে আমার যে ধরনের দেখভালের প্রয়োজন তাও ঠিকভাবে হচ্ছে না। বারবার ইসতিখারা করে দেশে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম। সুরা তাওবাতে তো আল্লাহ

তায়ালা আহলে ইলমকে নিজ এলাকায় গিয়ে দীন প্রচারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।[১০৭] সারাজীবন তো সেই সুযোগ হলো না। শেষবয়সে এসে যদি মুহতামিম সাহেবের মেহেরবানিতে এই সুযোগ হয়, তো খারাপ কী!

উমরা থেকে মুহতামিম সাহেব ফিরে এসে সরাসরি আমার বাসায় এলেন। আমি কী ঠিক করলাম জানতে চাইলে অসুস্থ অবস্থায় দেশে খেদমত চালিয়ে যেতে পারব কি না এই আশংকা ব্যক্ত করলাম। এরপর মুহতামিম সাহেব জবাবে যা বললেন তা আজও আমার অন্তরে সোনার হরফে লেখা আছে। উনি বললেন, "তুমি যেতে রাজি হয়েছ এটাই আমার এই সফরের বড় পাওয়া। আমি কাবাতুল্লাহয় তোমার জন্য দোয়া করেছি। আল্লাহ পাক যেন তোমার মন দেশের জন্য তৈরি করে দেন। আর আশংকার কথা বলেছিলে না! সেটি আমি দেখব। আমি বেঁচে থাকতে হাটহাজারিতে তোমাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না। তুমি এখানে যেমন এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছ, ওখানে তাই দেবে। তোমার এক ঘণ্টা খেদমত দেশে যে কারও ছয় ঘণ্টার সমান। বরং তোমার সমান কাজ কেউ করতেই পারবে না। মাশাআল্লাহ, তোমার মতো অভিজ্ঞতা ওখানে কারও নেই। আমি বেঁচে থাকতে ইনশাআল্লাহ তোমাকে কেউ কখনো কিছু বলবে না। আর আমাকে যখন আল্লাহ তায়ালা নিয়ে নেবেন তখন তোমার ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিয়ো। চাইলে থাকবে; আর নাহলে অন্য কোথাও চলে যাবে। তোমার অভিজ্ঞতা সবারই প্রয়োজন হবে। খেদমতের জায়গার অভাব হবে না তোমার।

মুহতামিম সাহেবকে আমি অনুরোধের সুরে বলি, হজরত, আমার অসুস্থতার পর আমার ব্যয়ভার অনেক বেড়ে গেছে। নিউটাউন আমার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। এই মুহূর্তে আমি হাটহাজারিতে চলে গেলে কি আমার পক্ষে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব হবে? অথবা আমাকে কি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতা করা হবে?

মুহতামিম রহিমাহুল্লাহ স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, মুফতি সাহেব, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ইনশাআল্লাহ আপনাকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

তখন আমি মাতৃভূমির টানে বলে উঠি, জি হজরত। আমি তাহলে দেশে ফিরে যেতে রাজি।

তখন মুহতামিম সাহেব বললেন, ওয়াদা করছেন তো?

আমি বলি, জি।

উনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, পাক্কা ওয়াদা তো?

আমি বলি, জি ইনশাআল্লাহ।

---

[১০৭]. দেখুন সূরা তাওবার ১২২ নং আয়াতের তাফসির।

অবশেষে মুহতামিম সাহেব আমাকে শাওয়ালের আট তারিখ পরিবারসহ দেশে ফিরে আসার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুরোধ করেন। এসময় আমি নিউটাউনে ইস্তফাপত্র জমা দিই। তারা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু মুহতামিম সাহেবের ব্যক্তিত্ব তাদের কাছে গুরুত্ব রাখত। তাই তারা আর বেশি চাপাচাপি করেননি। এসময় আমি চূড়ান্ত বিদায়ের পূর্বে মুফতি রশিদ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে যাই। তিনি আমার চলে যাওয়া কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তবে মুহতামিম সাহেবের আগ্রহের কথা শুনে তিনিও মেনে নেন। বিদায়ের সময় প্রচুর হাদিয়া-তোহফা দিয়েছিলেন আমাকে।

মুহতামিম সাহেব চলে আসার পরদিন পটিয়ার মুহতামিম আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী আমার কোয়ার্টারে আগমন করেন। তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি আমার কাছে এসেছিলেন। এবার তার পক্ষ থেকেও প্রস্তাব আসে। তিনি হাজি ইউনুস সাহেবের ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মূলত হাজি সাহেবও ইতিপূর্বে আমাকে পটিয়ায় যাওয়ার কথা বলেছিলেন। আমি সেসময় তাঁকে কিছুটা মত দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার অসুস্থতার ফলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এর মাঝে তিনি ইনতেকাল করলেন। তাই আমি জবাবে বলি, যার সাথে ওয়াদা করেছি তিনি ইনতেকাল করেছেন। আর আমি নতুনভাবে আল্লামা আহমদ শফি সাহেবের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। তা ছাড়া আপনার একার পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। আপনার ওখানে শুরা আছে। আপনি তো শুরার পাঁচজনের একজন। তাদের সবার মতামত জরুরি। হাটহাজারির মুহতামিম সাহেব তার বিশেষ এখতিয়ার থাকায় আমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই আপনার সাথে কোনো চুক্তিতে আসা আমার পক্ষে সম্ভব না। দোয়া করবেন যেন দীনের খেদমত নিজ মাটিতে করতে পারি। একথা বলে আমি তাকে বিদায় দিই।

হাটহাজারি হজরতের আশ্বাসবাণীর উপর ভরসা করে আর দ্বিমত করিনি। চলে এসেছি দেশে। হাটহাজারিতে যখন যোগ দিই, তখন এখানে মুফতি কেফায়াতুল্লাহ আর মুফতি জসিম আগে থেকেই কর্মরত ছিলেন। দারুল ইফতা বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। আমি যাওয়ার পর তারা আমার হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চান। আমি আমার দুর্বলতা সত্ত্বেও খেদমত গ্রহণ করি। বছরের শুরুতে কিতাব বণ্টনের সময় আমাকেও কিছু ঘণ্টা দেওয়া হলো। আমি মুফতি জসিম সাহেবের সাথে বসে পরামর্শ করলাম। সে আমার শাগরেদ অবশ্য। সে বলল, এখনই কিতাব নেওয়ার ক্ষেত্রে অপারগতা প্রকাশ না করে একটু অপেক্ষা করুন। আপনি এখন শারীরিকভাবে যথেষ্ট দুর্বল। ঘণ্টা এত না নিয়ে; বরং দারুল ইফতায় থাকুন। বাকিসব আমরা দেখব। এভাবে কয়েকটি ঘণ্টা দেওয়া হলেও আমি শুরুর দিকে এত ঘণ্টা নিতাম না। এরই মাঝে

তাখাসসুস ফিল হাদিস বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমাকে মুশরিফে আ'লা করে একটি সিলেবাস প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মূলত আমি বিগত কয়েক দশক ধরে ফিকহ্ ও ফতোয়ার পেছনে সময় দিয়ে এসেছি। তারপরও এই দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গেছি সে সময়। করাচিতে আমার প্রথম দুই বছর হাদিস ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ নিয়ে একাগ্র সময় কেটেছিল। আর আমি তো ব্যক্তিগতভাবে বানুরি সাহেবের কাছে হাদিসই পড়তে গিয়েছিলাম। তাখাসসুসের জন্য আমাকে মনোনীত করায় সেজন্য তেমন দ্বিমত করিনি। এটিকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবেই দেখেছি। তাখাসসুসের সিলেবাস প্রণয়ন বা সময় দেওয়া আমার জন্য কঠিন কিছু ছিল না। বরং হাদিসে নববির জন্য শত অযোগ্যতার পরেও সময় ব্যয় হবে ভেবে পুলকিত ছিলাম। সিলেবাস হিসেবে প্রাথমিকভাবে মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ, তাদরিবুর রাবিসহ আরো কিছু কিতাব যুক্ত করলাম। সময় এভাবে ভাগ করে নিলাম যে, ফজরের পর তাখাসসুস ফিল হাদিসে সময় দেব। আর জোহরের পূর্বে দু'ঘণ্টা দেব দারুল ইফতায়। আমার পক্ষ থেকে জসিম সাহেব এই প্রস্তাব মুহতামিম সাহেবের কাছে উপস্থাপন করেন। উনিও সাদরে গ্রহণ করে নেন প্রস্তাব। এভাবেই হাটহাজারিতে নতুন বছর শুরু করি। শুরু হয় দেশের মাটিতে খেদমতের নতুন জীবন।

আর চলে না শরীর!

দেখতে দেখতে এক বছর চলে গেল। আমার রুটিনের আল-আশবাহ ওয়ান নাজাইরের ঘণ্টা আমি নিতে পারতাম না। এই ঘণ্টার জন্য কিছু পূর্ব মুতালায়ার প্রয়োজন হতো। ডাক্তার আমাকে অতিরিক্ত মাথা না ঘামাতে বারণ করেছিলেন। মস্তিষ্কে অতিরিক্ত চাপ দিলে আমার অসুস্থাবস্থা আরো অবনতির দিকে যাবে, এই আশংকায় আমি বেশি চাপ দিতাম না। তাই এই ঘণ্টাটি আমি নিইনি। মুফতি জসিম ও মুফতি কেফায়াতুল্লাহ এই ঘণ্টাগুলো চালিয়ে নেন। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

এভাবে বছর পেরিয়ে যেতে থাকে। একবার কিতাব বণ্টনের সময় আমাকে এক মুহাদ্দিস সাহেব অনুরোধ করেন যেন আমি হাদিসের কোনো কিতাবের দরস গ্রহণ করি। আমার জন্য এটি একটি সুসংবাদের মতোই ছিল। এই দুর্বল বুড়োকে এখন কে-ইবা হাদিসের ঘণ্টা নিতে বলবে! আমি খুবই আনন্দের সাথে রাজি হয়ে যাই। হাদিসে নববির সাথে যুক্ত থাকার মতো সৌভাগ্য কজনেরই হয়! আমি তো সুস্থ থাকতে নিউটাউনে কত ঘণ্টা নিয়েছি! এখানেও যদি এই অধমকে ঘণ্টা দেওয়া হয়, কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করব।

মুহতামিম সাহেব শাহ আল্লামা আহমদ শফি সাহেব রহিমাহুল্লাহ আমার পূর্বে সুনানে নাসায়ির ঘণ্টা নিতেন। উনি অসুস্থ হয়ে গেলে আমাকে উক্ত কিতাব

পাঠদানের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। এভাবে আমার উপর পাঁচটি ঘণ্টা এসে যায়। আগের চেয়ে একটু সুস্থ বোধ করায় ঘণ্টাগুলো চালিয়ে যেতে থাকি।

আজ আমি অবাক হয়ে ভাবি, কীভাবে আমি এতগুলো ঘণ্টা চালিয়ে নিতাম। হাঁটতে পারতাম না ঠিকভাবে। কিছু তলাবা ভাই আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি সেজন্য। আসলে হাদিসের দরস দিতে খুব আনন্দ পেতাম। বিশেষত সুনানে নাসায়ির দরস দিতে খুব ভালো লাগত। মুহতামিম সাহেব আমার জন্য খাস দোয়া করতেন। দরসে আমি নিউটাউনের পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করি। আল্লামা বানুরি সাহেব যেভাবে দরস দিতেন, ঠিক সেভাবে। উনার দরসের পদ্ধতি ছিল একদম অনন্য। উনি খুব দ্রুত গতিতে তাকরির করতেন। এত দ্রুত যে, কেউ তাকরির সংকলন করতে পারত না। আর হাওয়ালার (তথ্যসূত্র) ঝড় বয়ে যেত। একেক দরসে কমসে কম বিশটি কিতাব থেকে হাওয়ালা দিতেন। কখনো তো হাওয়ালার সংখ্যা পঞ্চাশটি কিতাব ছুঁয়ে যেত। শাহ সাহেবের মতো করেই হুবহু তাকরির করতেন তিনি। আমিও নাসায়ি শরিফ শুরুর সময়ে প্রায় এক সপ্তাহ তাদবিনে হাদিসের উপর তাকরির করতাম। কিতাব শুরু করার পর প্রত্যেক হাদিসের ইসনাদ ও রিজালের উপর বিস্তারিত আলোচনা হতো। এরপর হাদিসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় চলে যেতাম। অতঃপর মাজহাব ও মাজহাবের ইমামদের মতানৈক্য আলোচনা হতো। আলোচ্য হাদিস কোন ইমামের দলিল, তাও উঠে আসত আলোচনায়। অন্য কোন কোন কিতাবে হাদিসটি এসেছে তারও বর্ণনা দেওয়া হতো। এভাবেই আমি নিউটাউন ও হাটহাজারিতে হাদিসের দরস ও তাকরির করতাম। তলাবায়ে কেরাম খুব খুশি হয়েছিলেন আমার এই পদ্ধতির তাকরিরে।

এদিকে তাখসসুস ফিল হাদিস বিভাগেও সমান শ্রম দিতাম। এখানে আমার শুরু সময়ের যেসব ছাত্রভাই ফারেগ হয়েছিলেন, তারা দেশ-বিদেশে বেশ নাম করেছেন। এদের মাঝে দুজন বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে পুনরায় এখানে খেদমতের জন্য ফিরে আসেন। একজন ছিলেন গাজি সাহেবের নাতি। আরেকজন ভাই জামেয়া আজহার থেকে ফারেগ। অনেক মালুমাতের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তরুণ উদ্যমী আলিম। এই ভাইয়েরা ফিরে এসে নিজেদের বিভাগের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। আমি এই সুযোগে অব্যাহতি নিয়ে নিই। হাদিসশাস্ত্রে তাদের মতো তরুণ আলিমরা সময় দিলে নিজেদের ও সমাজের ফায়দা হবে- এই ভেবে আমার সরে আসা। দীর্ঘদিন দারুল ইফতায় কাটানোর ফলে এখানে সময় দেওয়া আমার জন্য সহজ ছিল। তবে এই স্বাস্থ্যে মনে হচ্ছিল আমার একটু আরামেরও প্রয়োজন। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে আমি তাখাসসুস ফিল ফিকহেও সময় স্বল্প করে দুই ঘণ্টা করে দিই। আমার প্রিয় দারুল ইফতাতেই দিতে থাকি অধিকাংশ সময়।

বড়দের স্নেহ

হাদিসের দরস চলাকালে একটা ঘটনা মনে পড়ল। একবার মুফতি আহমাদুল হক সাহেবের জামাতা নোয়াখালী থেকে হাটহাজারিতে আসেন। উনার নাসায়ি শরিফের একটা হাদিসে একটা ইশকাল ছিল। শ্বশুরমশাইকে জিজ্ঞেস করলে উনি আমার কাছে প্রেরণ দেন। আমি তো শুনেই অবাক। এতবড় মুহাদ্দিস সাহেব আমার কাছে জামাইকে পাঠিয়েছেন। আমি আদবের সাথে প্রশ্ন শুনে উত্তর দিলাম। আর জামাইবাবুকে বললাম, হুজুরকে গিয়ে আমার উত্তর বলবেন। ঠিক কি না জেনে নিতে হবে তো! উনি ফিরে গিয়ে মুফতি আহমাদুল হক সাহেবকে জানান। হুজুর খুশি হয়ে বলেন, আমাদের মুফতি সাহেব একজন দক্ষ মুহাদ্দিসও বটে। উনি আসলে আমাকে খুব মহব্বত করতেন। এজন্য উৎসাহমূলকভাবে অনেক কিছুই বলতেন। আমি সেসবকে দোয়া হিসাবেই নিয়েছি।

এভাবে বছর গড়িয়ে যেতে থাকে। আমিও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ি। দেখতে দেখতে আট বছর পেরিয়ে যায়। এসময় একটি সফরের অনুরোধ আসে। দক্ষিণ আফ্রিকায়। একটু খুলেই বলি।

আফ্রিকার ডাক

আমি যখন নিউটাউনে ছিলাম তখন আমার দুজন আফ্রিকান তালিবে ইলম ভাই আমার সাথে থাকত। একজন ছিলেন ইসমাইল বামজি সাহেব। নিউটাউনে নায়েবে নাযিমে তালিমাত ছিলেন। তরুণ আলিম। উনি একবার পাঁচজন সাথিসহ হাটহাজারিতে এসে পড়েন। আমার সাথে সাক্ষাত করে তারা খুব খুশি প্রকাশ করেন। আমি উনাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে উনারা জানান, 'আমরা কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।' এটা বলা যায় ২০১০ এর দিকের ঘটনা। আমি নিশ্চিত নই। তবে কাছাকাছি সময়ই হবে। ইসমাইল বামজি সাহেব মূলত ভারতের গুজরাটের আদি বাসিন্দা। উনার পূর্বপুরুষ হিজরত করে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। সেখানে মুসলমানদের এক বিরাট কমিউনিটি এভাবে তৈরি হয়। অনেক দীনদার পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদের দীন শেখানোর জন্য ভারতে বা পাকিস্তানে পাঠিয়ে থাকেন। সেই সুবাদেই ইসমাইল সাহেব পাকিস্তানে এসেছিলেন। নিউটাউন থেকে তালিম হাসিল করে আলিম হয়ে আবার নিজ দেশে ফিরে যান। উনি আমার খুবই নৈকট্যভাজন শাগরেদ ছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র, নেক ও উদ্যমী মানুষ। হাটহাজারিতে উনাদের আগমনের কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল।

১. দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি উন্নতমানের দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করা, যা সমকালীন বিশ্বে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করবে।

২. এই বিভাগের জন্য একটি আধুনিক সিলেবাস প্রণয়ন করা এবং কিছু যোগ্য শিক্ষককে দুমাসের মেয়াদে ট্রেনিং দেওয়া।

৩. এই বিষয়টি ছিল খুবই আগ্রহ-উদ্দীপক। নোবেল বিজয়ী শাসক নেলসন ম্যান্ডেলার আহ্বানে মুসলমানদের বিবাহের জন্য যে ইসলামি সামাজিক আইন রয়েছে, তার একটি বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবনার রূপ দেওয়া। দক্ষিণ আফ্রিকান সমাজে সেটি প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

মূলত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই আহ্বান করা হয়েছিল। আফ্রিকায় বিবাহ-তালাক নিয়ে খ্রিষ্টান ও আঞ্চলিক গোত্রীয় সামাজিকতায় খুবই সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। তারা সুষ্ঠু ধর্মীয় ও সামাজিক আইন না থাকায় খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। খ্রিষ্টানসমাজ এসব সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হচ্ছিল। ঠিক এই সময় ম্যান্ডেলা শুনতে পান, মুসলিমদের ধর্মীয় আইনে বিবাহ-তালাকের খুবই চমৎকার ও সুষ্ঠু নীতি রয়েছে। তাই তিনি বিলম্ব না করে বড় বড় আলিম ও এসোসিয়েশন ম্যানেজমেন্টকে দাওয়াত দেন। তাদের বলেন, যদি ইসলামি আইনে আমাদের সমাজের এই সমস্যার সমাধান ভালোভাবে দেওয়া থাকে, যা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব, তা হলে সেটিই করা হবে। আইনের সূত্র দেখে (ইসলামের প্রতি ইশারা) আমাদের কী লাভ! আমাদের দেখতে হবে আইনের প্রয়োগে সমাজে শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসছে কি না!

এই আহ্বানে উপস্থিত ইসলামি মহল তো হতবাক হয়ে যান। ভিন্ন ধর্মের হয়ে উনি কীভাবে অন্য ধর্মের আইন বাস্তবায়নের পথে নেমেছেন!

আসলে এখনকার পৃথিবীতে সবাই সেক্যুলার হয়ে গেছেন। ধর্মের অনুশাসন ও সেখানে বর্ণিত আইনের প্রয়োগ না থাকায় ধর্মের অবস্থান মানব-জীবনে অত্যন্ত সংকীর্ণ এখন। ম্যান্ডেলা যেখানে তাঁর দেশ ও সমাজের স্থিতিশীলতা দেখছিলেন, সেটিই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কোন ধর্মের আইন তা উনি দেখতে যাননি। যদিও উনি খ্রিষ্টান ছিলেন; কিন্তু জানতেন খ্রিষ্টধর্ম এসব সমস্যার সমাধান দিতে বহু শতাব্দী পূর্বেই ব্যর্থ হয়েছে। আর ব্যক্তি হিসেবে নেলসন ম্যান্ডেলা খুবই সহজ সরল ও যৌক্তিক মানসিকতা লালন করতেন। শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সহাবস্থানে বিশ্বাস করতেন। উনি ক্ষমতায় আসার পর সেখানে বসবাসরত মুসলমানরা যেকোনো শহরে জায়গা-জমি কেনার অধিকার পায়। আরো নানান নাগরিক সুবিধা তাদের দেওয়া হয়, যা পূর্বের ক্ষমতাসীনদের অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ ইহুদিদের সময়ে তারা পাননি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইসলামি মহল ও আলিমগণ একত্রিত হয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য তারা যোগ্য ব্যক্তির খোঁজ করতে থাকেন। ইসমাইল বামজি সাহেব এই কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। মুফতি আব্বাস আলি জিন্নাহ জমিয়তে ওলামায়ে আফ্রিকার সভাপতি ছিলেন। এই জমিয়তের কমিটিতে তিনশজন আলিম যুক্ত ছিলেন। এটি আফ্রিকার আলিমদের সবচেয়ে বড় মজলিসে শুরা ছিল। ইসমাইল বামজি সাহেব একপর্যায়ে আমার কথা প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবনার কারণ হিসেবে নিউটাউনে আমার দীর্ঘকালীন খেদমতের কথা ও আরো কিছু খেদমতের কথা তুলে ধরেন। সেই প্রেক্ষিত থেকেই কমিটি আমার ব্যাপারে একমত হন। মুফতি আইয়ুব সাহেবের মতো কমিটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্যসহ ইসমাইল সাহেবকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়।

আমি সব বৃত্তান্ত শুনে নীরব হয়ে যাই। একে তো আমি মা'জুর। এরপর দীর্ঘ দুমাস অবস্থান করা আসলেও একটি কঠিন বিষয়। তা ছাড়াও আমি সেখানকার ভাষা বা ইংরেজি ভাষা কোনোটাই জানি না। তরজমা করে এতবড় কাজ আনজাম দেওয়া একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি ইসমাইল সাহেবকে মনের কথাগুলো জানালাম। উনি বললেন, এগুলো কোনো সমস্যাই না হজরত! আমরা ভাষাগত ও আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি এসব সামলে নেব। এরপর দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি নেওয়ার বিষয়টাও থেকে যায়। মুহতামিম সাহেব খুশিমনে ছুটি দেবেন কি না! এ ব্যাপারে ইসমাইল সাহেব বললেন, আমরা মুহতামিম হুজুরের সাথে দেখা করব। হাটহাজারির সহযোগিতায় থাকব আমরা ইনশাআল্লাহ আর আপনি তো মাশাআল্লাহ উম্মতের সম্পদ। আপনাকে দেশে-বিদেশে অনেকেই চায়। উনি দ্বিমত করবেন না আশা করি।

কথামতো ইসমাইল সাহেব মুহতামিম সাহেবের সাথে দেখা করেন। ঠিকই মুহতামিম সাহেব সন্তুষ্টির সাথে এক-দু মাসের দীর্ঘ ছুটি প্রদান করেন। আমি ইসমাইল সাহেবকে নিবেদন করি, আমার সাথে দুয়েকজনকে সহযোগী হিসেবে নেওয়ার জন্য। যেহেতু আমি একা খেদমত আনজাম দিতে পারব না; তাই সাথে দুজন ভালো মুফতি সাহেবকে নেওয়ার ইরাদা করলাম। আমাদের এখান থেকে মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সাহেব ও ঢাকা থেকে একজনকে নিলাম। উনি ছিলেন মালিবাগের মুফতি মাহমুদুল হাসান সাহেব। ঢাকার শহীদুল ইসলাম খুব আবদার করে যেতে চেয়েছিলেন। আমাকে কয়েকবার ফোন করে অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু আমার তো কাজের লোক প্রয়োজন। সেজন্য তরুণ মানুষ বেশি উপযোগী হবে। তাই মুফতি মাহমুদ সাহেবকে নেওয়া।

আলো নিয়ে অন্ধকারে

ইসমাইল বামজি সাহেব আমাদের তিনজনের বিমান টিকিট করে ফেললেন। আমরা তিনজন এবং ইসমাইল সাহেবের সফরসঙ্গীগণ সবাই এক মাসের ব্যবধানে আফ্রিকা সফরে গেলাম। বিমানে যাত্রার সময় মাঝে কাতারে বিরতি দিয়ে আবার বিমান উড়াল দিল। সবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে নামলাম আমরা। বিমানবন্দরে এক ঘণ্টা লাগল বাধ্যবাধকতা সারতে। এরপর দেখা পেলাম ইসমাইল বামজি সাহেবের। প্রথমে গাড়িতে করে তার অফিস হয়ে সেখান থেকে পৌঁছলাম ইসমাইল সাহেবের বাসায়। আলিশান বাড়ি মাশাআল্লাহ। সামনে বিশাল চত্বর। ঘাসে ঢাকা উঠান। খেলার জন্য কোর্টও আছে। আমি তো অত বুঝি না কোনো খেলা। তবে মনে হয়েছিল খেলার জায়গাই। হতে পারে এখানকার মানুষ অনেক স্বাস্থ্যসচেতন। সবাই শরীরচর্চা করেন। পুরো দুই মাস আমরা এখানেই ছিলাম। উনি একদম নতুন মেহমানের মতো করে এই পুরো সময়টা আমাদের মেহমানদারি করে গেছেন। আমি তো মা'জুর মানুষ। কিন্তু আমার সঙ্গী দুজন আলহামদুলিল্লাহ ভালোই সময় উপভোগ করেছেন।

আফ্রিকায় তখন বেশকিছু বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। শাইখুল হাদিস সাহেবের (শাইখ জাকারিয়া) নামে একটি বড় প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের কাজ মূলত এই প্রতিষ্ঠানেই ছিল। ইসমাইল সাহেব আমাদের প্রতিদিন সেখানে নিয়ে যেতেন। একবার টানা এক সপ্তাহ এখানে অবস্থান করেছিলাম। দুয়েকদিনের মধ্যেই আমরা কাজে হাত দিলাম। কিন্তু তাকদিরের লিখন আর আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাদের সব কাজ পুরোপুরি আনজাম দিয়ে আসতে পারিনি।

প্রথম কাজের কথায় আসি। আফ্রিকাজুড়ে অনেক আধুনিক ও জটিল সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল। এই সমস্যাগুলো আমার সামনে একে একে তুলে ধরা হতে থাকে। আমিও সাধ্যমতো সেগুলো নিয়ে কাজ করছিলাম। আমাকে আমার সঙ্গীদের উপর অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হচ্ছিল। মাশাআল্লাহ তারাও যোগ্য সাথি ছিলেন। আমার নেগরানিতে তারা সমস্যাগুলো প্রায় অনেকটাই সমাধান করে ফেলেছিলেন। এগুলোর মধ্যে অনেক মাসআলা ছিল পারিবারিক, কিছু সামাজিক, কিছু অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়। অত্যন্ত দুঃখের সাথে আরজ করব, আমার মতামত ও চিন্তাধারার উপর ইসমাইল বামজি সাহেবের অগাধ আস্থা ছিল। তিনি সেভাবে আফ্রিকার আলিমদের বুঝিয়েছিলেন। আমি যে কিছু কিছু মাসআলায় কঠোরতা অবলম্বন করি এটিও ইসমাইল সাহেব জানতেন, যেহেতু তিনি আমার সরাসরি শাগরেদ। কিন্তু আমার সাথিদের মধ্যে কেউ একজন (যার নাম আমি উল্লেখ করব না। আল্লাহ তাকে মাফ

করুন) আলিমদের শুরু থেকেই আমার কঠোরতার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত আলিমগণ কিছু কিছু মাসআলায় আমার অবস্থান পর্যবেক্ষণও করেছিলেন। একপর্যায়ে তাদের মাঝে মতানৈক্য হয়ে যায়। একদল আমার কঠোরতামূলক মাসআলা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, অপরদল রুখসতের মাসআলা চাচ্ছিলেন জনগণের জন্য। আমি এই ব্যাপারে জানতে পেরে নিবেদন করি, ঠিক আছে। আপনারা সেইসকল সমস্যা চিহ্নিত করে রাখুন। অন্য কোনো বড় মুফতি সাহেবের নিকট থেকে সমাধান করে নেবেন। এভাবেই প্রথম কাজটি সামান্য অপূর্ণতায় থেকে শেষ হয়।

দ্বিতীয় কাজটি শুরু হয় ঠিক এর পরপর। একটি মানসম্মত দারুল ইফতা ও তাখাসসুস ফিল ফিকহ বিভাগ শুরু করা। আমরা টানা দুই সপ্তাহ কাজ করি এটি নিয়ে। যেহেতু ওখানে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে প্রচুর সংখ্যক, বলা যায় সিংহভাগ তলাবা আসেন; তাই আমাদের চার মাজহাবের ফিকহের উপর নজর রাখতে হচ্ছিল। সিলেবাস এমনভাবে প্রণয়ন করতে হচ্ছিল, যাতে সকলেই এখানে এসে তাদের মাজহাবের প্রাথমিক ও মৌলিক ধারণা লাভ করেন। পরবর্তী অধ্যয়নের উপর নির্ভর করে নিজ মাজহাবের উপর তাফাক্কুহ (বিশেষ ব্যুৎপত্তি) অর্জন করে নিতে পারবেন তারা। এভাবে আমরা তাখাসসুসের সিলেবাস প্রণয়নের কাজটি সমাপ্ত করি।

দারুল ইফতার ব্যাপারে আমরা সাথিদের সাথে একটি পরামর্শ করি। কিছু যোগ্য উসতাদকে নির্বাচন করা হবে, যারা ফিকহের উপর ভালো ধারণা রাখেন এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়নে আগ্রহী। আমি এবং আমার দুই সাথি এই দীর্ঘ দুই মাস তাখাসসুসের প্রাথমিক কিতাবাদির ব্যাপারে ধারণা দেওয়ার জন্য তাদের দরস দিতে থাকব। আর মাসআলা লেখার ব্যাপারেও তাদের সহযোগিতা করব। এভাবে আমাদের দ্বিতীয় কাজটিও চলতে থাকে।

তৃতীয় কাজটি আপনাদের মনে আছে বোধহয়। আফ্রিকান সমাজে ইসলামি বিবাহের আইন বাস্তবায়িত করা। সে হিসেবে কিছুদিন কাজ করে আমরা একটা খসড়া তৈরি করি। সেখানে অমুসলিম নাগরিকদের কথা বিবেচনা করে কিছু বিষয় আমরা সহজসাধ্য করে তুলি। মুসলিমরা তো তাদের মতো করেই বিয়েশাদি করে থাকেন। সুতরাং তারা তো এই আইন দেখে বিয়েশাদি করবেন না। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমরা কিছুদিন পর শুনতে পেলাম, ম্যান্ডেলা সাহেব এই প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছেন। আলিমগণ বিষয়টি জানতে পেরে খুবই অবাক ও বিস্মিত হন। কী এমন ঘটল যে ম্যান্ডেলা হঠাৎ করে ঘুরে বসলেন। ইসমাইল সাহেব আমাকে খুবই

সংকোচ ও দুঃখের সাথে খবরটি জানালেন। আমিও শুনে অত্যন্ত আফসোস প্রকাশ করি। কাজটি সম্পন্ন হলে এই সমাজের জন্য কত উপকার হতো! ইসলামি আইন মানলেও সমাজে শান্তি বিরাজ করে। বিবাহের মতো জীবনের এরকম একটি বড় অনুসঙ্গকে তারা ইসলামি মতে পালন করতে থাকলে অবশ্যই এর প্রভাব পড়ত তাদের আগামী জীবনে। কিন্তু কী করবেন, তাকদিরের লিখন তো খণ্ডানো যায় না!

হয়েও হলো না!

দুদিন পর ইসমাইল সাহেব সাক্ষাত করতে এলেন। উনাকে দেখেই মনে হচ্ছিল খুব ভারাক্রান্ত। বিষণ্নতা ছেয়ে গেছে তাঁর প্রশস্ত ললাটে। উঁচু, দীর্ঘ কিন্তু বিনয়ী এই মানুষটিকে দেখলে আপনার মনেই হবে না যে উনি একজন যোগ্য আলিমে দীন। মনে হবে তিনি একজন বড় খেলোয়াড়। আমার পাশে এসে বসে আমার হাতটি নিজের হাতের মাঝে নিয়ে বলতে লাগলেন, হজরত মুফতি আবদুস সালাম সাহেব! আমি খুবই দুঃখিত। আমাকে মাফ করবেন। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কী হয়েছে সেটি তো বলবেন! ইসমাইল সাহেব যা বললেন, তা আমার জন্যও বিষণ্নতার কারণ হয়ে গেল। ভাবতেই অবাক লাগছিল নিজেদের মানুষ এমনটা কীভাবে করতে পারল!

আসলে যেটা হয়েছিল, আফ্রিকায় নানা ঘরানার দীনদার মুসলিমরা হিজরত করেছিলেন। আমাদের সমাজে দীনদার যে কটি ঘরানা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাদের সবকটিই সেখানে রয়েছে। মাসআলার ক্ষেত্রে আমরা যে মতানৈক্য করে থাকি, তা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে রয়েছে। আমরা কখনো জাতীয় স্বার্থ বা ইসলামি স্বার্থের বাইরে গিয়ে মতানৈক্য করি না। এটাই উসুল ও পদ্ধতি, যা আমাদের বড়রা আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু এখানে থাকা অন্য ঘরানার কিছু আলিম এই ইস্যুর ব্যাপারে জানতে পেরে একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। তারা ভাবতে থাকেন যে, এখানে যদি দেওবন্দি মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ-শাদির ক্ষেত্রে আমরা যেই মাসআলা মেনে চলি, তা রহিত করতে হবে।[১০৮] এই ভাবনা থেকে প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলার সাথে তারা দেখা করেন। এই অভ্যন্তরীণ বিষয়টিই তারা প্রকট আকারে ম্যান্ডেলার সামনে এমনভাবে তুলে ধরেন যেন এটি অনেক বড় অভ্যন্তরীণ সমস্যা। অর্থাৎ এমন একটি বিষয় যা নিয়ে মুসলিমরা নিজেরাই একমত নয়। নাউজুবিল্লাহ! এই কথা শুনে ম্যান্ডেলা খুবই চিন্তিত হয়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই খুব বিরক্তির সাথে

---

[১০৮]. তিন তালাকে এক তালাক- এই মত মেনে চলা একটি ধর্মীয় ঘরানা। সঙ্গত কারণেই তাদের উল্লেখ এখানে করা হলো না।

সেই আলিমদের জানান যে, আমি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। নতুন কোনো অশান্তি চাই না। একই কথা তিনি ইসমাইল সাহেবদেরও জানিয়ে দেন। এভাবেই আফ্রিকান সমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠার একটা বড় সুযোগ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

কিন্তু ম্যান্ডেলা সাহেব ইসমাইল সাহেবদের প্রস্তাবনা ও আফ্রিকান সমাজে তাদের অবস্থানের কারণে অনেক প্রীত ছিলেন। তিনি দেওবন্দি আলিমদের জন্য ২৪ ঘণ্টার একটি রেডিও স্টেশন খুলে দেন। সেখানে আলিমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে থাকেন। আমাকেও ইসমাইল সাহেব একদিন গিয়ে অনুষ্ঠান করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি যেতে ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু পরে জানতে পারলাম তারা এই প্রোগ্রাম করার সময় ছবি তোলেন। মহিলারাও সেখানে থাকেন। এসব শুনে যাওয়ার ইচ্ছা কমে যায়। তখনই আমি বামজি সাহেবকে ডেকে প্রোগ্রামে যেতে অপারগতা প্রকাশ করি। এর বদলে আমি কিছু আলোচনা লিখে দিই, যা আমার সাথি সেখানে গিয়ে আলোচনা করেন।

সাথিদের সাথে

দেখতে দেখতে দুমাস শেষের দিকে এসে যায়। আমার সাথিরা তাখাসসুসের ঘণ্টাগুলো নিচ্ছিলেন। আমিও দেশে যাওয়ার জন্য কিছুটা অস্থির হয়ে পড়ি। মনটা একটু খারাপ ছিল। এতদূর থেকে এলাম। কাজগুলো পূর্ণ করতে পারলাম না। ইসমাইল সাহেব আমার সাথে দেখা করতে এলে আমার মনোভাব বুঝতে পারতেন। আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। উসতাদজি, আপনার সান্নিধ্যই আমাদের জন্য সৌভাগ্যের। আপনি এতদূর এসে আমাদের সান্নিধ্যের পরশ দিয়েছেন, এটাই আমাদের জন্য পরম পাওয়া। বড় মনের মানুষ ছিলেন ইসমাইল সাহেব। আমি তার কামিয়াবির জন্য আজও দোয়া করি।

আমার সাথিরা ওখানে সময় বেশ উপভোগ করছিলেন। একজন তো সেখানে থেকে যাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি কঠোরভাবে নিষেধ করাতে তারা নিবৃত্ত হন। একদিন তারা আফ্রিকার জঙ্গল দেখতে যাওয়ার ইচ্ছায় আমার কাছে অনুমতি নিতে আসেন। আমি বলি যে, দেখুন! আমারও তো ইচ্ছা ছিল অনেক। কিন্তু কাজ যেহেতু আমরা সম্পূর্ণ করতে পারিনি, তাই এ ধরনের উপভোগকারী ইচ্ছাগুলো দমিয়ে রাখুন। অন্য কোনো সময় আল্লাহ যদি আবার আনেন, তখন দেখে যাবেন। এভাবে আফ্রিকার দিনগুলো আমাদের শেষ হয়ে যায়।

ইসমাইল সাহেব আমাদের জন্য তিনটি টিকিট কেটে দেন। মেহমানদারিতে অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। আমি এমন শাগরেদের উসতাদ হতে পেরে গর্বিত বোধ করছিলাম। ইসমাইল সাহেব আমাদের পথ খরচ ছাড়াও আমাকে দু হাজার আফ্রিকান ডলার, আমার প্রত্যেক সাথিকে দেড় হাজার ডলার হাদিয়া দেন। আর হাটহাজারিতে আমাদের দীর্ঘ দুমাস ছুটি দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান এবং বিশ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেন। আমরা উনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেশে ফিরে আসি। দেশে আসার পর আমার শরীর আরো অবনতির দিকে চলে যায়। আগের ঘণ্টাগুলো নেওয়ার সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলি। আগে আবু দাউদ পড়াতাম। এই ঘণ্টাগুলো আমার সহকর্মীদের দিয়ে দিই। ধীরে ধীরে নাসায়ি শরিফের দরসও ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। এভাবে শারীরিক দুর্বলতার কারণে দারুল ইফতায় আমার চলাফেরা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সফরে সুলুক

ইসলামে তাজকিয়া একটি ফরজ আমল। আলিমদের জন্য তো এটি আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারা মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্ব দেন। মহান আল্লাহ পাকও নিজ কালামে নানা জায়গায় এই বিষয়ে গুরত্বারোপ করেছেন। আমার সুলুকের সফর কেমন ছিল একটু আলোচনা করছি! আসলে জীবনের সব অনুষঙ্গ নিয়েই টুকরো স্মৃতি আমি স্মরণ করার চেষ্টা করছি। মনটা যেহেতু ভারাক্রান্ত, তাই আল্লাহ কারিম চাইলে অন্য কোনো সময় বিস্তারিতভাবে নানা বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রয়েছে।

ছাত্রজমানা থেকেই আমার সবসময় উসতাদদের সাথে থাকার শখ ছিল। তাদের সান্নিধ্যে থেকে ইলম শিখব। আখলাক শিখব। মানুষের মতো মানুষ হব। আমার মধ্যে এই স্পৃহা আমার শ্রদ্ধেয় চাচাজান মৌলবি ইয়াকুব সাহেবের মাধ্যমে এসেছিল। তিনিই আমাকে সাথে রেখে রেখে উসতাদের সাহচর্যের মূল উৎসাহটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। যখন আমি বাবুনগরে পড়াশোনা করি, তখন পটিয়ার মুফতি আযিযুল হক সাহেবের হাতে বাইয়াত হবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। উনি সেসময় এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বুজুর্গ ছিলেন। উনার প্রতি একটা চুম্বকীয় মহব্বত কাজ করত। বাবুনগরের দ্বিতীয় বছরে সিদ্ধান্ত নিলাম এখন বাইয়াত হওয়া দরকার। কিন্তু সেই যুগে ছাত্রজমানায় সহজে বাইয়াত করানো হতো না। বিশেষত মুফতি আযিযুল হক সাহেব তো আলিমদেরও অনেক শর্তসাপেক্ষে বাইয়াত করতেন। সে সময় আরো কিছু উঁচুমাপের বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, যাদের হাতে চাইলে বাইয়াত হতে পারতাম। যেমন হারুন বাবুনগরি। কিন্তু হারুন সাহেব হুজুর আবার আমাকে 'অন্যরকম' মহব্বত করতেন। এমন খোলামেলা সম্পর্কে পিরের ভূমিকায় উনাকে দেখাও সম্ভব ছিল না। এভাবে বিলম্ব হতে থাকে।

হঠাৎ একদিন আমাকে বোবা করে দিয়ে একটি দুঃসংবাদ এলো। শুনলাম মুফতি সাহেব আর পৃথিবিতে নেই। এত আফসোস আমার আর কখনো হয়নি যতটা সেদিন হয়েছিল। উনি চলে যাওয়ায় শোকের চেয়ে আমার আফসোস বেশি ছিল। উনি তো রাব্বে কারিমের কাছে মাকবুলিয়াত নিয়ে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু আমরা তো তাঁর সান্নিধ্য থেকে মাহরুম হলাম। আমার মনে পড়ে এটা ছিল ১৩৮০ হিজরি সাল। ১৫ রমজান, শুক্রবার। উনার জানাজার নামাজ পড়ান আন্দরকিল্লা শাহি মসজিদের ইমাম ও খতিব, সাইয়েদ আবদুল করিম মাদানি। উনার দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমি টানা কয়েকদিন মসজিদের কোণে বসে প্রতি বছর উনার জলসার কথা স্মরণ করতাম। কী নুর ছিল তাঁর কলবে! লাখো হৃদয় আলোকিত করেছে সেই নুর।

মুফতি সাহেব চলে যাওয়ার পর উনার খলিফাদের প্রতি মনোযোগ দিই। আমি এই সময় বাইয়াতের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম। সুলতান নানুপুরি সাহেবের প্রতি আমার বিশেষ নজর ছিল। উনি মুফতি সাহেবের বিশেষ খলিফা। অসাধারণ রুহানিয়াত। আলিমে রব্বানি, জাহিদুদ দুনিয়া। উনার সাথে ছোটকালে আমাদের বাড়ির কাচারির বৈঠকে বসে জিকির করেছি। এক আশ্চর্য তন্ময়তা ছেয়ে যেত তার হালকায়। আমি যখন বাবুনগরে, তখন সুলতান সাহেব নানুপুরি বিখ্যাত ওয়ায়েজ ছিলেন। বুখারি শরিফের দরসও দিতেন। উনার সাদামাটা ইসলাহি বয়ানগুলোর কারণে লোকজনের অন্তরে দীনের মহব্বত খুব সহজেই প্রবেশ করত। মুফতি সাহেবের পর আমি নানুপুরি সাহেবের ব্যাপারে ভাবছিলাম। এই সময় আমার উপরের জামাতের এক সাথি ভাই, যিনি নানুপুরি সাহেবের বাইয়াতে ছিলেন, আমাকে তার ব্যাপারে আরো আগ্রহী করে তোলে। দুজন মিলে একদিন তার জলসায় গেলাম। সেদিন ওয়াজ করলেন গুনাহের ভয়াবহতা নিয়ে। এত বেশি অনুতাপ এলো অন্তরে, সেই রাতে ঘুমাতেই পারলাম না। পরদিন সেই ভাইকে জানালাম আগামীতে নানুপুরি সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে আমাকে সাথে নেবেন। এটা তখনকার ঘটনা যখন উনি বাবুনগর থেকে চলে গিয়েছিলেন।

নানুপুর : গোড়ার ইতিহাস

সুলতান সাহেব নানুপুরি পনেরো বছর বাবুনগরে খেদমত করেছেন। আশপাশের পুরো অঞ্চলে তার ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ প্রভাব ছিল। এরপর কোনো কারণে তিনি নানুপুরে চলে যান। সেখানে বাজারের পাশে একটা ছোট্ট জায়গায় পুরোনো একটি মাদরাসা ছিল। এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা লাল মিয়া সাহেব। তখন সেখানে মাত্র দুটো কামরা ছিল। এই ভদ্রলোক একাই কয়েক জামাতের কিতাব পড়াতেন সে সময়। আওয়াল থেকে হিদায়া পর্যন্ত। তিনি একসময় ইনতেকাল করেন। এরপর এই মাদরাসা এভাবেই পড়ে থাকে। পটিয়ার মৌলবি মুস্তাফিজুর রহমান

এবং দেওবন্দ ফারেগ আমিরুদ্দীন সাহেব, এই দুজন মিলে এরপর আবার মাদরাসাটি চালু করেন। কিছুকাল পর এক আল্লাহর বান্দা সামান্য জায়গা দান করে। সেখানেই এই দুজন মাদরাসাটি স্থানান্তরিত করেন। এরপর বেশ কবছর এই দুই আলিম প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যান। কয়েক বছর পর মাওলানা সুলায়মান সাহেব, ফাযেলে বাবুনগর, নানুপুর মাদরাসার দায়িত্বে আসেন। তিনিও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মাদরাসার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। ধীরে ধীরে এলাকায় সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা পায় এই দীনি প্রতিষ্ঠানটি।

আমরা একদিন সময় বের করে হজরত সুলতান সাহেব নানুপুরির ওখানে যাই। তিনি এক বছর পূর্বেই বাবুনগর ছেড়ে নানুপুর চলে এসেছিলেন। বাবুনগরের উসতাদবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষ যখন দেখলেন উনি ছুটির পর অনেকদিন হয়ে গেলেও মাদরাসায় ফেরেননি; তখন উনার খোঁজে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তারা জানতে পারেন যে সুলতান সাহেব নানুপুরে থেকে যাওয়ার ইরাদা করেছেন। মাদরাসা থেকে একটি চিঠিসহ কয়েকজন বড় উসতাদ নানুপুরে যান সুলতান সাহেবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু এই আল্লাহর ওলি কাউকে না করতে পারতেন না। তিনি যখন জানতে পারেন যে প্রতিনিধিরা এসেছেন তখন বাসার পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে চলে যান। উসতাদবৃন্দ এসে চিঠি রেখে বিদায় নেন। তারা সাক্ষাত না হওয়ায় আফসোস প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুলতান সাহেব এই চিঠির কোনো জবাবও দেননি। এরপর আরো একবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সুলতান সাহেব না ফেরায় সবাই বুঝে নেয় তিনি বড় কোনো ইলহামি মিশন নিয়েই নানুপুর গমন করেছেন। তা ছাড়া এত প্রসিদ্ধ ও বড় প্রতিষ্ঠান ছেড়ে কেউ দুই ঘরের প্রতিষ্ঠানে যায়! সব খেদমতই বড়, কিন্তু সদকায়ে জারিয়া তো বাহ্যিকভাবে অধিক প্রচারের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

আমরা বৃহস্পতিবার আসরের নামাজ নানুপুরে গিয়ে পড়ি। নামাজের পর তার সাথে সাক্ষাত হয়। আমার মতো আরো দুজন সেদিন ছিলেন, যাদের বাইয়াত হওয়ার ইচ্ছা ছিল। নানুপুরি সাহেব আমাদের দেখে খুব মহব্বত করলেন। বাবুনগরের সর্বশেষ অবস্থা জানলেন। এরপর ছোট্ট করে কেন এখানে এলেন তা আমাদের সাথে আলোচনা করলেন।

"আমার পির ও মুরশিদ মুফতি আযিযুল হক রহিমাহুল্লাহ চাইতেন আমি যেন এখানে এসে দীনের খেদমত করি। কিন্তু কোনো কারণে আমি বাবুনগরেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করি। সেখানে আমি প্রায় পনেরো বছর ছিলাম। যখন হারুন সাহেব হজরত এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন তখন আমিও তার সাথে ছিলাম। আমি বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ-নসিহতের খেদমত করতাম। আবার মাদরাসায় বসে কিতাব পড়াতাম। ওয়াজের

ফলে আমার একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল। ফলে ভক্তরা অনেক হাদিয়া-তোহফা দিত। আমি ব্যক্তিগত হাদিয়াও সব মাদরাসায় দিয়ে দিতাম। আর মাদরাসার জন্য তো আলাদা কালেকশন করতামই। আপনারা এখন নানুপুরকে যেমন দেখছেন, সেই সময় বাবুনগরও এমন ছিল। শুরুতে শুধু ইবতেদায়ি শ্রেণিগুলো ছিল। কয়েকটি মাত্র কামরা ছিল সেখানে। এখন তো দাওরায়ে হাদিসে উন্নীত হয়েছে। আল্লাহর ফজল ও করমে আজ তা দেশের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। আমি তো ভাই কোনো কাজের লোক নই। আমাকে দিয়ে কখনো কিছু হয়ও না। হারুন সাহেবের খেদমতে ছিলাম সেখানে। আল্লাহর কিছু নেক বান্দা সেখান থেকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমার মুরশিদও চাইতেন যেন আমি এখানে চলে আসি। উনি বেঁচে থাকতে তো হুকুম তামিল করতে পারিনি। এই শেষবয়সে যদি একটু উনার হুকুম মানতে পারি, সে উদ্দেশ্যেই আপনাদের খেদমত ছেড়ে এখানে এসে পড়েছি। দোয়া করবেন এই প্রতিষ্ঠানও যেন বাবুনগরের মতো আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। আমরা তো ভাই অকাজের মানুষ। দীনের তো খেদমত করতে পারি না। শুধু লেগে থাকার চেষ্টা করি। কাজ তো আল্লাহ তায়ালাই তাঁর বান্দাদের দ্বারা নিয়ে নেন।”

হজরতের সাথে গল্প করতে করতে এশার সময় হয়ে যায়। সেদিন জুমারাত ছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল রাতেই বাবুনগর ফিরে আসব। কিন্তু হজরত থেকে যেতে বলছিলেন। আমরা জানাই যে রাতে না ফিরলে সমস্যা হতে পারে। তা ছাড়া আমাদের মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। তখন তিনি রাতের খাবারে শরিক হতে বললেন। মাদরাসায় সেদিন ছুটি হয়ে গেছিল, তাই তেমন মানসম্মত খাবার রান্না করা ছিল না। আমাদের জন্য তিনি কয়েকটি ডিম আনালেন। হজরতের সাথে খাবার খেয়ে আমরা এশার নামাজ পড়লাম। নামাজের পর আগত অন্য দুজন ভাই বাইয়াত হলেন। কিন্তু আমি তখনো দ্বিধায় ছিলাম যে কী করব। হজরতের বাসায় যাওয়ার দরকার ছিল। আর আমরাও মাদরাসায় ফিরতাম। তাই আমাদের দেরি না করিয়ে তিনি রওনা করে দিলেন। রাস্তা কিছুদূর একই থাকায় আমরা আরো কিছু সময় তার সান্নিধ্য গ্রহণের সুযোগ পেলাম। এরই মাঝে আমার মনে উদয় হলো যে একবার মুফতি সাহেবকে হারিয়েছ, এখন তুমি আরো দেরি করছ! হায়াত-মওত কি বলে আসবে? মনের ভাবনা আমলে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। সাথিকে ইশারায় জানাই যে আমিও বাইয়াত হব। সে হজরতের কাছাকাছি হয়ে আবেদন করে। সাথে সাথে হজরত আমার দিকে ঘুরে তাকান। এত দ্বিধার কিছু নাই মৌলবি সাহেব! এখানে একটি মসজিদ আছে, চলুন আমরা একটু বসি। এই বলে আমার হাত ধরে মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলেন। সবারই অজু ছিল। আমাকে সামনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন

ইসতিখারা করেছি কি না। আমি না জবাব দিই। সমস্যা নাই। হজরত জবাব দেন। এরপর তাওবার কালিমা পড়িয়ে বাইয়াত করে নেন। সামান্য কিছু ওয়াজিফা দৈনন্দিন আমলের জন্য দিয়ে দেন। এভাবে হজরতের সাথে আমার ইসলাহি সম্পর্ক তৈরি হয়। আমি তখন বাবুনগরে কাফিয়া জামাতে পড়াশোনা করতাম।

উদ্যমে ভাটা

ছাত্রজমানায় যেটা হয় যে, কিছুদিন আমলের খুব জজবা থাকে, এরপর পড়াশোনার চাপ এলে আমলে ঘাটতি হয়ে যায়। আমার সাথেও কিছুটা এমনই হলো। হজরতের ওয়াজিফা আদায় হতো, কিন্তু নিয়মিত ছন্দ থাকত না। উনার বয়ান শুনতে যেতাম। বয়ান শেষে বলতেন, কী খবর! কীভাবে এলে? কেউ বকা দেবে না? আমরা হাসতাম! বাবুনগর থাকতে তো হজরতের সাথে প্রায়ই সাক্ষাত হতো। কিন্তু যখন জিরিতে চলে এলাম, তারপর থেকে সাক্ষাত একদম কমে গেল। বছরে একদুবার সাক্ষাত হতো। আর আমিও ইলমি শখে পড়ে যাই। ফলে ইসলাহি উন্নতির ফিকির খুব বেশি করতে পারিনি। স্বভাবগতভাবে অবশ্য আমি কিছুটা লাজুক ও স্বল্পভাষী ছিলাম; ফলে মেলামেশা কম করতাম মানুষের সাথে। এজন্য আমার মধ্যে নেককারদের সামান্য সিফত এসেছে কি না জানি না, তবে বদ মানুষদের অনিষ্ট থেকে কিছুটা হলেও বাঁচতে পেরেছি।

এরপর তো জিরি থেকে তাকমিল শেষ করে করাচি চলে যাই। সেখানে ইলমের পেছনে আরো অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ি। দৈনিক মাসনুন ওয়াজিফা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু তেমন আদায় হতো না। তাখাসসুসের পর শিক্ষকতার জীবনের কয়েক বছরও এভাবে চলে যায়। একাত্তরের পর বেশ কবছর প্রিয় বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। এই সময় ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব একা হয়ে পড়ি। বাড়ির সাথেও দীর্ঘ চিঠিপত্রের সুযোগ ছিল না। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক তখনও শুরু হয়নি। আন্তর্জাতিক কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন খুবই সীমিত আকারে দুই দেশের মাঝে যোগাযোগের একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। উদাহরণত রেড ক্রস। এরা একটা চিঠির সিস্টেম রেখেছিল, যেখানে মাত্র ৩০ শব্দে আপনি চিঠি লিখতে পারবেন। অর্থাৎ শুধু আপনি ভালো আছেন এতটুকুই জানানো যাবে। এই চিঠিও পাঠাতে স্বাভাবিক সময়ের দীর্ঘ চিঠির চেয়েও বেশি খরচ হয়ে যেত। এই কারণে মানসিকভাবেও আমি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ি।

শূন্য হৃদয়, বসে না মন

একদিন আল্লামা বানুরি সাহেব আমাকে আনমনা অবস্থায় লক্ষ্য করেন। সেসময় কিছু না বলে অন্য এক সময় আমার কাছে এসে বসেন। মাওলানা, আপনি কি কোনো পেরেশানিতে আছেন? আজকাল দেখি আনমনা হয়ে থাকেন। দেশের কথা খুব বেশি মনে পড়ে বুঝি? বানুরি সাহেবের এমন হৃদ্যতায় আমি আরেকটু আবেগি হয়ে পড়ি। কান্না থামলে উনাকে সব খুলে বলি পুরো পরিস্থিতি। আমার যে আসলে খুব একাকিত্ব বোধ হয়। ইসলাহিভাবে শূন্যতা অনুভব করি। দেশে তো সুলতান নানুপুরির কাছে বাইয়াত ছিলাম; কিন্তু উনার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারিনি। এখন তো পরিস্থিতি আরো খারাপ। নিজের বাড়িতেই দুই লাইনে সংবাদ পাঠাতে হয়। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, আমি কোনো বুজুর্গের সান্নিধ্য গ্রহণ করি। আমার মুখ থেকে এমন কথা শুনে বানুরি সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। এরপর বলেন, মুফতি সাহেব, ইসলাহি নিসবত তো আসলেও জরুরি। আমাদের আকাবির আলিমগণ এই মেহনত সবাই করেছেন। আপনাকে আমি উৎসাহ দিচ্ছি। আপনি মুনাসিব কোনো বুজুর্গ পেয়ে গেলে আমাকে একটু জানাবেন।

আল্লামা বানুরি সাহেবের উৎসাহের পর আমি বুজুর্গের সন্ধানে মাথা ঘামাতে শুরু করি। কিছুদিন ভাবার পর মনে হলো, নিউটাউনের দারুল ইফতার মতো ইদারায় যে পরিমাণ ব্যস্ততা লেগে থাকে, দূরে কোনো বুজুর্গের সান্নিধ্য অর্জন করা আমার পক্ষে বেজায় কঠিন। আবার দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের জন্য গেলে মাদরাসার সমূহ ক্ষতি হবে। কেন আমি বানুরির সান্নিধ্যের কথা ভাবছি না!? এই ভাবনা মাথায় আসার সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত নিই যে বানুরির সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করব।

লাজুক আবেদন!

একদিন বানুরি রহিমাহুল্লাহ মসজিদে বসে ছিলেন। আমি পাশে গিয়ে বসি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে আমি বলতে শুরু করি, হজরত, আকাবির আলিমরা তো তালিম ও তাজকিয়ার মেহনত একইসাথে আনজাম দিয়েছেন। আপনিও তো মাশাআল্লাহ হজরত শাহ সাহেবের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাজকিয়া ও সুলুকের পথেও আপনার সময় কেটেছে। অধম আপনার থেকে ইলমিধারায় তো জীবনের অনন্য নেয়ামত হাসিল করেছে। এখন ইসলাহের জগতেও আপনার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চায়। আপনি যদি দয়া করে আবেদন কবুল করেন। বানুরি আমার এত আদবপূর্ণ আবেদনে হেসে ফেলেন। বলতে লাগলেন, মুফতি সাহেব, আমি তো পিরালি করি না তেমন। এই মেহনত নিঃসন্দেহে জরুরি ও মৌলিক পর্যায়ের। কিন্তু

আমার তো কর্মপন্থা ভিন্ন। আপনি তো আমাকে দেখেছেন। আমি আপনাকে তাজকিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট আছে এমন বুজুর্গের সন্ধান ও পরিচয় দিতে পারি। কিন্তু আমি নিজে আপনাকে বাইয়াত করাব না। তবে আপনি এক কাজ করতে পারেন। টানা তিনদিন ইসতিখারা করুন। এরপর আমার সাথে একবার দেখা করবেন।

হজরতের হুকুমে আমি ইসতিখারা করি। অবাক করা বিষয় হলো দুদিন আমি একই স্বপ্ন দেখতে পাই। স্বপ্নে দেখি যে বানুরি সাহেব আমাকে কিছু কিতাবের সম্পাদনার কাজ দিয়েছেন। যেখানে হাওয়ালা যুক্ত করতে হবে। এই কাজে আমার পুরো দিনরাত ব্যয় হচ্ছিল। অর্থাৎ নামাজের সময় ও মৌলিক চাহিদাগুলো ছাড়া সবসময়েই এই কাজে ব্যস্ত থাকছিলাম। তৃতীয় দিন স্বপ্ন দেখি, হজরত সাইয়েদ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.। পরনে তার সালোয়ার-কোর্তা। মাথায় কিশতি টুপি। সম্ভবত চাশতের নামাজ পড়ছিলেন একটি মসজিদে। দরজায় লাঠি হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন খতিবে আজম রহ.। মসজিদের বাইরে একটি গাড়ি রাখা ছিল। গাড়ির সাদা গায়ে আরবি হরফে লেখা ছিল—আল্লামা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.। বানুরি সাহেবের সাথে সাক্ষাতে সব খুলে জানাই। উনি বলেন, এজন্যই আপনাকে ইসতিখারা করতে বলেছিলাম। আপনার ইসলাহের পথ ও পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালা ইলমের পথে রেখেছেন। যত বেশি ইলমচর্চায় মগ্ন থাকবেন, আকাবির আলিমদের হালাত মুতালায়া করবেন ততই আপনার ফায়দা হতে থাকবে। আমার সাথেও একই ঘটনা ঘটেছিল। আমিও যখন শাহ সাহেবের কাছে ডাভেলে থাকতাম, তখন উনার হাতে বাইয়াত হতে চেয়েছিলাম। উনি আমাকে ইসতিখারা করতে আদেশ দেন। আমি তিনদিন আমল করে একই ফল পাই। শাহ সাহেব আমাকে তার কিছু কিতাবের উপর টীকা লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন, এটি স্বপ্নে দেখি বারবার। শাহ সাহেবের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করলে উনিও আমাকে এই কথাই বলেন। 'আপনি ইলমে হাদিসের চর্চা অব্যাহত রাখুন, ইনশাআল্লাহ ইসলাহি ফায়দা হবে।' তাই আমিও আপনার ক্ষেত্রে একই কর্মপদ্ধতির পরামর্শ দিচ্ছি। যেহেতু আপনি শাহ সাহেবকে স্বপ্নে দেখেছেন, এর অর্থ আসলে এটিই হবে যে, ইলমের পথে নিরবচ্ছিন্ন থাকাই আপনার ইসলাহের জন্য ইসলাহের পথ, ইনশাআল্লাহ।

এরপর থেকে বানুরি সাহেব আমাকে দেখলেই মুচকি হেসে দিতেন। একদিন দারুল ইফতার সামনে মুখোমুখি সাক্ষাতে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, মুফতি সাহেব, পিপাসা এখনো মেটেনি, তাই না? সময় করে দেখা করবেন। সত্যিই আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। কী যেন একটা আমাকে তাড়া করে বেড়াত! মনে হতো সবকিছু থেকেও আমার কিছুই নেই। এরকম মানসিক অবস্থা নিয়ে দারুল ইফতার কাজ করতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব এক

সন্ধ্যায় আমার এমন আনমনা অবস্থা দেখে জোর করে বানুরির কাছে পাঠালেন। বানুরি তখন দফতরে বসে ছিলেন। সালাম জানাতেই কাছে ডেকে পাশে বসালেন। আপনার মতো ইলমি মানুষ ইসলাহের জন্য এত ফিকির করেন, আজকের জমানায় সত্যিই বিরল এটি। কিতাবি হুরুফ কিছু আয়ত্ত করে নিলে তো অনেকের এখন মাটিতে পা-ই পড়ে না। নিজেকে মুহাদ্দিসুল আসর ভেবে বসে থাকেন অনেকে। নিজের ইসলাহি ক্ষুধা অনুভব করাও একটি বড় নেয়ামত। শুকরিয়া আদায় করবেন বেশি করে। যেন এই নেয়ামত আপনার মাধ্যমে অন্যদেরও নসিব হয়। আপনাকে মূলত যে কারণে সাক্ষাতের জন্য বলেছিলাম তা হলো, আমাদের পাকিস্তানের ইসলাহি আকাবির আলিমদের মধ্যে যিনি এখন আমার নজরে সবচেয়ে মকবুল ব্যক্তিত্ব, তিনি আগামী কদিনের মধ্যেই বেশ কিছু সময়ের জন্য নিউটাউনে আগমন করবেন। আমি বহুকষ্টে তাকে দুমাস অবস্থানের জন্য রাজি করিয়েছি। তবু কিছু শর্তসাপেক্ষে। উনি মাদরাসার খানা গ্রহণ করবেন না। উনার জন্য পৃথক অবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে এমন আশংকা করলে তিনি যেকোনো সময় না বলেই বিদায় নিতে পারবেন। উনার মতো সম্মানী ব্যক্তির জন্য আমার পক্ষে সকল শর্ত মেনে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু উনি ছাত্রদের ব্যাপারেও বিশেষ নজর রেখেছেন, এটা আমাকে পুলকিত করেছে। এই ব্যক্তি হলেন হজরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরির জানাশিন ও খলিফা শাহ আবদুল আযিয রায়পুরি হাফিজাহুল্লাহ। সাহারানপুরের ফারেগ। খলিল আহমদ সাহারানপুরির শাগরেদ। আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবন ইসলাহি নিয়তে এই আল্লাহওয়ালার হাতে সঁপে দিতে পারেন। আশাকরি আপনার অসহিষ্ণু হৃদয় প্রশান্তি খুঁজে পাবে। আমি হজরতের এই সংবাদে খুশি হয়ে দারুল ইফতায় ফিরে এলাম।

নক্ষত্রের আগমন!

নিউটাউনে বছরজুড়ে আকাবির আলিমদের আসা-যাওয়া লেগে থাকত। কিন্তু হজরত রায়পুরির আগমন সংবাদে নিউটাউন যেন উনাকে স্বাগত জানানোর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেবের কাছেও রায়পুরি হজরতের সুউচ্চ প্রশংসা শুনলাম। আমার মন আমাকে এই হজরতের হাতে বাইয়াতের ব্যাপারে অস্থির করে তুলল। ছাত্রভাইদের চেয়ে আমিই অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ রইলাম। নির্ধারিত দিনে হজরত নিউটাউনে আগমন করলেন। সফেদ দাঁড়িতে এত নুর থাকতে পারে কেউ না দেখলে কল্পনা করতে পারবে না। আর করাচি শহর যেন উনার ভক্ত-অনুরক্ত দিয়েই পূর্ণ। এত বেশি পরিমাণে সাক্ষাতপ্রার্থী নিউটাউনে আসতে লাগল, মনে হচ্ছিল নিউটাউন পুরো করাচি শহরকেই ধারণ করেছে। হজরত রায়পুরির আগমনের পর কিছুদিনের মধ্যেই মনে হতে লাগল নিউটাউন করাচি শহরের সবচেয়ে বড় খানকাহ।

হজরত রায়পুরি নিউটাউনে অবস্থানের পর বানুরি সাহেবকে আরো কিছু শর্ত আরোপ করলেন। প্রথমত তিনি জামাতের নামাজে মাইকের পক্ষপাতী ছিলেন না। বানুরি সাহেব একে সাধারণ ফিকহি মতানৈক্য মনে করেন। হজরত যতদিন অবস্থান করবেন ততদিন মাইক ব্যবহার না করার পক্ষে মত দেন। রায়পুরি হজরতের আরেকটি শর্ত ছিল জুমার নামাজের পূর্বে যে নসিহত প্রদান করা হয় এটির কোনো প্রয়োজন নেই। বানুরি সাহেব সানন্দে এবং সাগ্রহে এই মতটিও গ্রহণ করে নেন। হানাফি ফিকহে জুমার পূর্বের আলোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। এটি শুধু জনগণের এবং সাধারণ শ্রোতাদের সাপ্তাহিক দীনি খোরাক হিসেবে আলোচনা করা হয়। কিন্তু রায়পুরি হজরতের আগমন উপলক্ষে আমল কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা খুব কঠিন কিছু নয়। ইমাম শাফেয়িও যখন ইমাম আবু হানিফার কবর জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি সেদিনকার মাগরিবের নামাজে বারবার হাত উত্তোলন করে[১০৯] নামাজ আদায় করেননি। অথচ তার গবেষণামতে, শাফেয়ি মাজহাবে এই আমলটি একটি সুন্নাত আমল। কিন্তু ইসলামের একজন বড় ইমামের সম্মানে তিনি এই সুন্নাত আমলটি সেদিন ত্যাগ করেছিলেন। বানুরি সাহেবের মতে, সেক্ষেত্রে জুমার আলোচনার মতো একটি মুসতাহাব আমল কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা কোনো বড় বিষয় নয়। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মাশাআল্লাহ একমত হওয়ার এমন ভুরিভুরি নজির ইসলামি ইতিহাসে অজস্র পড়ে রয়েছে। বানুরি সাহেব রায়পুরি সাহেবের সকল শর্ত নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ায় রায়পুরি হজরত অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে নিউটাউনে অবস্থান করতে থাকেন।

হজরত রায়পুরির দৈনন্দিন আমলের খুব শক্ত ব্যবস্থাপনা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে তাহাজ্জুদে ওঠা থেকে শুরু করে ফজরের পর কতক্ষণ তাসবিহ আদায় করবেন, কতক্ষণ বিশ্রাম নেবেন, কখন নাশতা করবেন, কখন সাক্ষাতপ্রার্থীদের সাথে দেখা করবেন, কখন চিঠির উত্তর দেবেন এগুলো বলা যায় একদম কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত ছিল। তাই চাইলেই যেকেউ যেকোনো সময় তার সাথে সাক্ষাত করতে পারত না।

আদব : বড়রা যেভাবে দেখিয়েছেন

হজরত বানুরি শাহ সাহেবের মতো বুজুর্গদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্মান করতেন। শাহ সাহেব যতদিন ছিলেন বানুরি সাহেব প্রতিদিন ফজরের পর তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য শাহ সাহেবের পেছনে পেছনে তার কামরা পর্যন্ত যেতেন। সালাম-মুসাফাহার পর কোনো কিছুর প্রয়োজন রয়েছে কি না জেনে নিতেন। এরপর কিছুক্ষণ তার সান্নিধ্যে থেকে বাসায় চলে যেতেন। প্রতিদিন এভাবে সম্মানিত

---

[১০৯]. শাস্ত্রীয় ভাষায় যাকে রাফউল ইয়াদাইন বলা হয়। এটিও একটি সুন্নাহ আমল। তবে অন্য মাজহাবে পালন করা হয়।

মেহমানের খোঁজখবর রাখতেন যেন কোনো ধরনের ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি হজরতকে কষ্ট না দেয়। একদিন বানুরি সাহেব শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে সকল শিক্ষককে সম্বোধন করে বললেন, আপনাদের মধ্যেও যদি কেউ এমন থাকেন, যিনি আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে শাহ সাহেবের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে চান তাহলে আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রয়েছে। আপনারা আপনাদের ও শাহ সাহেবের সুবিধামতো সময়ে তার কাছে গিয়ে তার সান্নিধ্য অর্জন করে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। আশাকরি এতে আপনাদের প্রভূত ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। দেখুন, আমার জানামতে বর্তমান পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে এই হজরতের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুজুর্গ আত্মশুদ্ধির পথে আর কেউ নেই। উনিই বর্তমানে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আমার কাছে। যে সকল ছাত্রভাই আত্মশুদ্ধির জন্য আবেদন করেছিলেন আমি তাদেরকেও বলেছি তারা যেন শাহ সাহেবের হাতে বাইয়াত হয়ে যায়। আমার খানদানের মধ্যেও যারা ইসলামের পথে হাঁটতে চায় তাদেরও আমি বিশেষ অনুরোধ করেছি যেন তারা শাহ সাহেবের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। আমি মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব, হাবিবুল্লাহ মুখতার সাহেবসহ আমার পরিবারের অনেক সদস্যকেই শাহ সাহেবের হাতে সঁপে দিয়েছি। তাই আপনাদেরও একই বিষয়ে অনুরোধ করলাম।

এভাবে বানুরি সাহেব আমাদের সকল শিক্ষককে শাহ সাহেবের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলেন।

আমি তো অনেকদিন পূর্ব থেকেই বাইয়াতের ব্যাপারে বানুরি সাহেবের সাথে পরামর্শ করে আসছিলাম। যখন শাহ সাহেবের আগমন ঘটল তখন আমি আর নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে পারলাম না। আমাদের জুনায়েদ বাবুনগরি সাহেব হাফিজাহুল্লাহ, তিনিও সেসময় নিউটাউনে ছাত্র ছিলেন। উনি আমার সাথে ও বানুরি সাহেবের সাথে পরামর্শসাপেক্ষে শাহ সাহেবের হাতে বাইয়াত হয়ে যান। আমিও কিছু উসতাদের সাথে শাহ সাহেবের মজলিসে গিয়ে উনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি এবং দীর্ঘ দুই মাস মজলিসে যাতায়াত অব্যাহত রাখি।

আপনাদের আগেও বলেছি পুরো করাচি শহর বলা যায় শাহ সাহেবের ভক্তবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। নিউটাউনে উনার দুই মাস অবস্থানের প্রত্যেক বেলাতেই ভক্তবৃন্দ উনাকে দাওয়াত করত। এর চেয়েও অবাক করা বিষয় হলো শাহ সাহেবের দাওয়াতের পাশাপাশি উনার সকল ভক্ত এবং মুরিদকেও প্রত্যেক বেলায় দাওয়াত দেওয়া হতো। সেই সুবাদে নিউটাউনের ছাত্র এবং উসতাদদের মধ্যে যারা শাহ সাহেবের সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলেন, তারাও প্রত্যেক বেলায় দাওয়াত পেতেন। কিন্তু পড়াশোনা ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে শিক্ষকগণ সপ্তাহে একবার বা দুবার এই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতেন। আমিও দারুল ইফতার ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে শাহ সাহেবের সান্নিধ্য গ্রহণের জন্য সচেষ্ট থাকতাম।

শায়েখের সোহবতে সালিকের অভিজ্ঞতা

শাহ সাহেবের মজলিসে উপস্থিত হয়েও অনেক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। উনি খুবই সাদাসিধা ছিলেন। ফলে ভয়-ভীতি ছাড়াই সবাই তার সাথে কথা বলতে পারত। আমার সহকর্মী মুফতি শাহেদ সাহেব একদিন আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে রাতের দাওয়াতে সাথে নিলেন। নিউটাউনের উসতাদবৃন্দ সবসময় দুপুরের দাওয়াতে অংশ না নিয়ে রাতের দাওয়াতে অংশ নিতেন। কারণ দুপুরে নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম থাকত। শাহ সাহেবের দস্তরখানে দুপুর এবং রাতে সবসময়ই ২০০, ৩০০ কখনো ৪০০ মেহমান উপস্থিত থাকত। আমি সেসময় শাহ সাহেবের মুরিদ ছিলাম এবং কিছুদিন তার সাথে কথা বলার ফলে বেশ আন্তরিক পরিচিতিও তৈরি হয়েছিল। এশার পর উনার সাথে দেখা করলে উনি আমাকে হাত ধরে পাশে বসিয়ে নিতেন।

একদিন মজলিস কিছুক্ষণ চলমান থাকার পর দস্তরখান বিছানো হলো। সেদিনের রাতের খাবার ছিল সম্ভবত চিংড়ি মাছের বিরিয়ানি। শাহ সাহেবের ডানদিকে ছিলেন হাবিবুল্লাহ মুখতার এবং আমি বাম পাশে বসে ছিলাম। দস্তরখানা বিছানোর পর শাহ সাহেবের নির্দেশমতো খাবার পরিবেশন শুরু হলো। রাতে যেহেতু আলিমগণ দাওয়াতে অংশ নিতেন তাই রাতের মেহমানদারি হতো একটু ভারি ধরনের। চিংড়ি মাছের মাসআলা হয়তো আপনারা জেনে থাকবেন যে এটি মাছ নাকি অন্য কোনো সামুদ্রিক প্রাণী নাকি পোকা সেটি নিয়ে আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। খোদ করাচিতে আল্লামা শফি সাহেব এবং মুফতি রশিদ সাহেবের মাঝেও মতপার্থক্য ছিল। প্রত্যেকের সামনে খাবার এসে যাওয়ার পর হঠাৎ করে আলিমদের মধ্য থেকে কেউ একজন এই মাসআলাটি উত্থাপন করে বসলেন যে, শাহ সাহেবের দস্তরখানে কীভাবে একটি মাকরুহ খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে! শাহ সাহেবের মতো বুজুর্গের সামনে হঠাৎ করে অনুমতি ছাড়াই এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা আদৌ আদবের কাজ হয়েছে কি না তা ভাবনার বিষয়। অন্য আলিমগণ প্রশ্নটি শুনে শাহ সাহেবের দিকে তাকালেন। জবাব সবারই জানা ছিল কিন্তু আদবের খাতিরে নীরবতা অবলম্বন করছিলেন সকলেই। শাহ সাহেব খুব সহজেই হেসে প্রশ্নটি পুনরায় আলিমদের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। আপনারাই তো মত দিয়েছেন যে এটি জায়েজ রয়েছে, মাকরুহ রয়েছে। তাই আপনাদের মধ্যে যারা মাকরুহ মনে করেন তারা এটি বেছে খান আর যারা জায়েজ মনে করেন তারা খানায় পূর্ণভাবে অংশ নিন। এটি তো কোনো হারাম খাবার বা হারাম আয়ের খাবার, তা তো নয়। আপনারা নিশ্চয় জানেন হজরত থানবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি চিংড়িকে মাছ বলে অভিহিত করেছেন। তার চেয়ে বড় মুফতি আমরা নই। তাহলে একে জায়েজ মনে করতে সমস্যা কোথায়? যেহেতু রান্না হয়ে গেছে তাই আমি আপনাদের খাবার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করব। যদি শুধু মাসআলা

আলোচনার সময় হতো তাহলে ভিন্নমত পোষণ করা দোষের কিছু ছিল না। যে ব্যক্তি আজ দাওয়াত করেছেন তিনিও নিশ্চয় অনেক শখ করে এবং অনেক কষ্ট করে আজকের আয়োজন করেছেন। তাকে কষ্ট দেওয়া তো কবিরা গুনাহ। আমরা এটি কেন করব? শরিয়ত আমাদেরকে লঘু এবং গুরু বিষয় সামনে রেখে বিবেচনাসাপেক্ষে চলার হুকুম দিয়েছে। শাহ সাহেবের হেকমতপূর্ণ আচরণে সেদিন খুবই প্রীত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমরা ইসলাম শেখাই আর উনারা ইসলাম দেখান। পার্থক্যটা আসলে এখানেই। শেখার পাশাপাশি সান্নিধ্যের প্রয়োজন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটিও আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়েছিল সেদিন।

একেই বলে দীনদারি : এরই নাম সমঝদারি

একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ হিসেবে শাহ সাহেব সবসময় মানুষের সহজবোধ্যতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। পাকিস্তান বিভক্ত হবার করুণ ইতিহাসের সময়ও তিনি মজলুম বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। দারুল উলুম করাচি থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুফতি শফি সাহেব বেশকিছু ছাত্রভাইকে বরং বলা যায় সকল ছাত্রভাইকে অনিবার্য কারণে বের করে দিয়েছিলেন। তাদের একটি অপরাধ ছিল যে তারা মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন। হজরত শাহ সাহেব এই ঘটনা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তিনি মুফতি সাহেবের সিদ্ধান্তের ভর্ৎসনা করেন। 'উনি কেমন মুফতি সাহেব! যিনি মজলুমদের পক্ষে থাকার জন্য কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন! নির্বাচনে তো আওয়ামী লীগই বিজয়ী হয়েছিল, তাহলে শেখ মুজিবকে ক্ষমতা দিতে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের এত গা-ছাড়া ভাব এলো কেন! ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই তো ঘটনা এতদূর গড়াতো না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মজলুম বাঙালি জাতি বিশেষভাবে মজলুম মুসলিম বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি।'

মুফতি শফি সাহেবের পক্ষ থেকে একজন উসতাদ হজরত মাওলানা ইউসুফ বানুরিকে টেলিফোনে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন তিনিও নিউটাউনে অধ্যয়নরত সকল বাঙালি ছাত্রকে বিদায় করে দেন। কিন্তু বানুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ব্যক্তিগতভাবে এই মতের বিপক্ষে ছিলেন। তার মত ছিল এই ছেলেগুলো তো হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে দীনি শিক্ষা অর্জন করতে এসেছে। এরা তো সক্রিয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাহলে কেন তারা রাজনীতির স্বার্থে নিজেদের জীবন নষ্ট করবে! এটি বানুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে সম্পূর্ণ বেইনসাফি ও জুলুমি সিদ্ধান্ত ছিল। তাই তিনি কোনো বাঙালি ছাত্রকে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাবস্থায় মাদরাসা থেকে বের করে দেননি। উলটো সব সময় তাদের খোঁজখবর রেখেছেন এবং তাদেরকে অভয় দিয়েছেন। যেন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেরাই কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে না ফেলে। হজরত শাহ সাহেব যখন বানুরি

রহমাতুল্লাহি আলাইহির এই আচরণ শুনতে পান তখন অত্যন্ত খুশি হয়ে মন থেকে আন্তরিক দোয়া দেন। পরবর্তীতে সাক্ষাত হলে তিনি খুশি প্রকাশ করে বলেন, আপনি সেই সময়ে অত্যন্ত জরুরি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকিস্তানি আলিমদের পক্ষ থেকে ফরজে কিফায়া আদায় করেছেন।

যুদ্ধের সময় আমি সবেমাত্র শিক্ষক হয়েছি। অনেকদিন ধরে দেশে যেতে না পেরে খুব চিন্তিত থাকতাম। এই সময়গুলোতে নিউটাউনের সকল উসতাদ বিশেষ করে মাওলানা সাঈদ রায়পুরি সাহেব এবং হজরত বানুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে অত্যন্ত মহব্বতের সাথে অভয় দিয়ে বলতেন, মাওলানা! কখনো বলতেন মুফতি সাহেব! আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা সব ব্যবস্থা করে দেবেন। সকল পথ খুলে দেবেন। একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। আপনারাই হকের উপর আছেন। আপনারা মজলুম, আমরা পাকিস্তানি আলিমরা আপনাদের সাথে আছি।

দুঃসহ দিনগুলো

আসলে একাত্তরের দিনগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশির জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। তারা একে তো নিজ দেশে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ নিতে পারছিলেন না, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেও স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করতে পারছিলেন না। সব সময় তাদের মধ্যে একটি ভীতিকর নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বজায় থাকত। স্বাধীনতার যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা প্রথম কয়েক মাসে খুবই কম ছিল বিধায় তারা পরাজিত হলে পাকিস্তানি ফেডারেল সরকারের প্রতিহিংসার প্রথম শিকারে পরিণত হবেন, এই চিন্তায় দিনরাত পেরেশান থাকতেন। যুদ্ধ চলাকালে এবং তৎপরবর্তী সময়ে দেশের সাথে যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে সেখানে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়স্বজনরা কে কোন অবস্থায় আছেন, অথবা আদৌ বেঁচে আছেন কি না তা জানার উপায় ছিল না। নিজেদের অনিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে জানতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবাসীদের আরো বেশি অস্থির করে রাখত। এই কঠিন সময়ে প্রবাসীদের পাশে পাকিস্তানি আলিমগণ নিজেদের সহমর্মিতা প্রকাশ করে তাদের দীনি ও সামাজিক দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবে পালন করেছেন বলে মনে করি।

আলস্যে মাহরুমি

এভাবে শাহ আবদুল আজিজ রায়পুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে আমার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উনি বিদায় নেওয়ার পূর্বে আমাকে বিশেষ নসিহত

করে বলেছিলেন, আপনি সময় বের করে কোনো এক রমজানে আমার সাথে সারগোদায় এতেকাফ করবেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যস্ততা, দারুল ইফতায় সময় দেওয়া এবং দাপ্তরিক কাজে ডুবে থাকায় সময় বের করা কঠিন ছিল। শাহ সাহেবের এটি ছিল করাচির শেষসফর। এরপর তিনি আর করাচিতে আসতে পারেননি। আর হজরত বানুরিও এর কয়েক বছর পরেই ইনতেকাল করেন। ফলে আমাদের উপর দারুল ইফতার দাপ্তরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের ভার আরো বেড়ে যায়। নিউটাউনের ইহতিমামের দায়িত্ব এসে পড়ে হজরতের জামাতা মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবের কাঁধে। ডক্টর মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার একবার রমজান সারগোদায় কাটিয়ে এসেছিলেন। শাহ সাহেবের সান্নিধ্যের সৌভাগ্য আমি ব্যস্ততা ও কিছুটা গাফলতির কারণে অর্জন করতে পারিনি। একবার মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবকে আমি আবেদন করে বলি যে আমাকে এই রমজানে যাবার অনুমতি দিন। তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ, তুমি তো আধ্যাত্মিক মানুষ! তোমার তো যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তুমি গেলে মাদরাসার ক্ষতি হবে। আমার পক্ষ থেকে যাওয়ার অনুমতি আছে; কিন্তু মাদরাসার বিষয়টি মাথায় রেখো। আমি হজরতকে অনুরোধ করে বলি আপনি আমাকে নিঃশর্ত অনুমতি দিন। মাদরাসার লোকসানের বিষয়টি উল্লেখ না করলে ভালো হয়। কারণ মাদরাসার লোকসান করে তো আমি যেতে পারব না। কিন্তু বাস্তবতা ছিল এমনই যে, আমি দারুল ইফতায় সময় না দিলে মাদরাসার সত্যিই ক্ষতির আশংকা ছিল। যার ফলে আমি আর সারগোদায় যাবার ব্যাপারটি ভাবতে পারিনি। অথচ শাহ সাহেবের পক্ষ থেকে এরপরও দুবার চিঠি এসেছিল। আমি দোয়া চেয়ে ও আল্লাহর তাওফিক যেন শামিল হয় এই আবেদন করে চিঠির জবাব দিয়েছিলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পর হজরত শাহ সাহেবের ইনতেকাল হয়ে যায়। আমার জন্য উনার ইনতেকাল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ছিল। কারণ পাকিস্তানে উনার সমমানের আধ্যাত্মিক পুরুষ তৎকালীন সময়ে ছিল না। ফলে এই পথে আমি আবার রাহবারহারা হয়ে পড়ি। মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব আমার এমন বিচলিত অবস্থা দেখে সান্ত্বনা গ্রহণের জন্য হলেও একবার সারগোদা সফরের অনুমতি দেন। আমি সময় বের করে সারগোদা সফর করি এবং হজরতের সাহেবজাদা মাওলানা সাইদুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করি। তিনি আমাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আপন করে নেন। একদিন সন্ধ্যায় বেশকিছু খলিফার উপস্থিতিতে তিনি আমাকে বলতে থাকেন, হজরত আব্বা হুজুর তো আপনার কথা প্রায়ই বলতেন। নিউটাউনের এই মুফতি সাহেব অত্যন্ত সহজ-সরল মানুষ! আমার মন চায় আমি তাকে অনুমতি দিই। কিন্তু শর্ত হলো তাকে কিছুদিন আমার সাথে কাটাতে হবে। আমি তো তাকে কয়েকবার চিঠি লিখেও আসতে বলেছিলাম। কিন্তু জানি না কোন ব্যস্ততার কারণে তিনি আসতে

পারেননি! তুমি তার ব্যাপারে খেয়াল রেখো! অর্থাৎ আব্বা আপনাকে খুব দ্রুত অনুমতি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে উনি চলে গেছেন। তাই আমি আপনাকে আব্বার অনুমতিক্রমে আব্বার পক্ষ থেকে ইজাজত দান করছি। তিনি আমাকে বলেন, কেউ আপনার নিকট এলে তাকে বাইয়াত করে নেবেন। আল্লাহর নামের জিকির শিখিয়ে দেবেন। সেসময় তারা লোকদেরকে চিশতিয়া সিলসিলায় জিকিরের সবক প্রদান করতেন। তিনি হজরত শাহ্ আবদুল কাদের রায়পুরির খলিফা ছিলেন। হজরত শাহ সাইদুর রহমান সাহেবের অনুমতিতে আমি এতটাই খুশি হই যে তা লিখে নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করিনি। তবে হজরত শাহ সাহেব করাচিতে আমাকে যেই আমলগুলো দৈনন্দিন করার আদেশ দিয়েছিলেন আমি তা ধরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। এই একই সফরে হজরতের সাহেবজাদাও আমাকে তার ব্যক্তিগত খেলাফত দান করেন। অবাক করা বিষয় হলো হজরত শাহ আবদুল আজিজ সাহেব এবং তার সাহেবজাদা হজরত সাইদুর রহমান সাহেব অর্থাৎ পিতা-পুত্র উভয়েই হজরত মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদের রায়পুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য খলিফা। ফলে এই এক সফরে একই নিসবত থেকে দুটি অনুমতি আল্লাহ পাক আমাকে দান করেন, আলহামদুলিল্লাহ!!

সুলতানি খেলাফত

বাংলাদেশ সৃষ্টির কিছুদিন পর পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়। ফলে চিঠিপত্র লেখালেখি এবং তা আদানপ্রদান করাও সহজ হয়ে পড়ে। আমি প্রথম সুযোগেই দেশে এসে পড়ি এবং পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের সাথে বহুদিন পর সাক্ষাত করি। এই সফরে আমি হজরত নানুপুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথেও সাক্ষাত করি এবং বিগত সময়ে আধ্যাত্মিক জগতে আমার পদচারণার বিস্তারিত ঘটনা তুলে ধরি। উনি হজরত শাহ সাহেবের কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হন এবং দোয়া করেন। পাশাপাশি বলেন, উনি তো আপনাকে কাদেরিয়া সিলসিলায় অনুমতি এবং আমল দিয়েছেন, যা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিছুটা স্বল্পমাত্রায় আমল করা হয়। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনি চিশতিয়া সিলসিলায় মেহনত করুন। এই বলে তিনি আমাকে চিশতিয়া সিলসিলার কিছু আমল বলে দেন এবং ফিরে যাওয়ার পর পাকিস্তান থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার আদেশ করেন। আমি এরপর পাকিস্তান চলে আসি এবং প্রায় দুই বছর পাকিস্তানে অবস্থান করি। এই সময়ের মধ্যে হজরত নানুপুরির সাথে আমার যোগাযোগ ঠিকঠাক ছিল। তাকে নিয়মিত পত্র লিখতাম এবং তিনি জবাব প্রদান করতেন। প্রাতিষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক ব্যস্ততার দরুন সমান্তরালভাবে ইসলাহি আমলগুলো চালিয়ে যেতে খুব বেগ পেতে

হচ্ছিল। তাই আমি হজরত নানুপুরিকে একবার চিঠিতে জানালাম, হজরত, এভাবে আমল করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কখনো কখনো আমল ছুটে যায়। আমাকে একটু পরামর্শ দেবেন কীভাবে আমল ধরে রাখতে পারি! জবাবে উনি লেখেন, মুফতি সাহেব, আমল কখনো কখনো ছুটে যাওয়া মন্দ কিছু নয়। আপনি সাধ্যমতো আমল জারি রাখুন। পরের অংশে তিনি আমাকে চিশতিয়া সিলসিলায় ইজাজত দান করেন এবং একটি শর্ত উল্লেখ করে বলেন, আপনি আগামী ছয় মাস পর্যন্ত কাউকে এই অনুমতির বিষয়ে জানাতে পারবেন না। আমি হজরতের এই জবাবিপত্র ফতোয়ায়ে আলমগিরির কোনো একটি অধ্যায়ের মাঝে রেখে দিই, যাতে এর কথা আমার নিজেরও স্মরণে না থাকে। এভাবে চিশতিয়া সিলসিলায় হজরত নানুপুরির ইজাজত আমি লাভ করি আলহামদুলিল্লাহ!

খোয়াবি ইজাজত!

আরেকবারের ঘটনা। আমি জামশেদ রোডের উসমানিয়া মসজিদে আমার কামরায় শুয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় একটি স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নটি অত্যন্ত আজব ধরনের ছিল। এই স্বপ্নের কিছু প্রেক্ষাপট রয়েছে। আগে সেটি বলে নিই। মাওলানা আবদুল আযিয রায়পুরি সাহেবের পর পাকিস্তানের আর একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হজরতের নাম মাওলানা ইয়াহইয়া বাউলনগরি। তিনি প্রতি বছরের মতো উমরার উদ্দেশে একবার নিউটাউনে আগমন করলেন। শিক্ষকদের সাথে একটি ঘরোয়া মজলিসে ডক্টর হাবিবুল্লাহ আমাকে উনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এই বলে যে, আমাদের মুফতি সাহেব হজরত অনুমতিপ্রাপ্ত। খবরটি জেনে হজরত বাউলনগরি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আমার সাথে খুব মহব্বতের সঙ্গে মুসাফাহা করেন। পরবর্তী দিন আমি জোহরের নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে আমার কামরায় যাচ্ছিলাম এমন সময় খেয়াল করলাম হজরত বাউলনগরি আমার মসজিদে সুন্নাত আদায় করছেন! আমি তো দেখে অবাক! হজরতের নামাজ শেষ হলে আমি উনাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার গরিবালয়ে নিয়ে আসি। উপস্থিত যা ছিল তা দিয়েই মেহমানদারি করি। সেদিন ঘরে কিছু মুরগির স্যুপ রাখা ছিল, তাই প্রথমে পেশ করলাম। এরপর চা পানের অনুরোধ জানালে হজরত বললেন, চা তো আমি সব সময় পান করে থাকি। কিন্তু স্যুপ অত্যন্ত উপাদেয়। এরপর আর চা পানের প্রয়োজন নেই। আপনার মেহমানদারি আমার খুব পছন্দ হয়েছে- এই বলে তিনি বিদায় নিলেন। আমি হজরতের গাড়ি পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। এরপর তিনি উমরার সফরে চলে গেলেন।

উমরার সফর থেকে ফিরে হজরত সরাসরি পাঞ্জাবে চলে যান। উনার এক সাহেবজাদা নিউটাউনে আমার অধীনে তাখাসসুস ফিল ফিকহ অর্থাৎ ইসলামি আইনশাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণায় অধ্যয়নরত ছিলেন। হজরত যখন উমরা থেকে ফিরে আসছিলেন তখন নিউটাউনে ছুটি চলছিল। উনার সাহেবজাদা পাঞ্জাবে তার নিজ বাসায় ছুটি কাটাচ্ছিলেন। হজরত সফর শেষ করে এসে তাকে একটি চিঠি প্রদান করেন। চিঠিটি আমার উদ্দেশে লেখা ছিল। এখানে তিনি আমাকে তার পক্ষ থেকে অনুমতি দান করেন। সেই সুযোগ্য ছেলে ছুটি শেষে মাদরাসায় এসে আমাকে চিঠি দেয়। এর কলেবর ছিল বিশাল। কিন্তু তার পূর্বরাতেই অবাক করা স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নে দেখি বাউলনগরি হজরত আমাকে পাঞ্জাবে দাওয়াত দিয়েছেন। আমি এবং সাথে আমার শ্যালক অর্থাৎ মুফতি নুরুল হক সাহেবের মেঝ ছেলে কারি রুহুল্লাহ দাওয়াতে অংশ নিতে হজরতের পাঞ্জাবের বাসায় সফর করছি। সেখানে হজরত আমাদের অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। যেভাবে জামাইকে মানুষ অত্যন্ত মহব্বত ও ভালোবাসার সাথে আপন করে নেয়, ঠিক আমার সাথে এই আচরণ করা হচ্ছিল। তিনদিন যাবত আমাদের খুবই যত্নের সাথে মেহমানদারি করা হলো। এরপর বিদায়ের সময় হজরত বাউলনগরি আমাকে এমনভাবে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন মনে হচ্ছিল উনি নতুন জামাইকে বিদায় জানাচ্ছেন। ভাই মুফতি সাহেব! কোনো ভুলত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন। আর আমার কথা দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। এভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বিনম্রভাবে আমাকে বিদায় জানালেন। ফজরের নামাজের সময় আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়। আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে ভাবতে থাকি এটি কেমন স্বপ্ন! আমি তো কোনোদিন পাঞ্জাব সফরও করিনি। আর সেখানে আমার কোনো পরিচিত সাথিবান্ধব অথবা বাঙালি আত্মীয়স্বজনও নেই। তাহলে কীভাবে বিবাহের মতো একটি বিষয় আমি স্বপ্ন দেখলাম। উপরন্তু আমি তো বিবাহিত পুরুষ! তাহলে হজরতের পরিবারের সাথে কীভাবে নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি![১১০] আমি যদি একা এবং অবিবাহিত থাকতাম তাহলে স্বপ্নের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেত! কোনোভাবেই এই স্বপ্নের কুলকিনারা করতে পারছিলাম না। সকালে নাশতা করে মাদরাসায় চলে যাই। নির্ধারিত ক্লাসগুলো গ্রহণের পর দারুল ইফতায় দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ঠিক এই সময়ে হজরতের সাহেবজাদা আমার কাছে দারুল ইফতায় দেখা করতে আসে। তার হাতে দেখা যাচ্ছিল একটি সুদৃশ্য চিঠির খাম। আমার সাথে সালাম-মুসাফাহার পর সে বলতে লাগল, উসতাদজি, আমি তো দুয়েকদিন হলো ছুটি শেষ করে মাদরাসায় এসেছি। আমার আব্বু উমরার সফর শেষে পাঞ্জাবে পৌঁছেছেন। উনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন আর আপনার উদ্দেশে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

---

১১০. ততদিনে মুফতি সাহেব দুই বিবির স্বামী। তৃতীয় বিয়ের আর তেমন প্রয়োজন ছিল না।

আপনি মেহেরবানি করে গ্রহণ করলে খুশি হতাম। এই বলে সে চিঠিটি আমার হাতে দিয়ে বিদায় নেয়।

হজরত বাউলনগরির চিঠিটি অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল। আমি খাম খুলে দেখি প্রায় ৮ পৃষ্ঠার একটি চিঠি। সেখানে তিনি তার সুলুকের পথে অনুমতি পাওয়ার বিস্তারিত ঘটনা লিখেছেন। কীভাবে হজরত আবদুল কাদের রায়পুরি সাহেব তাকে অনুমতি দিয়েছেন সেসব ঘটনা বলেছেন। এরপর তিনি লিখেছেন, আপনাকে আমি আমার বুজুর্গদের ইশারায় সিলসিলায়ে কাদেরিয়ায় বাইয়াত করার ইজাজত দিলাম। আপনি আপনার পছন্দমতো মানুষদের বাইয়াত গ্রহণ করতে পারবেন। এরই সাথে তিনি আরেকটি পৃথক চিঠিতে লিখিতভাবে আমাকে অনুমতিপত্র দান করেন। এই দুটো চিঠি একই খামে ছিল। আমি একটু অবাক হই এবং সাথে সাথে তার ছেলেকে ডেকে পাঠাই। সে এলে তাকে বলি মাওলানা, আপনার আব্বাজান তো আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তো তার হাতে বাইয়াত নই। তাহলে কীভাবে কী হবে? সে বলে, হজরত, আব্বাজান তো জেনেশুনে আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এখানে অবাক হওয়ার কী আছে? আপনি যোগ্য বলেই তিনি বিনা বাইয়াতে অনুমতি দিয়েছেন। আপনি এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। আমি তাকে বলি মাশাআল্লাহ! আপনি ভালো বলেছেন। এরপর বাসায় যাওয়ার সময় আমার সাথে একটু দেখা করে জবাবিপত্র নিয়ে যাবেন।

পত্র পাওয়ার পর দিন আমি আরেকটি স্বপ্ন দেখি। একদিন আমি মাগরিবের নামাজ পড়ানোর জন্য উসমানিয়া মসজিদে বসে অপেক্ষা করছি; এমন সময় হজরত বাউলনগরি সেখানে তাশরিফ আনলেন। আমি তড়িঘড়ি করে তার ইসতিকবাল করলাম। আজান হয়ে গেলে ইকামতের সময় আমি তাকে নামাজ পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলে তিনি আমার অনুরোধ রাখলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন। আমার মনে পড়ে, তিনি প্রথম রাকাতে সুরা তিন তেলাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী রাকাতে কোন সুরা তেলাওয়াত করেছিলেন তা আমার স্মরণে নেই। অবাক করা বিষয় হলো তিনি দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। মুসল্লিরাও কেউ লোকমা দেওয়ার সাহস করেনি। নামাজের পর সবাই আমার দিকে প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। আমিও অসহায়ের মতো হজরতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন আমি কী করব! হজরত পেছনে ঘুরে আমার দিকে কিছুটা এগিয়ে এসে সবার উদ্দেশে বললেন, আমিও জানি নামাজ দুই রাকাত হয়েছে। বাকি এক রাকাত আপনাদের মুফতি সাহেব পড়িয়ে দেবেন। আমি নামাজ পড়াতে এগিয়ে যাওয়ার সময় স্বপ্ন থেকে জেগে উঠি। হজরতের জবাবিপত্রে আমি এই স্বপ্নেরও উল্লেখ করেছিলাম। তিনি একজন অভিজ্ঞ স্বপ্ন ব্যাখ্যাকার ছিলেন। এই স্বপ্নের তাই তিনি

দীর্ঘ একটি ব্যাখ্যা লেখেন, যা আমার জন্য খুবই কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ!!

আমার সালাসিল

হজরত সাইদুর রহমান রায়পুরি সাহেব, যিনি হজরত আবদুল আযিয সাহেবের পক্ষ থেকে এবং নিজের পক্ষ থেকেও আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেখানে কোনো বিশেষ সিলসিলা বা তরিকার নাম উল্লেখ করেননি। তিনি আমাকে কোন সিলসিলায় অনুমতি দিয়েছেন, এ নিয়ে আমি নিজেই দ্বিধায় ছিলাম। পরবর্তী সময়ে আমি তার খলিফা এবং আমার সহকর্মী মাওলানা আবদুল খালেক সাহেবের মাধ্যমে জানতে পারি হজরত সাইদুর রহমান সাহেব আলিমদেরকে সিলসিলায়ে আরবাআর[১১১] অনুমতি দিয়ে থাকেন এবং সাধারণ লোকদের শুধু কাদেরিয়া সিলসিলায় অনুমতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু হজরত সাইদ সাহেব তার দীর্ঘ চিঠিতে আমাকে উল্লেখ করে জানিয়ে দেন যে, তিনি আমাকে কাদেরিয়া সিলসিলায় অনুমতি প্রদান করেছেন। চিঠিতে তিনি দৈনন্দিন বেশ কিছু আমল এবং জিকিরও উল্লেখ করে দেন। আমি জীবনভর সেগুলো সাধ্যমতো আমল করার চেষ্টা করে গেছি।

অসামান্য ত্যাগ : অনন্য প্রাপ্তি

এরপর পাকিস্তানের কোনো বড় বুজুর্গের সাথে আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে চলে আসার এক বছর পূর্বে আমি একবার বাংলাদেশ সফর করি। আমার একটি অভ্যাস ছিল, প্রত্যেক সফরেই আমার উসতাদদের সাথে একবার হলেও দেখাসাক্ষাত করতাম। সেই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক সফরেই কমপক্ষে একবার হলেও হাটহাজারিতে আসার সৌভাগ্য হতো। সেবার হাটহাজারিতে এসে মুফতি আহমাদুল হক সাহেবের সাথে বেশ অনেকক্ষণ ধরে সাক্ষাত করি। হজরত আমার বেশ খাতিরদারি করেন; যদিও সেটি চা এবং বিস্কুটের সমন্বয়ে ছিল; কিন্তু তার হৃদয় ছিল আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। সে সময় হজরত অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। দুজন ছাত্রভাই তাকে সব সময় সাথে নিয়ে চলাফেরা করত। ডাক্তারের ভাষ্যমতে, একা চলাফেরা তার স্বাস্থ্যের জন্য ছিল অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। আমি হজরতের বিগত জীবনের ব্যাপারে বেশ ভালোভাবে অবগত ছিলাম। অসাধারণ ও প্রায় অসম্ভব রকমের কিছু ত্যাগ তার জীবনে ছিল, যা স্বাভাবিকভাবে একজন আলেমের অবস্থানকে অনন্য করে তোলে।

---

[১১১]. তাসাউফের বিখ্যাত চারটি ধারা। অন্তর ও ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির জন্য এই ধারাগুলো অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হয়ে আসছে।

মুফতি সাহেব যৌবনকালে দেওবন্দ গমন করেছিলেন। সেখানে হজরত মাদানির শাগরেদ হবার সৌভাগ্য লাভ হয় তার। হজরত মাদানি তখন বার্ধক্যে পা রাখতে চলেছেন। ঋজুতায় পূর্ণ মাদানির অভিজ্ঞতালব্ধ সময়ে তিনি মাদানির সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এ সময় হজরত মুফতি সাহেবের আত্মশুদ্ধির পথচলা শুরু হয়। হজরত মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেবের হাতে তিনি সেসময় বাইয়াত হয়েছিলেন। দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর সোজা দেশে চলে আসেন। প্রথমে পটিয়া মাদরাসায় চার বছর এবং এরপর হাটহাজারি মাদরাসায় জীবনের শেষ পর্যন্ত খেদমত করেন। এরই মাঝে এক সময় জানতে পারেন তার পির ও মুরশিদ মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। খবরটি অত্যন্ত ব্যথিত করে তাকে। পাশাপাশি তিনি রাহবারবিহীন হয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই পথে কীভাবে আবার একজন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ পাওয়া যায় সেই ফিকিরে তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। কিছুদিনের মধ্যেই তার মাথায় একটি চিন্তার উদয় হয়। কেন আমি হজরত মাদানির সান্নিধ্য অর্জনের জন্য আবার দেওবন্দ গমন করছি না! কেন তার জীবদ্দশাকে গনিমত মনে করছি না! এই ভাবনা থেকেই তিনি তার স্ত্রীর নিকট দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তার স্ত্রীও খুব আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের কন্যা ছিলেন। তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত একজন বুজুর্গ মাওলানা জমিরুদ্দীন সাহেবের (খলিফায়ে মুজায, হজরত গাঙ্গুহি) আদরের কন্যা ছিলেন এই মহীয়সী। দীনের পথে স্বামীর অগ্রগতির সামনে বাধার উপকরণ হতে চাননি। স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে প্রিয় স্বামীকে তিনি দেওবন্দ গমন করার অনুমতি প্রদান করেন। স্ত্রীর অনুমতি পেলে মুফতি সাহেব হাটহাজারি থেকেও এক বছরের জন্য ইস্তফা নিয়ে নেন।

সবদিক থেকে অনুমতি পেয়ে মুফতি সাহেব দেওবন্দের পথ ধরেন। সেখানে হজরত মাদানির সাথে সাক্ষাত হয়। হজরত মাদানি তাকে দেওবন্দ সফরের কারণ জিজ্ঞাসা করলে মুফতি সাহেব নিজের মনের ইচ্ছা ও বাংলাদেশে তার খেদমতের অবস্থান তুলে ধরেন। হজরত মাদানি তার এই ত্যাগের অভিপ্রায়ের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং খুশি প্রকাশ করেন। মুফতি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে হজরত মাদানি বলেন, মুফতি, তোমাকে আল্লাহ কবুল করুন। তুমি যতদিন ইচ্ছা আমার এখানে অবস্থান করতে পারো। যখন তোমার ইচ্ছা এবং লক্ষ্য পূরণ হয়ে যাবে তখনই তুমি দেশে যাবে। আমার পক্ষ থেকে তোমার দীর্ঘ অবস্থানের ব্যাপারে পূর্ণ সম্মতি দান করলাম। এভাবে হজরত মুফতি সাহেব হজরত মাদানির ইলমি শাগরেদ থেকে ইসলাহি শাগরেদ হিসেবে দেওবন্দে অবস্থান করতে লাগলেন।

হজরত মাদানির পক্ষ থেকে সাধারণ অনুমতি পাওয়ার পর মুফতি সাহেব ভাবতে থাকেন, যেহেতু হজরত মাদানি কোনো সময়সীমা বেঁধে দেননি, তাই কবে নাগাদ তিনি দেশে যেতে পারবেন তা এই মুহূর্তে তার নিজেরও জানা নেই। কয়েক মাস লাগতে পারে, আবার কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে। এই ভাবনা থেকে তিনি জীবনের একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। নিজের কামরায় গিয়ে কলম হাতে নিয়ে কাগজে কালির আঁচড় টেনে একটি চিঠি লিখে ফেলেন। চিঠিতে আপন শ্বশুরমশাইকে উদ্দেশ করে স্ত্রীর ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লেখেন। তিনি বিস্তারিতভাবে দেওবন্দের অবস্থা তুলে ধরে আবেদন করে বলেন, শ্বশুর সাহেব, স্ত্রীর অনুমতি নিয়েই আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখন আমার পক্ষে ইচ্ছামতো যথাসময়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি আপনার মাধ্যমে আপনার মেয়েকে তালাক প্রদানের অনুমতি দিচ্ছি। যদি তিনি আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন তা হলে তো আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যদি তার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে তিনি তালাক গ্রহণ করে নিতে পারেন এবং খুশি মনে অন্য কোথাও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ অনুমতি ও দোয়া থাকল। এই চিঠি পেয়ে হজরত মুফতি সাহেবের শ্বশুর ভাবনায় পড়ে যান। তিনি মেয়ের কাছে কম্পিত হাতে চিঠিটি নিয়ে যান এবং বিস্তারিতভাবে ঘটনা খুলে বলেন। তার মেয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে চিন্তাভাবনা করে জানান, একদম অনিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করা তো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তিনি আমাকে কোনো একটি সময়সীমা বেঁধে দিতেন তাহলে আমি অপেক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু তিনি কোনো সময়সীমা বলতে পারলেন না, তাই আমি উনার পক্ষ থেকে দেওয়া তালাকের সুযোগ গ্রহণ করতে চাই। আব্বা, আপনি তালাক গ্রহণ করে আমার ব্যাপারে অন্য কোথাও ভাবতে পারেন। সুবহানাল্লাহ! আত্মশুদ্ধির জন্য মুফতি সাহেব কত বড় কুরবানি করেছিলেন। এরপর মুফতি সাহেবের স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয়ে যায়। চট্টগ্রামের বিখ্যাত একটি খান্দানের একজন মাওলানা সাহেব মুফতি সাহেবের স্ত্রীকে ইদ্দত শেষ হবার পর বিয়ে করে নিয়ে যান।

দেওবন্দে অবস্থানরত অবস্থায় একদিন হজরত মাদানি মুফতি আহমাদুল হক সাহেবকে ডেকে বললেন, মুফতি, তুমি কি কালামে পাক হিফজ করেছ? মুফতি সাহেব জবাবে বললেন, জি না হজরত! আমি তো কালামে পাক ছোটবেলায় মুখস্থ

করার সুযোগ পাইনি। হজরত মাদানি তাকে কালামে পাক হিফজ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে বলেন, কালামে পাক হিফজ করে ফেলো। এই কালাম তোমাকে সব সময় নুর প্রদান করবে। জীবনভর হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে। হজরত মাদানির আদেশে মুফতি সাহেব তখন থেকেই কুরআন হিফজ করা শুরু করে দেন। মধ্যবয়সে এসে এই কঠিন কাজ আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ থাকায় তিনি মাত্র দুই বছরে সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। আলহামদুলিল্লাহ! যেদিন তিনি কালামে পাকের হিফজ শেষ করেন, সেদিনই হজরত মাদানি তাকে চার সিলসিলায় অনুমতি প্রদান করেন। হজরত মাদানি মুফতি সাহেবের উপর খুশি হয়ে তার বিরল ও দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি ইজাজতও মুফতি সাহেবকে প্রদান করেন। তন্মধ্যে তাঁর এবং তাঁর মাধ্যমে হজরত হাজি সাহেবের বিশেষ অনুমতি উল্লেখযোগ্য। এভাবে একটি বড় কুরবানির কারণে হজরত মুফতি সাহেবকে আল্লাহ তায়ালা অনেকগুলো বড় বড় নেয়ামত অর্জনের তাওফিক দান করেছিলেন।

হজরত মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি হজরত মুফতি সাহেবকে দীর্ঘ দুই বছর ধরে নিজের মতো করে গড়ে তোলেন। যেহেতু মুফতি সাহেব স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে মাদানির কাছে এসেছিলেন; তাই তিনিও একজন পির হিসেবে তার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। এই দুই বছরে হজরত মুফতি সাহেব আধ্যাত্মিকতার পথে অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন পথিকে পরিণত হন। কালামে পাক হিফজ করার পর হজরত মাদানি এক রমজানে তার নিকট থেকে পুরো কুরআন তারাবির নামাজে শুনে নেন। এরপর একসময় দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। অর্থাৎ যেতে চাইলে মুফতি সাহেব যেতে পারবেন অথবা চাইলে আরো কিছুদিন অবস্থান করতে পারবেন। মুফতি সাহেব অনুমতি প্রদানকে কেন্দ্র করে একটু চিন্তাভাবনা করলেন। তার মনে হলো, অনুমতি পেয়ে দেশে চলে যাওয়া একটু বেআদবিপূর্ণ হয়ে যায়। অনুমতি পেয়ে চলে যাওয়াতে এটিও প্রমাণিত হবে যে, অনুমতি পাওয়ার জন্য মুফতি সাহেব ব্যাকুল ছিলেন। তাই তিনি সাথে সাথে চলে না এসে আরো এক বছর অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন! এভাবে তিনি তার জীবনের স্বর্ণালি সময়ের ৩টি বছর নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য হজরত মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে অবস্থান করেন! এসময় তিনি একজন খাঁটি মানুষে পরিণত হন, আলহামদুলিল্লাহ!!

সুযোগের সন্ধানে আমি...

আমি মুফতি সাহেবের এই ঘটনাগুলো আগে থেকেই জানতাম। আমি তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর আচরণে, তাঁর চলাফেরায় এবং তাঁর লেখালেখিতে অনন্যসাধারণ নুরানি একটি ছটা অনুভব করতাম। আশপাশের অন্যান্য শায়েখদের থেকে তাকে আমার একটু ভিন্নরকম মনে হতো। সেজন্য তার প্রতি আমার ছিল আলাদা একটি ভালোলাগা। আমি তাই পরবর্তী সফরে হাটহাজারিতে শুধু হজরত মুফতি সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করি। এই দফায় আমার একটি বিশেষ নিয়ত ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি মুফতি সাহেবের হাতে বাইয়াত হব এবং সুযোগ হলে তার সুউচ্চ ও বরকতময় ইজাজতের সামান্য কিছু অংশ গ্রহণ করব। সেই উদ্দেশ্যে আমি হজরতের সাথে সাক্ষাত করি এবং আমার মনের গোপন ইচ্ছা তার সামনে প্রকাশ করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি সুলুকের পথে আগে চলাফেরা করেছেন? আমি জবাবে বলি, জি হ্যাঁ। আমি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কিছু হজরতের হাতে বাইয়াত হয়েছি। কয়েকজন হজরত যে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, এই তথ্য লজ্জার কারণে জানাইনি। তিনি সেসময় অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন; তবু আমার হাত এগিয়ে দিতে বললেন। আমি আমার ডান হাত এগিয়ে দিলে কিছুক্ষণ দেখেই বললেন, মুফতি, আপনাকে তো অনেকেই অনুমতি প্রদান করেছেন। তাহলে কেন শুধু শুধু আমার কাছে এসেছেন! নানা জায়গায় বাইয়াত হওয়া তো জরুরি নয়। আর অনেক মাশায়েখের মতে জায়েজও নয়। আমি জবাবে অনুরোধ করে বলি, হজরত, আমি তো প্রয়োজনের খাতিরে বাইয়াত হতে আসিনি; বরং বরকত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছি। আমার জবাব শুনে হজরত আমার হাতে হাত রেখে আমাকে বাইয়াত করালেন এবং তার সকল ইজাজত আমাকে দান করলেন। বিদায়ের সময় অনুরোধ করে বললেন, মুফতি সাহেব, আমি তো জীবনের শেষদিনগুলো কাটাচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে পাওয়া আমানত আপনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে উম্মতের যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেবেন। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাব বলে উনাকে আশ্বস্ত করি।[১১২] এরপর সেদিনের মতো হজরতের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করি।

---

[১১২]. হজরত চাটগামীর স্বর এসময় অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছিল।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

আমি নিউটাউনে প্রায় ২৫ বছর সুস্থ ও সবল অবস্থায় খেদমত করেছি। কিন্তু এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে পরীক্ষা করার জন্য প্যারালাইসিস নামক রোগে আক্রান্ত করেন। বাংলায় একে সম্ভবত পক্ষাঘাতব্যাধি বলা হয়। এর ফলে আমি চলাফেরায় অনেকটাই অক্ষম হয়ে পড়ি। নিউটাউনে দীর্ঘদিন খেদমত করার ফলে তারা আমার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আমি অসুস্থ হয়ে গেলেও তারা আমাকে সাধ্যমতো খেদমত করার সুযোগ দেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থাতেই আমি প্রায় ৫ বছর নিউটাউনে খেদমত করি। একবার হাটহাজারির মুহতামিম সাহেব আল্লামা আহমদ শফি দামাত বারাকাতুহুম উমরার উদ্দেশে নিউটাউনে যাত্রাবিরতি করেন। আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি আমার কাছেও আগমন করেন। আমি হজরত মুহতামিম সাহেবকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত এবং আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। হজরতকে আমার কাছে আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে হজরত বলেন, তুমি দেশি মানুষ, পরদেশে খেদমত করতে করতে অসুস্থ হয়ে গেছো। তাই তোমাকে দেখতে এলাম। উনি আমার খেদমতের ব্যাপারে সার্বিক খোঁজখবর নিলেন। আমি তখন অতিরিক্ত ক্লাসগুলো ছেড়ে দিয়েছিলাম। শুধু দারুল ইফতার প্রধান মুফতি হিসেবে প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করতাম। সেখানে আমার কাজ ছিল- ফতোয়া শুদ্ধ করে দেওয়া এবং প্রধান মুফতির স্বাক্ষর প্রদান করা। কিন্তু নিউটাউনের দায়িত্বশীলরা আমাকে আমার সম্পূর্ণ মাসিক ভাতা প্রদান করতেন। এসব শুনে মুহতামিম সাহেব আমাকে হঠাৎ করে একটি অনুরোধ করে বসলেন। উনি বললেন, আবদুস সালাম, তুমি তো অনেক যোগ্য মানুষ। কিন্তু সারা জীবনই পরদেশে দীন ও ইলমের খেদমত করে কাটিয়ে দিলে। নিজ দেশে দীনের খেদমত করতে কি তোমার মন চায় না? আমি জবাবে বলি, অবশ্যই! নিজ দেশে দীনের খেদমত করা তো কালামে পাকের আদেশ। কিন্তু হজরত, পরিস্থিতি ও সার্বিক বিবেচনায় এবং তাকদিরের ফয়সালার কারণে আমাকে এখানে থেকে যেতে হয়েছে। মুহতামিম সাহেব আমার কথা শুনে আমার হাত নিয়ে তার হাতের মাঝে রেখে বললেন, আবদুস সালাম, তুমি এতদিন সুস্থ ছিলে। খেদমত করেছ মাশাআল্লাহ। কিন্তু এখন তো তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তোমাকে দেখারও তেমন কেউ নেই। তুমি দেশে চলে আসো। আমি তোমার জন্য হাটহাজারিতে ব্যবস্থা করে দেব। তুমি এখানে যেভাবে দৈনিক এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করো, হাটহাজারিতেও

তুমি প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় দিয়ো। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি দেশে ফিরে আসো। তোমার জন্য এখন দেশে ফিরে আসাই মঙ্গলজনক হবে।

আমি হজরতকে প্রশ্ন করি, হজরত, আমি এখানে দীর্ঘদিন মেহনত ও খেদমত করেছি বলেই তারা আমার অসুস্থাবস্থাকেও মেনে নিচ্ছে। কিন্তু হাটহাজারিতে তো আমার এমন ঘণ্টাকালীন খেদমত কেউ মেনে নেবে না; বরং আমি হাসি ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে যেতে পারি!

মুহতামিম সাহেব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, কী যে বলো তুমি! যেই এক ঘণ্টা সময় হাটহাজারিতে দেবে, সেখানে বর্তমানে সবচেয়ে যোগ্য লোকেরা তাদের ৬ ঘণ্টা দিয়ে তোমার এক ঘণ্টা পরিমাণ খেদমত পূরণ করতে পারবে না। আল্লাহ পাক তোমাকে সেই যোগ্যতা দান করেছেন। তুমি এসব নিয়ে কোনো চিন্তা করো না। তুমি শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। এরপর আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করব। তোমার মতো যোগ্য এবং অভিজ্ঞ মুফতির উপস্থিতি হাটহাজারিতে অত্যন্ত প্রয়োজন। আর একটি কথা মনে রাখো! আমি যতদিন বেঁচে আছি এবং হাটহাজারিতে দায়িত্ব পালন করছি, ততদিন তোমাকে কেউ কিছু বলবে না ইনশাআল্লাহ। তুমি যেভাবে সহজ মনে করো সেভাবেই খেদমত করে যাবে। আমি যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব, তখন তোমার জন্য এখতিয়ার দিয়ে দিলাম। তুমি চাইলে হাটহাজারিতে থাকতেও পারো অথবা ভালো না লাগলে অন্য কোথাও চলে যেতে পারো। মনে রেখো! তোমার মতো মুফতি সাহেবকে বাংলাদেশের যেকোনো বড় প্রতিষ্ঠান নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

আমি হজরতের এমন আবেগি ও আবেদনমূলক কথায় নিজেও অত্যন্ত আবেগি হয়ে পড়ি। দেশে যাওয়ার ব্যাপারে এবং মাতৃভূমিতে অবস্থানের ব্যাপারে আমারও মন কাঁদত। কিন্তু পরিস্থিতি ও সুযোগ না থাকায় এ নিয়ে কখনো বেশি ভাবার সময় পাইনি। মুহতামিম সাহেবের মুখে এমন প্রস্তাব শুনে মনে হলো, আমার এই অসুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরে যাওয়াই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি ইশারা। আমি তাই মুহতামিম সাহেবকে আমার পক্ষ থেকে হাটহাজারিতে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করি। মুহতামিম সাহেব অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত হয়ে আমার কপালে চুম্বন এঁকে দেন। এরপর তিনি সফরে চলে যান। উমরা থেকে ফিরে এসে তিনি আরেকবার আমার সাথে সাক্ষাত করে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করেন যে, আমি দেশে ফিরছি। এদিকে আমি নিউটাউনের দায়িত্বশীলদের সাথে হজরতের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করি। তারা মুহতামিম সাহেবের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ফলে আমার প্রতি তাদের আকাশচুম্বী আকর্ষণ থাকলেও আমার অসুস্থতার ব্যাপারটি খেয়াল করে এবং মুহতামিম সাহেবের প্রস্তাব ও আন্তরিক ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে

তারা আমাকে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এভাবে প্রায় ৩০ বছর অর্থাৎ তিন তিনটি দশক বিদেশের মাটিতে কাটিয়ে দিনশেষে মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার তাওফিক আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দান করেন। অবশেষে আমি ২০০১ সালে দেশে ফিরে দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারিতে যোগদান করি।

পারিবারিক জীবন

(আমার পারিবারিক জীবনের উপর এক ঝলক)

আমি যখন জিরি মাদরাসা থেকে ফারেগ হই, তখনই আব্বা আমার বিবাহ করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম আরো কিছুদিন পড়াশোনা করতে। হিন্দুস্থান বা পশ্চিম পাকিস্তানে আরো এক-দু বছর পড়াশোনা করতে পারলে ভালো হতো। এই ভেবে আব্বাকে আমি না করে দিই। মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর বারবার বিদেশে না যাওয়ার ব্যাপারে বুঝাতেন। বলতেন এখানেই থাকো। পড়াশোনা করো। ইলমে বরকত হবে। কিন্তু আমার তরুণ মন সফরের জন্য ব্যাকুল ছিল। তুমি যা করতে চাচ্ছ এটা তাকমিলে ফুনুন না; বরং আমি একে বলি তাকমিলে জুনুন।[১১৩] তবে যদি যেতেই হয় তাহলে আল্লামা বানুরির কাছে যাও। শাহ্ সাহেবের ইলম তাঁর সীনায় আছে। এ ছাড়া অন্য কোথাও গেলে আমার অনুমতি নেই। করাচি গিয়ে আমি হজরতের এই কথার সত্যতা পেয়েছিলাম। প্রচুর অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছিল, যা হয়তো আমি এখানে থাকলে সম্ভব হতো না। আল্লাহর মেহেরবানি!

ওখানে যখন শিক্ষকতা করতাম, তখন অনেকেই মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেবের কাছে এসে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমি যেহেতু দূরের মানুষ, এখানে জীবনভর থাকব কি না এই বিষয়টা অনেকেই জানতে চাইতেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল মেয়ে বিয়ে দেওয়া! কিন্তু কেউ আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতেন না। ঘটনাবশত মুফতি সাহেব একদিন আমাকে ডেকে কাছে বসালেন। স্নেহের সাথে বিবাহের সুন্নাতের ব্যাপারে একটু তারগিব দিলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি এখানেই থেকে যাব নাকি মনমাঝে দেশে যাওয়ারও ইচ্ছা আছে? আমি একটু থেমে হজরতকে জবাব দিলাম, হজরত, আমি আব্বাজানকে দেশে থাকতে কথা দিয়েছি, আমি বিবাহ করলে সেখানেই করব। আর সুযোগ এলে আমি দেশেও চলে যাব। আপনাদের সান্নিধ্য তো আমার জন্য পরম পাওয়া। আপনাদের হায়াত পর্যন্ত আমি আছি। এরপর আল্লাহ্ চাইলে আমি চলে যাব। তাই এখানে বিবাহশাদির ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। হজরত আমার স্পষ্ট জবাব পেয়ে খুশি হয়ে

---

১১৩. নিরুৎসাহিত করার জন্য বিদ্রূপাত্মকভাবে বলতেন। এর অর্থ পাগলামির শেষসীমা।

দোয়া দিলেন। স্বগতোক্তি করলেন, ওয়াতান ভুলে যাওয়া খুব ভালো জিনিস না। তোমার অনুভূতি আমাকেও হিন্দুস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

ওদিকে দেশে এক চাচাত বোনের সাথে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল। আমাকে আব্বাজান চিঠি লিখলেন। আমি জবাবে লিখি—আব্বা, দেখুন, এখন দেশে আসা একটু কঠিন। আর সে যেহেতু বিবাহযোগ্য, তাই বিলম্ব না করে বিয়ে করিয়ে দিন। আমি পরে দেশে এসে বিয়ের ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ মেনে সামনে এগোব। এই ঘটনা যুদ্ধের কিছুদিন পরের। এরপর প্রায় সাত বছর কেটে যায়। আমি শিক্ষকতা, দারুল ইফতা ও ব্যক্তিগত অধ্যয়নে এত বেশি ডুবে যাই যে, বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করতে পারিনি। সাত বছর পর পিআইএর[১১৪] ফ্লাইট শুরু হয় বাংলাদেশের সাথে। প্রথম ফ্লাইটেই আমি টিকিট কেটে ফেলি। তখন ২২০০/- রুপি ছিল টিকিটমূল্য। টেলিগ্রাফের মাধ্যমে বাড়িতে জানিয়ে দিই আমি দেশে আসছি। ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে সেখান থেকে সাথি ইয়াকুবের সাথে চট্টগ্রাম যাই। এরপর এলাকাবাসী যাতে বিরক্ত না হয় সেজন্য রাতের বেলায় বাড়ির পথ ধরি। এশার পর মাথায় পোটলা নিয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। দীর্ঘ প্রায় সাত বছর পর! সুবহানাল্লাহ! জানালার কাছে গিয়ে আস্তে করে আওয়াজ দিই। আমার ছোট ভাই আবুল কাসেম টেবিলে বসে পড়াশোনা করছিল। আমার আওয়াজ সে দুই সেকেন্ডেই বুঝে ফেলে। দৌড়ে গিয়ে আব্বা-আম্মাকে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে, ভাইজান এসেছে ভাইজান! সবাই হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। আব্বা-আম্মা-ভাই সবার সাথে মুলাকাত করি। স্বাভাবিকভাবেই অনেক আবেগ এসে জমা হওয়ার কথা। তাই-ই হলো। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি চলল। এভাবে সবার অগোচরে আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি।

পরদিন এলাকাবাসী জানতে পেরে হইচই লাগিয়ে দেয়। আবদুস সালাম এসেছে! ও বেঁচে আছে! অনেকে ভেবেছিল আমি বেঁচে নেই। বা বেঁচে থাকলেও আর কখনো ফিরে আসতে পারব না। তাই এলাকাবাসী 'জীবন ফিরে পাওয়া ছেলেটিকে' একনজর দেখতে ভিড় জমিয়ে ফেলে। আব্বা পরে বুঝিয়েসুঝিয়ে সবাইকে বিদায় দিয়ে বললেন, ও থাকবে কিছুদিন। আপনারা ধীরেসুস্থে ওর সাথে দেখা করবেন।

থানাজুড়ে প্রস্তাব!

এদিকে আমার আসার সংবাদ এলাকাজুড়ে বরং পুরো থানাজুড়ে একটা আনন্দের পরিবেশ তৈরি করল। আমি দেশে এসে বিয়ে করব- এই কথাও জনে জনে রটে

---

[১১৪] পাকিস্তানের জাতীয় বিমানসংস্থা

গিয়েছিল। ফলে আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই খুব বড় বড় ঘর থেকে ৮/১০টি বিয়ের প্রস্তাব এসে গেল। আব্বা তো অবাক। উনি এত বেশি প্রস্তাব আশা করেননি। দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রস্তাবগুলো সবই ছিল দুনিয়াদার পরিবার থেকে। এরা মূলত নিজের মেয়েকে বিদেশে পাঠানোর জন্য প্রস্তাব পাঠাচ্ছিল। তারা তো আর জানত না যে ওখানে আমি কত বেতনের চাকরি করি! আমাদের দেশের মানুষের এই বিদেশ গমনের ইচ্ছাটা আমাকে খুবই অবাক করে! যাই হোক, এই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখ করছি। তাহলেই বাকিগুলোর ব্যাপারে ধারণা পেয়ে যাবেন। এই পরিবারগুলোর একটি ছিল আমাদের থানার চেয়ারম্যান পরিবার। সে এলাকায় চার দশক ধরে চেয়ারম্যান হয়ে আসছিল। দেওবন্দি চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন যদিও; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত দুনিয়াদার। সে আব্বাকে পয়গাম পাঠায় এই বলে যে, আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই। সাথে 'উপহার' হিসেবে ৭০ হাজার টাকা দেব। আব্বা তো শুনেই হেসে দেন। আর আমার উঠেছিল রাগ। আমি কি টাকা বিয়ে করব! আব্বা খুব আদবের সাথে তাকে 'না' করে দিয়েছিলেন। এদিকে আমাদের খান্দানে দুজন চাচাত বোন ছিল তখন। ওরাও ছিল বিবাহযোগ্য। চাচারা চাচ্ছিলেন আমি কোনো একজনকে বিয়ে করি। কিন্তু আম্মা এই প্রস্তাবগুলো পছন্দ করছিলেন না। তাই আমিও আম্মার সম্মানে আব্বাকে 'না' বলে দিই।

আমার উসতাদগণ জেনে গিয়েছিলেন, আমি দেশে এসেছি। অনেকের সাথেই দেখা করেছিলাম। আবার অনেকে দূরে থাকায় তখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। একদিন আব্বার পরামর্শে দেশের সকল উসতাদকে বাড়িতে দাওয়াত করলাম। উদ্দেশ্য ছিল, উনাদের শুকরিয়া আদায় করা আর বিয়ের ব্যাপারে একটু পরামর্শ করা। দাওয়াতে শাহমিরপুরের মাওলানা আযিযুল হক সাহেব মুফতি নুরুল হক সাহেবের পক্ষ থেকে এসেছিলেন। উনারা আহমদ হাসান সাহেবের নাতনির ব্যাপারে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।[১১৫] তখন এটা আমার জানা ছিল না। আব্বা যখন তাদের সাথে

---

[১১৫]. আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া জিরির প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ক্ষণজন্মা মনীষী আধ্যাত্মিক পুরোধা আল্লামা শাহ আহমদ হাসান রহ.। সমগ্র বাংলাদেশের আলেমসমাজে এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের সর্বমহলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম।

১৮৮২ সালের এক শুভক্ষণে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন জিরি গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন দীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই মহান মনীষী। পিতা অসিউর রহমান মুন্সি ছিলেন সমাজের ঐশ্বর্যশালী পরহেজগার আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিত্ব।

পারিবারিক ঐতিহ্যানুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষার হাতেখড়ি পিতার তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষকের কাছেই। ঘরে থেকেই বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত, প্রাথমিক কিতাবাদি, উরদু, ফারসি, মাতৃভাষা বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার মৌলিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৩১৫ হিজরী সনে ১৫ বছর বয়সে চট্টগ্রাম শহরের মোহসেনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ==

আলোচনা করলেন তখন এই প্রস্তাবের কথাটি উঠে এল। সবাই শুনে খুব খুশি হলেন। সঠিক প্রস্তাব এটি- এমনই মত ছিল সবার। মুফতি জিয়াউল মুলক সাহেবকে আব্বা একটু খোঁজখবর নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। উনি সব খবর নিয়ে ইতিবাচক ইশারা দেন। এরপর আব্বা আমাকে মতামত জিজ্ঞেস করলেন, এখানে এগোনো যাবে? আমি বললাম, হতে পারে। আব্বা বাড়ির কিছু মহিলাকে পাঠানোর ইচ্ছা করেছিলেন; কিন্তু আমি নিষেধ করি। আমার আব্বা বললেন, তাহলে তুমি দেখে আসো। আমি মাওলানা আযিযুল হক সাহেবকে সাথে নিয়ে দেখে আসি। আমি দুয়েকবার ইসতিখারা করে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে। ইনশাআল্লাহ চাইলে এখানে এগোনো যায়। আব্বা খুশি হয়ে তাদের ওখানে সামাজিকভাবে প্রস্তাব পাঠালেন। পরদিন আমার আব্বা মাওলানা মুহাম্মদ সাহেবকে সাথে নিয়ে জিরি চলে যান। ওখানে গিয়ে আলোচনা উঠলে কিছু জরুরি বিষয় মেয়েপক্ষ তুলে ধরলেন। উনারা আসলে ছিলেন আকাবিরদের খান্দান। রেওয়াজ ও রুসুমাত[১১৬] তো একদমই পছন্দ করতেন না। তাই এগুলো খোলামেলা আলোচনা করে দিলেন। প্রথমত উনাদের খান্দানে মোহরে ফাতেমিতে[১১৭] বিয়ে হয়। তাই মোহরের ব্যাপারে এটাই চূড়ান্ত। আর

==তিন বছর এখানে ইলম অন্বেষণে কাটিয়ে পারিপার্শ্বিক কিছু কারণে ১৩১৮ হিজরী সালে উম্মুল মাদারিস হাটহাজারী মাদরাসায় চলে যান। সেখানে খ্যাতিমান, যুগশ্রেষ্ঠ বরেণ্য আলেমেদীন, বুজুর্গ, আল্লাহভীরু উসতাদবৃন্দের সান্নিধ্যে থেকে ইলমে ওহী অন্বেষণ করে ১৩২৭ হিজরীতে কুরআন, হাদীস, ফিকহে ইসলামী এবং দর্শনশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্য নিয়ে শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করেন।

ঐতিহ্যবাহী জিরি মাদরাসার প্রতিষ্ঠা : শাহ আহমদ হাসান দাওরায়ে হাদীস শেষ করে ১৩২৮ হিজরী/১৯১০ ইংরজি মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটি জিরি এলাকায় স্থানান্তরিত করে প্রথমে মাদরাসা হেমায়াতুল ইসলাম, জিরি নাম দিয়ে "বাদাম" বৃক্ষের নীচে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে থাকেন। পরবতীতে তা "আল-মাদরাসাতুল আরাবিয়্যা জিরি" এবং সময়ের আবর্তনে বর্তমানে যা "আল জামিয়া আল ইসলামিয়া জিরি" নামে সর্বমহলে পরিচিত।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চার স্ত্রীর পাঁচ কন্যাসন্তানের বাবা ছিলেন। প্রথমজীবনে অনেক চেষ্টা-তদবিরের পরও তাঁর ঔরসে কোনো পুত্রসন্তান বেঁচে না থাকায় তিনি আনোয়ারা থানাধীন গহিরার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে এক সন্তানের মাতা রশিদা খাতুনকে বিয়ে করেন।

শেষবয়সে এসে দীনের এই দরদি মুবাল্লিগ, কর্মবীর খ্যাতিমান আলেমেদীন বার্ধক্যজনিত জটিল রোগ এবং হাত-পা অবশ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ ছয়মাস কষ্ট ভোগ করে ১৩৮৬ হিজরী/১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১১ শাওয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের সময় মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে না-ফেরার জগতে পাড়ি জমান। মুহাদ্দিসে জমান আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ সন্দ্বীপী রহ. এর ইমামতিতে জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে মাদরাসা মসজিদের পূর্বদিকস্থ সমাধিস্থলে তিনি চির শান্তির নিদ্রায় শায়িত হন।

[১১৬]. সামাজিক অযথা প্রথা ও কুসংস্কার। এসবের জন্য বরকত নষ্ট ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

[১১৭]. যেই মোহরে নবীকন্যা ফাতিমার বিয়ে হয়েছিল। বর্তমান হিসেবে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বা সমপরিমাণ মূল্য।

দ্বিতীয়ত বরযাত্রা বলে কোনো রেওয়াজ ইসলামে নেই। তাই দলবেধে আত্মীয়স্বজন ও পাড়ামহল্লার মানুষ নিয়ে বিয়েতে আসা যাবে না। হ্যাঁ, কিছু আত্মীয়স্বজন যারা না এলেই নয় শুধু তাদের নিয়ে আসা উচিত। ভরপুর আপ্যায়নের পর বিবাহের কথা পাকাপোক্ত হলো। মুফতি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কজন আসতে চাচ্ছেন? আব্বা আদবের সাথে জবাব দেন, আপনারা যে কজনের অনুমতি দেবেন, আমরা সেই কজন মেহমান নিয়েই আসব। মুফতি সাহেব ৫০ জন পর্যন্ত অনুমতি প্রদান করেন। আলোচনার পর চূড়ান্তভাবে তারা প্রস্তাব কবুল করেন। ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় বিবাহের একটি দিন ধার্য হয়। স্থান ঠিক করা হয় জিরি মাদরাসায়।

নির্ধারিত দিনে আমাদের এদিক থেকে ৩০-৪০ জন মানুষ নিয়ে আমরা রওনা হই। একটু দূরের রাস্তা ছিল বিধায় লোকজন কমই নেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি অটো নেওয়া হয়েছিল আমার উসতাদদের জন্য। সেদিন বুধবার ছিল, এতটুকু মনে পড়ে আমার। আমাদের যেতে দেরি হওয়ায় জিরি মাদরাসায় জোহরের পরিবর্তে আসরের পর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মাওলানা উবায়দুর রহমান সাহেব মাওলানা জমিরুদ্দীন সাহেবের খলিফা ছিলেন। তিনিও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। পটিয়ার নায়েবে মুহতামিম ছিলেন। হাজি ইউনুস সাহেবের দায়িত্বপালনের সময় কিছুদিন সেখানে থাকার পর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন। উপস্থিত সকলের অনুরোধে তিনিই বিয়ে পড়ান।

ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করে নিজ বাড়িতে রেখে আমি করাচি চলে যাই। প্রায় চার বছর আমি উনাকে দেশেই রাখি। মাঝে দুইবার এসেছিলাম। কিন্তু ওখানে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তখনো হয়নি আমার। এরপর হঠাৎ জামশেদ রোডে অবস্থিত আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানির স্মৃতিবিজড়িত উসমানিয়া মসজিদে আমার ইমামতের ব্যবস্থা হয়ে যায়। সাথে থাকার জন্য একটি কোয়ার্টারের বন্দোবস্ত হয়। আমি দেশে চিঠি লিখে জানাই। আমার আহলিয়ার এক ভাই কারি রুহুল্লাহ তাকে করাচিতে আমার নিকট পৌঁছে দেন।

এখানে করাচিতে সময় ভালোই কাটল কিছুদিন। সেসময় আমি নায়েবে মুফতির পদে উন্নীত হই। এই পদে আসার পর থেকে বেশকিছু দীনদার মানুষ আমার মসজিদে এবং ফ্ল্যাটে মাসআলার জন্য দেখাসাক্ষাত শুরু করে। তাই মেহমানদারির জন্য আমাকে সবসময় তৈরি থাকতে হতো। কিছু না কিছু সবসময় কিনে রাখতাম। আবার আলিমগণও আসতেন অনেকে। আমার আহলিয়া ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে তাঁর কাঁধে মেহমানদারির দায়িত্ব এসে যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয়, তিনি খুবই আদুরে পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাদের বাসায় কয়েকজন কাজের মানুষ থাকায় তাকে কখনো ঘরোয়া কাজে হাত লাগাতে হয়নি। ফলে মেহমানদারির খেদমত আনজাম দেওয়ার অভ্যাস তাঁর তেমন ছিল না। এখানে এসে কিছুদিন

মেহমানদারির খেদমত আনজাম দিতেই তাঁর নাভিশ্বাস উঠে যায়। একটু-আধটু নারাজি প্রকাশ করতে থাকেন কথাবার্তায়। আমিও নিজের ভুল বুঝতে পারি। কিন্তু বিয়ে জীবনের এমন একটি অধ্যায় ও মোড়, যেখান থেকে ফিরে আসা সহজে সম্ভব না। ঘরোয়া কাজে আমি উনাকে যথাযথ সাহায্য করার একটা অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু আমারও যেহেতু অনেক ব্যস্ততা থাকত, তাই সাধ্যমতো তাঁকে সাহায্য করতে পারতাম না। ফলে বেচারীর উপর চাপবোধের অনুভব বাড়তে থাকে। একবার মাওলানা মুহিউদ্দীন খান[১১৮] আমার বাসায় বেড়াতে এলেন। আসলে বাংলাদেশ থেকে আলিমগণ করাচিতে এলে আমার বাসায় অবশ্যই আসতেন। এই দফা আমার আহলিয়া মেহমানদারি করতে অপারগতা দেখান। পরিস্থিতি সামলে নিলেও আমি খান সাহেবের কাছে কিছুটা বিব্রত হই সেদিন। এর কিছুদিন পর আহলিয়া আমাকে একজন কাজের আয়া রাখতে বলে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখি একজন আয়া পাকিস্তানে মাসিক তিন হাজার রুপি পারিশ্রমিক নেয়। তাও আবার ছুটা কাজের আয়া। যারা দিনভর কাজে সাহায্য করে তাদের বাজার তো আরো চড়া। আমার সেসময় মাসিক ভাতাই ছিল চার হাজার রুপি। ফলে আমার পক্ষে একজন আয়া নিয়োগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমি নিরুপায়ের মতো দিন কাটাতে থাকি। কিন্তু ধীরে ধীরে পারিবারিক শান্তি কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলে আমি দেশে চিঠি লিখে সবিস্তারে ঘটনা জানাই। আমার আব্বাজান ও শ্বশুর আব্বাজান

---

[১১৮]. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান একজন বাংলাদেশি সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ইসলামি চিন্তাবিদ, বহুগ্রন্থপ্রণেতা ও বিখ্যাত পত্রিকা মাসিক মদীনার সম্পাদক। মাওলানা ১৯৩৫ সালের ১৯ এপ্রিল কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার ছয়চির গ্রামে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার আনসার নগরে। পিতা বিশিষ্ট সাধক পুরুষ, প্রবীণ শিক্ষাবিদ মৌলভী হাকিম আনছার উদ্দীন খান, মাতা মোছাঃ রাবেয়া খাতুন। ২০১৬ সালের ২৫ জুন মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাসিক মদিনার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি মুফতি শফি রচিত মাআরিফুল কুরআনের বাংলা অনুবাদ করেছেন তিনি।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন। মাতার ইনতেকালের পর তিনি নানীর তত্ত্বাবধানে থাকায় নানাবাড়ির নিকটবর্তী তারাকান্দি মাদরাসায় ১৯৪৭ ঈসায়ীতে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানে মন বসাতে না পারায় তিনি দু'বছর পর আবার পাঁচবাগ মাদরাসায় ফিরে আসেন। পাঁচবাগ মাদরাসা থেকে ১৯৫১ সালে আলিম ও ১৯৫৩ সালে স্কলারশিপসহ ফাজিল পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৫৫ সালে হাদিস বিষয়ে কামিল ও ১৯৫৬ সালে ফিকহ বিষয়ে কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। আলিয়া ধারায় লেখাপড়া করলেও খান সাহেব কওমি ধারার সাথে বেশি সম্পর্ক রেখে চলতেন। ২০১৬ সালের ২৫ জুন তিনি ইনতেকাল করেন।

তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনের খেলাঘরে'। সম্প্রতি তাঁর আরেকটি ডকু-ফিকশনাল জীবনীগ্রন্থ বের হয়েছে নাশাত পাবলিকেশন থেকে 'কিংবদন্তির কথা বলছি' নামে। দুটি গ্রন্থই সুখপাঠ্য।

উভয়ের কাছে চিঠি লিখি। আহলিয়ার সাথেও পরামর্শ করি। জানতে চাই সে কী চাচ্ছে। উনি জানান 'আমার পক্ষে এত মেহমানের চাপ সামলানো সম্ভব না। আমাকে আপনি দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।' আমার এখানে কী হবে- এ নিয়ে তাঁর নিকট পরামর্শ চাইলে তিনি একটু ভেবে আমাকে 'বিকল্প' পথ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে দেন। আমি নিরানন্দ নিরাবেগে একমত হই। কিছুদিন পর তাকে রাখতে আমি সস্ত্রীক দেশে বেড়াতে আসি।

কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে আবারো কর্মস্থলে ফিরি। একাকিত্ব পেয়ে বসে বহুদিন পর। পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে কেউ যদি হঠাৎ করে একা হয়ে যায়, তখন তাঁর অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। এটা ভুক্তভোগী মাত্রই জানার কথা। আহলিয়া চলে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আম্মাকে একটি চিঠি লিখি। সেখানে আমার একাকিত্ব ও কঠিন জীবনের সামান্য বৃত্তান্ত তুলে ধরেছিলাম। চিঠির শেষের দিকে দ্বিতীয় বিয়ের কথা নিরুপায় হয়ে উল্লেখ করি। আম্মা ফিরতি চিঠিতে আমাকে একটু সবরের সাথে থাকার পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম বৌমার কী হবে- তাও জানতে চান। আমি জানাই, সে চাইলে থাকবে। আর যদি না চায় তা হলে সেটাও জানিয়ে দেবে। আমার পক্ষ থেকে তেমন দ্বিমত নেই কোনো বিষয়েই। আমি তাঁর দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। এরপর আম্মার চিঠি আসে। সেখানে আমাকে দেশে আসার কথা বলা হয়। ওদিকে আরেক চিঠিতে আমি শ্বশুরআব্বার ইনতেকালের খবর পাই। এই খবর আমাকে খুবই ভারাক্রান্ত করে। বিষণ্ণ মনে আহলিয়াকে সান্ত্বনা জানিয়ে চিঠি লিখি। খুব দ্রুত দেশে আসার কথাও জানাই সেখানে।

জীবনের প্রয়োজনে মাসনা

দেশে গিয়ে আহলিয়ার খোঁজখবর নিই। আমার প্রথমা পিতার ঘরে আদরের দুলালি ছিলেন। ফলে তার জন্য ঘরের কাজবাজ করা বেশ কষ্টকর মনে হতো। আসলে কারও অভ্যাসের বিপরীতে তাকে জোর করা অনুচিত। আমার আহলিয়ার এই দিকটিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথেই গ্রহণ করেছিলাম। তবে জীবনের চাকাও তো সামনে এগিয়ে নিতে হবে। আমাদের পৃথিবীটা এমনই। অত্যন্ত গতিশীল এর প্রবাহ। এখানে স্থবিরতা মানে মৃত্যু। ওদিকে আমার ছোটভাই মাস্টার আবুল কাশেমের তখনো বিবাহ হয়নি। সে তখন জিরিতে চাকুরিরত ছিল। সব মিলিয়ে ঘরসংসার সামলাতে আমার আব্বা-আম্মার একটু চাপবোধ হচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে আমি আমার চাচা ও উসতাদ দলিলুর রহমান সাহেব ও মাওলানা আহমদ হাসান সাহেবের সাথে দেখা করি। উনারা আমাকে দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে ফিকির করতে পরামর্শ দেন।

এমতাবস্থায় আমি উনাদের সহযোগিতা চেয়ে বসি। খোঁজখবর করে তারা এক খান্দানের সাথে যোগাযোগ করেন। এখানে একজন পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই খান্দান হলো শফিক সাহেবের খান্দান। তার কাছে আমাদের খান্দানের অনেকেই মুরিদ ছিলেন। মাওলানা শফিক সাহেব ছিলেন মাওলানা মুখলিসুর রহমান সাহেবের খলিফা। উনার নাতিন হলেন আলোচ্য পাত্রী। আমি চাচার উপর ভরসা করে প্রস্তাব দিয়ে ফেলি। উনারা শুনতে পেয়ে জানান, মুফতি সাহেবের মেয়ে বিয়েতে থাকাবস্থায় আপনি আবার বিয়ে করবেন! এটা কেমন দেখাবে না![১১৯] আবার আমাদের সাথেও মুফতি সাহেবের উসতাদ-শাগরেদের সম্পর্ক আছে। আমি এসব প্রশ্নের জবাবে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে বলি, দেখুন! আমি মধ্যবয়স পেরিয়ে যাচ্ছি। সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিগত কারণ ও আমার আহলিয়ার কিছু জায়েজ ও শরয়ি ওজরের কারণেই আমাকে দ্বিতীয় বিয়ের পথে হাঁটতে হচ্ছে। ইসলামে তো অজুহাত ছাড়াই একাধিক বিয়ের অনুমতি আছে। আপনারা যদি আমার প্রথম আহলিয়ার উপস্থিতিতেই আপনাদের মেয়ে আমার হাতে তুলে দিতে চান, তাহলে কথা এগোনো যায়।

আমার জবাব পেয়ে তারা আশ্বস্ত হয়ে বিয়েতে মত দেন। আমিও আত্মীয়স্বজন নিয়ে বিয়ে করে ফেলি। এ সময় আমার বড় আহলিয়া তাঁর বাসাতেই ছিলেন। তারও যেহেতু অনুমতি ছিল, সেজন্য তাঁর পরিবারও আমাকে আর কিছু বলেনি। মূলত আমার আহলিয়া বুঝতেন—আমার ওখানে একজন সাথি প্রয়োজন, যিনি আমাকে জীবনের নানাক্ষেত্রে সাহায্য করবেন। এইক্ষেত্রে উনি উনার অভ্যাসগত অপারগতা বুঝতে পেরেই আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। এটা আমার প্রতি তাঁর গভীর ও নিখাদ ভালোবাসার একটি ক্ষুদ্র বহিঃপ্রকাশ। জাযাহাল্লাহ!

বিয়ের পর দ্বিতীয়াকে নিয়ে রওনা দিই। সাথে তাঁর এক চাচাও গেলেন। তিনি সেখানেই এক মসজিদে খেদমতে ছিলেন। এভাবে আমার করাচির বাকি জীবন কেটে যায়।

ছেলেমেয়ে

আমাকে দুপক্ষ মিলিয়ে মোট এগারো ছেলেমেয়ে আল্লাহ পাক দিয়েছেন। প্রথমপক্ষে পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। দ্বিতীয়পক্ষে দুই ছেলে দুই মেয়ে। এদের মধ্যে ছয়জন

---

[১১৯]. মুফতি সাহেবের প্রথম আহলিয়ার বংশধারা অত্যন্ত উঁচু। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যরা একটু ইতস্তত করছিলেন। তা নাহলে একাধিক বিবাহতে অবাক হবার তো কিছু নেই।

হাফেজে কুরআন, একইসাথে আলিমে দীন। ছোটটি হাফিজ। এখন আলিম হবার পথে হাঁটছে। বড় বেগম আমার সাথে হাটহাজারির কোয়ার্টারেই থাকেন। ছোট বেগম শাহমিরপুরে থাকেন। কর্মব্যস্ততার মাঝেও অবসর বের করে সবাইকেই সময় দেওয়ার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ। আগে তো দুই বেগম এক সাথেই থাকতেন। এখন বড় বেগম এখানে এসেছেন। আপনাদের কাছে দোয়া চাই যেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইনসাফ বজায় রেখে চলার তাওফিক দান করেন।

দীনি প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত রূপায়ণ

অনেকেই জানতে চান, বর্তমান সময়ের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে? এমন কোনো প্রতিষ্ঠান কি আপনার নজরে আছে, যাকে উপমহাদেশীয় মহলে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে? তাদের উদ্দেশে আদর্শ দীনি প্রতিষ্ঠানের নমুনা নিয়ে কিছু কথা।

আলহামদুলিল্লাহ! দীন তো কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। সেজন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ দীনি ইলম হেফাজত প্রকল্প। আলিমদের এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে দীনি শিক্ষার মৌলিক পন্থা অক্ষুণ্ণ রেখে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। আমাদের উপমহাদেশের প্রেক্ষাপট বিচার করে যদি বলি, এই যুগে দারুল উলুম দেওবন্দের নিসবতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরিটাউন করাচি, পাকিস্তান আমার দৃষ্টিতে একটি আদর্শ নমুনা হতে পারে। হজরত আল্লামা ইউসুফ বানুরি ইলমকে তলাবাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে যেভাবে জীবনভর চিন্তাভাবনা করে গেছেন, তারই ফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখুন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক স্তম্ভ দুটি। একটি শিক্ষক এবং অপরটি ছাত্র। এই দুই প্রজন্ম ও জামাতকে যদি আপনি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন, তাহলে সেই শাস্ত্র উন্নতি করবেই। বানুরি সাহেব তার জামিয়াকে ঠিক এভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য সেই আশির দশকে এত উন্নত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল, যা তৎকালীন উপমহাদেশে কোনো সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানও কল্পনা করতে পারত না। সকল শিক্ষকের জন্য এক ও অভিন্ন সুবিধা, পৃথক কামরা, দেখভালের জন্য পৃথক লোকজন—এ ধরনের অসাধারণ সব ব্যবস্থা তিনি রেখেছিলেন জামিয়াতে। ছাত্রভাইদের ক্ষেত্রেও একই কথা। এখনকার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেমন ব্যবস্থা থাকে, জামিয়াতে ঠিক এমনই ব্যবস্থা ছিল সেই সময়। প্রত্যেক ছাত্রভাই যেন নির্বিঘ্নে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য নিজে

গিয়ে গিয়ে খোঁজখবর নিতেন। ছাত্রাবাসের প্রতিটি কামরার সামনে গ্যাসচুলার ব্যবস্থা, সকালে কামরায় গিয়ে গিয়ে নাশতা পৌঁছানো, প্রতিদিন আমিষের ব্যবস্থা করা, মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বহুবিধ সুবিধা ছাত্রভাইয়েরা পেয়ে থাকতেন। আপনি শুনে অবাক হবেন, ছাত্র ভাইদেরকে প্রত্যেক ঈদে দুই সেট করে জামাও হাদিয়া দেওয়া হতো। সুবহানাল্লাহ!

আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিউটাউন

বানুরি সাহেবের এইরকম ব্যবস্থাপনার কারণে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছিল জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরিটাউন। সবচেয়ে বড় যে সুবিধা ছাত্রভাইয়েরা ভোগ করতেন সেটি হলো, তাদের কোনো ধরনের চাঁদা, মাসিক বেতন, ভর্তি বাবদ বিরাট অংকের ফি এবং বার্ষিক কোনো অনুদান মাদরাসায় দিতে হতো না। এই অসাধারণ সুবিধার কারণে পাকিস্তান এবং বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্রভাইয়েরা বানুরিটাউনে—সে খুব ধনী হোক বা নিতান্তই গরিব—দীন শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতেন। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, ছাত্রভাইয়েরা যদি কোনো বেতন না-ই দিতেন তাহলে মাদরাসা কীভাবে পরিচালিত হতো? আর্থিক বিষয়গুলো কীভাবে সমাধান করা হতো? এইক্ষেত্রে মাদরাসা তার বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক আমদানির ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। যেমন ধরুন মাদরাসার বাইরে বেশকিছু ফাঁকা জায়গায় দোকানপাট করে দেওয়া হয়েছিল। এখন তো সেসব মার্কেট হয়ে গেছে। যার ফলে সেখান থেকে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় মাদরাসায় এসে যেত। আবার কুরবানি ঈদের সময় প্রচুর পরিমাণ পশুর চামড়া কোনো ধরনের বিনিময়মূল্য ছাড়াই শুভাকাঙ্ক্ষীরা মাদরাসায় দিয়ে যেতেন। এই মৌসুমে মাদরাসা তার বার্ষিক আয়ের একটি বড় অংক পেয়ে যেত। সে-সময় পাকিস্তানে প্রতিটি চামড়ার মূল্য ছিল প্রায় ১৫০-৩০০ রুপি। নিউটাউনের মতো বড় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবছর ১০০০০-১২০০০ চামড়া পেত। এ ছাড়াও ভূ-রাজনৈতিক কারণে সৌদি আরব, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের ভালো সম্পর্ক ছিল। ফলে বিদেশে যারা নিউটাউনের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, তারা নিজ দায়িত্বে মাদরাসায় তাদের বার্ষিক অনুদান পাঠিয়ে দিতেন। এভাবেই মাদরাসা তার পরিচালনার বিশাল অঙ্কের ব্যয়ভার আল্লাহর অশেষ রহমতে আয় করতে সক্ষম

হতো। এই সকল বিষয় সামনে রেখেই আমি বলতে চাই, উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে দীনি মাদরাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরিটাউন হতে পারে একটি আদর্শ পরিচালনা-পদ্ধতির নমুনা।

দুঃজনক বাস্তবতা

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের বাংলাদেশে দীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রভাইয়েরা এই ধরনের সুবিধা ভোগ করেন না। উলটো তাদের থেকে মাসিক, ষাণ্মসিক, বাৎসরিক এবং পরীক্ষার ফি বাবদ নানা ধরনের চাঁদা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার মতে জুলুমের শামিল। কুরবানির মৌসুমেও পশুর চামড়া গ্রহণের যে পদ্ধতি এখানে চালু রয়েছে, সেটিও অত্যন্ত অপমানজনক বলে মনে করি। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে এই চামড়া গ্রহণ কীভাবে হয়ে থাকে তা আমি পূর্বে কোনো এক সময় বলেছিলাম। আমি জানি না দেওবন্দিধারার প্রতিষ্ঠান হয়েও আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা কীভাবে এরকম অপমানজনক পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন।

উসতাদবৃন্দের কথা যদি বলি, সেখানেও একই কথা বলতে হয়। আমি তো অনেক পরে দেশে এসেছি; কিন্তু তবু এ বিষয়গুলো আমার নজরে পড়েছে। অনেক উসতাদকে আমি দেখেছি, যারা মাসের-পর-মাস বিনা বেতনে মাদরাসায় খেদমত করে গেছেন। ওদিকে ভাড়া বাসায় পরিবারকে রাখার কারণে তাকে গুনতে হয়েছে একগাদা খরচের বোঝা। আমি তো এমনও ঘটনা দেখেছি যে, মাদরাসার প্রয়োজনে শিক্ষকরা নিজের জমি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছেন। যদিও এটি লিল্লাহিয়াতের একটি অনুপম উদাহরণ; কিন্তু অনেক সময় এগুলো উসতাদের উপর জুলুম হিসেবেও লক্ষ্য করেছি। দেখুন, আমি প্রথমেই বলেছি, আদর্শ প্রতিষ্ঠানের মৌলিক স্তম্ভ দুটি। শিক্ষক এবং ছাত্র। এই দুই জামাতকে যদি সঠিকভাবে পর্যাপ্ত সুবিধা দিয়ে পরিচালনা করতে না পারা যায়, তাহলে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কখনোই আপনি নিজেকে দাঁড় করাতে পারবেন না। এজন্য আপনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখবেন, ছাত্রভাইয়েরা নানাধরনের নিম্নরুচির খেদমত আনজাম দেওয়ার কারণে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে থাকেন। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই কথা। মাদরাসার প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফাসিক, ফাজির এবং স্পষ্ট কবিরা গুনাহে লিপ্ত মানুষদের থেকে তোষামোদের

হতো। এই সকল বিষয় সামনে রেখেই আমি বলতে চাই, উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে দীনি মাদরাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরিটাউন হতে পারে একটি আদর্শ পরিচালনা-পদ্ধতির নমুনা।

দুঃজনক বাস্তবতা

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের বাংলাদেশে দীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রভাইয়েরা এই ধরনের সুবিধা ভোগ করেন না। উলটো তাদের থেকে মাসিক, ষাণ্মসিক, বাৎসরিক এবং পরীক্ষার ফি বাবদ নানা ধরনের চাঁদা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার মতে জুলুমের শামিল। কুরবানির মৌসুমেও পশুর চামড়া গ্রহণের যে পদ্ধতি এখানে চালু রয়েছে, সেটিও অত্যন্ত অপমানজনক বলে মনে করি। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে এই চামড়া গ্রহণ কীভাবে হয়ে থাকে তা আমি পূর্বে কোনো এক সময় বলেছিলাম। আমি জানি না দেওবন্দিধারার প্রতিষ্ঠান হয়েও আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা কীভাবে এরকম অপমানজনক পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন।

উসতাদবৃন্দের কথা যদি বলি, সেখানেও একই কথা বলতে হয়। আমি তো অনেক পরে দেশে এসেছি; কিন্তু তবু এ বিষয়গুলো আমার নজরে পড়েছে। অনেক উসতাদকে আমি দেখেছি, যারা মাসের-পর-মাস বিনা বেতনে মাদরাসায় খেদমত করে গেছেন। ওদিকে ভাড়া বাসায় পরিবারকে রাখার কারণে তাকে গুনতে হয়েছে একগাদা খরচের বোঝা। আমি তো এমনও ঘটনা দেখেছি যে, মাদরাসার প্রয়োজনে শিক্ষকরা নিজের জমি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছেন। যদিও এটি লিল্লাহিয়াতের একটি অনুপম উদাহরণ; কিন্তু অনেক সময় এগুলো উসতাদের উপর জুলুম হিসেবেও লক্ষ্য করেছি। দেখুন, আমি প্রথমেই বলেছি, আদর্শ প্রতিষ্ঠানের মৌলিক স্তম্ভ দুটি। শিক্ষক এবং ছাত্র। এই দুই জামাতকে যদি সঠিকভাবে পর্যাপ্ত সুবিধা দিয়ে পরিচালনা করতে না পারা যায়, তাহলে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কখনোই আপনি নিজেকে দাঁড় করাতে পারবেন না। এজন্য আপনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখবেন, ছাত্রভাইয়েরা নানাধরনের নিম্নরুচির খেদমত আনজাম দেওয়ার কারণে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে থাকেন। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই কথা। মাদরাসার প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফাসিক, ফাজির এবং স্পষ্ট কবিরা গুনাহে লিপ্ত মানুষদের থেকে তোষামোদের

মাধ্যমে চাঁদা আদায়ের কারণে তলাবায়ে কেরাম সমাজে হীনম্মন্য হয়ে চলাফেরা করেন। আপনি যদি আদর্শ প্রতিষ্ঠানের প্রধান এই দুই স্তম্ভকে নিজেদের কাছে হীনম্মন্য করে দেন, তাহলে তারা কখনোই সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে ও কথা বলতে পারবে না। ঠিক এই চিত্রটিই আমি গত ২০ বছর ধরে আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে দেখে আসছি, যা গত চল্লিশ বছরে আমি কখনোই হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে লক্ষ্য করিনি।

বাণিজ্যিক হিফজ বিভাগ

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে আরো এক ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যারা মাসে অনধিক পাঁচ হাজার থেকে শুরু করে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক ফি গ্রহণ করে থাকেন। এদের বেশিরভাগই ব্যবসায়িক মানসিকতা রাখে। কিছু কিছু কিতাবখানাও রয়েছে এমন। এই ধরনের মাদরাসাগুলোর ব্যাপারে আমার মূল্যায়ন...।[১২০]

এটিকে আমি মাদরাসা বা দীনি প্রতিষ্ঠান বলতে পারছি না। এগুলো একধরনের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, যারা মুনাফার বিনিময়ে সেবা প্রদান করছেন। ব্যবসার কারণে তাদের বরকত হতে পারে কিন্তু লিল্লাহিয়াত বা আল্লাহর জন্য সেবা করার যে সওয়াব, সেসব তারা পাবেন বলে আমি মনে করি না। হ্যাঁ, ব্যয়বহুল শহরগুলোতে শিক্ষকদের মাসিক বেতন, তাদের থাকা-খাওয়া এবং মাদরাসা পরিচালনার জন্য হয়তো কিছু পরিমাণ মাসিক ফি গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে বেঁচে যাওয়া লভ্যাংশ মাদরাসা পরিচালনা কমিটি বা পরিচালকের পকেটে চলে যাবে, এটি কখনোই দীনি প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। বাংলাদেশের মতো নিম্নআয়ের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এই ধরনের মাসিক ফি এবং সেটি দীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করা অত্যন্ত জুলুমি একটি কার্যক্রম বলে আমি মনে করি। আমি এতটুকু বলতে পারি, এই ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের ছাত্রদের যে ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে, বানুরিটাউন এর চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা প্রদান করে থাকে। আমাদের সময়ে প্রত্যেক জামাতের ছাত্রভাইদের মাদরাসার তরফ থেকে খানার

---

[১২০]. দ্বিমতকে পরামর্শমূলক সমালোচনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

সুব্যবস্থার পাশাপাশি মাসিক ভাতাও প্রদান করা হতো। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটি দেওয়া হতো বিনামূল্যে। আর এই বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আল্লাহর জন্য দীনের খেদমত করার উজ্জ্বল নমুনা।

তারবিয়া : আদর্শ প্রতিষ্ঠানের অবশ্য-বৈশিষ্ট্য

(একটু আদর্শ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ব্যাপারে কিছু কথা)।

এ ব্যাপারেও আমি বলব যে, উপমহাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরিটাউনকে অনুসরণ করতে পারে। দেখুন সেখানে এমন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যে, প্রত্যেক ছাত্র তার মেধাবিকাশের পাশাপাশি আত্মিকভাবে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। প্রতি সপ্তাহে ছাত্রভাইদের উদ্দেশে ইসলাহি মজলিস বা আত্মশুদ্ধির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেখানে যোগ্য এবং অভিজ্ঞ উসতাদবৃন্দ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনকে ইসলামি ধাঁচে গড়ে তোলার জন্য সকল উপযোগী পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে মজলিসে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে ছাত্রভাইদের স্বাধীনতা থাকে। কেউ চাইলে অংশ নিতেও পারে; কেউ চাইলে সেই সময়টি ব্যক্তিগত অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যয় করতে পারে। তবে যারা এই ধরনের মজলিসে অংশগ্রহণ করে, আমার দেখা প্রত্যেকেই পরবর্তী সময়ে খুবই ভালো মানের আলিম এবং সুনিপুণভাবে আত্মশুদ্ধির পথে মানুষকে পরিচালনায় সক্ষম হয়েছেন। তাই আমি মনে করি, ছাত্রভাইদের উচিত স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের মজলিসে স্বেচ্ছায় অংশ নিয়ে নিজেকে এবং পাশাপাশি উম্মতের অন্যান্য সদস্যের আত্মশুদ্ধির পথে সহযোগিতা করা।

পাকিস্তানে থাকাকালীন আমি এই ব্যাপারটিও খুব ভালোভাবে লক্ষ করে দেখেছি, আল্লামা বানুরি ভারত-পাকিস্তানসহ বিশ্বের তৎকালীন বড় বড় আলিমদের কখনো না কখনো তার প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাদের সান্নিধ্যের মাধ্যমে ছাত্রভাইদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। হিন্দুস্থানি সকল আলিম সেই যুগে হেজাজভূমিতে সফরের সময় বানুরিটাউনে দুদিন অথবা নিদেনপক্ষে একদিন অপেক্ষা করতেন। সেই সুবাদে হিন্দুস্থানি প্রায় সকল আকাবির আলিমের সাক্ষাত, তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ এবং তাদের নিকট থেকে হাদিসের সনদ গ্রহণ ছাত্রদের জন্য খুবই সহজ ছিল। খোদ আমার কাছেই এমন কিছু বিরল সনদ রয়েছে, যা শুধু সফররত আলিম এবং মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে আমি লাভ করেছি। এই সনদগুলোর মান এত উঁচু ছিল যে, সামসময়িক উপমহাদেশীয় সকল প্রতিষ্ঠানেও

এত উঁচু সনদ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আত্মশুদ্ধির পথে সবচেয়ে উঁচু এবং বরকতময় সনদটি আমি সফররত একজন শায়েখের মাধ্যমেই অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

আর অভ্যন্তরীণ পরিবেশের কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলব, নিউটাউনে ছাত্রভাইদের আবাসিক থাকাকালীন যেভাবে নেগরানি করা হতো, তা সত্যিই বিরল এবং অতুলনীয়। একজন সুযোগ্য উসতাদ দারুল ইকামার অর্থাৎ আবাসিক ভবনগুলোর দায়িত্বে থাকতেন। এই হজরত আবাসিক থাকাকালীন সময়ে ছাত্রভাইদের উপর পূর্ণ ইসলাহি নজর রাখতেন। সময়মতো তাদের নামাজে পাঠানো, তাহাজ্জুদের সময় জাগিয়ে তোলা, পারস্পরিক ছোটখাটো মনোমালিন্য বা বিবাদে মধ্যস্থতা করে দেওয়া এগুলো ছিল তাদের দৈনন্দিন সময় অতিবাহিত করার একটি স্বাভাবিক রুটিন। ক্লাসে শিখে আসা জীবনদর্শনকে তারা উসতাদের আচরণের মাধ্যমে শিখে নিতেন সম্পূর্ণ প্রায়োগিকভাবে। দীর্ঘদিন এভাবে সুযোগ্য উসতাদের সান্নিধ্যে থাকার ফলে ছাত্রভাইদের মধ্যেও ইসলামি আখলাক ফুটে উঠত। একটি বিষয় এখানে বলে রাখি, দায়িত্বরত উসতাদ যিনি ক্লাস গ্রহণের পাশাপাশি আবাসিক ভবনেও ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করতেন, তাকে মাসে অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট ভাতা প্রদান করা হতো। এতে করে সেই উসতাদের জন্য দায়িত্ব পালন করা সহজ হতো। এই ধরনের নমুনা সত্যিই বিরল।

কওমি সনদ : প্রত্যাশা, বাস্তবতা ও লক্ষ্যমাত্রা

এখন আমি স্পর্শকাতর এবং সম্ভাবনাময়ী একটি বিষয় আপনার সামনে উপস্থাপন করছি :

সাম্প্রতিককালে আপনারা জেনে থাকবেন, বাংলাদেশের কওমি অঙ্গনে যে শিক্ষাধারা দীর্ঘকাল ধরে পরিচালিত করে এসেছিল, তার একটি সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আমাদের দাওরায়ে হাদিসের শিক্ষাকে এবং সনদকে তার স্বকীয়তা সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে হাইয়াতুল উলইয়া বোর্ডের অধীনে একে সরকারিভাবে 'মাস্টার্স' সমমানে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু একই সাথে একটি দুঃখজনক বিষয় হলো, দাওরায়ে হাদিসের পূর্বে অন্য কোনো নির্দিষ্ট ক্লাসকে অনার্স এবং তার পূর্বাপর অন্যান্য ক্লাসকে ইন্টারমিডিয়েট এবং এসএসসি হিসেবে উন্নীত করা হয়নি। ফলে ওয়ানস্টপ মাস্টার্স অর্থাৎ একেবারে সরাসরি মাস্টার্স সনদ শিক্ষার্থীরা গত দু'বছর ধরে পেয়ে আসছে, সাধারণ শিক্ষিত মহলে যা অত্যন্ত

সমালোচনাযোগ্য এবং কোথাও কোথাও হাসির খোরাকের ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। আমরা বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে শুনেছি, তারা ভারত এবং পাকিস্তানের শিক্ষানীতি অনুসরণ করেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমি যেহেতু সুদীর্ঘ কয়েক দশক পাকিস্তানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলাম, তাই এই প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করে থাকে যে, আপনার কাছে বিশেষভাবে জানতে চাই, সত্যিই পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানকে অনুসরণ করেই এই পথে এগুনো হয়েছে নাকি এই দাবির বাস্তবতার পেছনে কোথাও কোনো ফাঁকফোকর রয়েছে? আপনার সুচিন্তিত এবং মূল্যবান মতামত দিয়ে জাতিকে উপকৃত করবেন।

এই ধরনের প্রশ্নগুলোর জবাবে আমার সংক্ষিপ্ত ভাবনা তুলে ধরলাম।

পাকিস্তানে সরকারি সনদ

বাংলাদেশের কওমি অঙ্গনকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি মনে করি সরকার এই সনদটি প্রদান করেছে। আর খুব তড়িঘড়ি করেই তা করেছে। যার কারণে তাদেরকে এই ধরনের হাস্যকর ওয়ানস্টপ মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করতে হয়েছে। আমার জানামতে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানে এই ধরনের কোনো মাস্টার্স সনদ ধর্মীয় শিক্ষিতদের দেওয়া হয় না। বরং ধাপে ধাপে পরীক্ষার মাধ্যমে একে একে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর এভাবে নানা ধাপ ও পর্যায়ে সনদ প্রদান করা হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে, পাকিস্তানে সাধারণ শিক্ষা বোর্ড এবং ধর্মীয় শিক্ষা বোর্ড, যাকে আপনারা বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান নামে জানেন; এই দুই বোর্ডের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা চুক্তি[১২১] বহু বছর পূর্বেই স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই ধরনের চুক্তিকে আরবিতে মুয়াদালা এবং ইংরেজিতে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলা হয়। সেখানে দু'পক্ষই বেশ কিছু শর্তসাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে একমত হয়ে থাকে। পাকিস্তানে বেফাক বোর্ডে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমমানের ধাপ তৈরির লক্ষ্যে বেশকিছু ক্লাসে নানা মেয়াদের পরীক্ষা নেওয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ কাফিয়া জামাতকে মাধ্যমিক, হিদায়া জামাতকে উচ্চমাধ্যমিক এবং দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষাকে স্নাতকের সমমান ধরে বোর্ডের সাথে চুক্তি করা ছিল। একজন তালিবে ইলম ভাই যদি দাওরায়ে হাদিস পাশ করার পরে সাধারণ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি নিতে চান, তাহলে তাকে আরো কিছু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। এরপর তিনি বেশ কয়েকটি অতিরিক্ত পরীক্ষায় অংশ

---

[১২১]. MOU বা Memorendum Of Understanding বলা হয়। এটি একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।

নিয়ে অনার্স এবং তৎপরবর্তী সময়ে আরো কিছু অতিরিক্ত পরীক্ষা দিয়ে মাস্টার্স সনদ অর্জন করতে পারবেন। মজার ব্যাপার হলো, এই পরীক্ষাগুলোতে দাওরায়ে হাদিস পাস করে আসা ভাইয়েরাই বেশি নম্বর পেয়ে থাকতেন। আল্লামা তাকি উসমানি থেকে শুরু করে আল্লামা খালিদ মাহমুদ সাহেব এ ধরনের উভয় মাধ্যমে শিক্ষিত আল্লামাগণ এভাবেই দুই মাধ্যমে সনদ অর্জন করেছেন। এই সনদ অর্জনের পর তারা চাইলে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে যেকোনো ধরনের চাকুরি এবং পদগ্রহণের জন্য পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত হতে পারেন। এভাবে সরকারি চাকুরি বা উচ্চ পদে আসীন হবার জন্য অনেকেই পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। আল্লামা তাকি উসমানি, আল্লামা খালিদ মাহমুদসহ বহু আলিম নিজেদের যোগ্যতা ও তীক্ষ্ণ মেধা প্রয়োগের ফলে এভাবেই সরকারি উচ্চপদে আসীন হয়েছেন।

হিন্দুস্থানের বাস্তবতা

হিন্দুস্থানের ক্ষেত্রেও যতটুকু জানা আছে সেই ধারণা থেকে বলতে পারি, হিন্দুস্থানের কোনো প্রতিষ্ঠান দাওরায়ে হাদিসের সাথে স্নাতকের সমমান আজ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি। বরং দাওরায়ে হাদিসকে হায়দারাবাদ এবং কাশ্মিরের কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড উচ্চমাধ্যমিকের সম্মান দিয়ে থাকে। অর্থাৎ এই দুই প্রদেশে যদি কোনো তালিবে ইলম ভাই দাওরায়ে হাদিসের সনদ দিয়ে স্নাতকে ভর্তি হতে চান, তাহলে তাকে আরো কিছু বিষয়ে পড়াশোনা করে ভর্তিপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের কোথাও এক লাফে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর সমমান সাধারণ শিক্ষাবোর্ড প্রদান করেনি। আমি জানি না আমাদের দেশের আকাবির ও উচ্চপদস্থ নীতিনির্ধারকরা কোন বিষয়টি সামনে রেখে এভাবে এক লাফে ওয়ানস্টপ মাস্টার্স সনদ গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলেন। আর এভাবে সনদ গ্রহণের মাধ্যমে কতটুকু কাঙ্ক্ষিত সুবিধা অর্জন সম্ভব তাও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় বোধগম্য নয়। হাইয়াতুল উলইয়ার একজন তালিবে ইলম ভাই এই সনদ ব্যবহার করে কি সরকারি চাকরি গ্রহণ করতে পারবেন অথবা দেশে এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারবেন? যদি এসবের উত্তর 'না' হয়, তাহলে শুধু সনদ গ্রহণের যৌক্তিকতা কতটুকু এবং এভাবে সরকারি পরিচালনার আওতায় এসে যাওয়ায় আকিদা-বিশ্বাস ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা কতটুকু, তা বোধহয় এখন সকলেই একটু হলেও বুঝতে পারছেন। আমি সবসময়ই ছাত্রভাইদের সবধরনের সুযোগ-সুবিধার পক্ষে থাকা মানুষ এবং আমি আশাকরি, অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারি মাস্টার্স সনদের মাধ্যমে ছাত্রভাইয়েরা দেশে এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষার

পাশাপাশি দেশ ও জাতির নানামুখী সেবাপ্রদানে সক্ষম হবেন। কিন্তু দুঃখ ও আশঙ্কার বিষয় হলো, এভাবে এক ধাপে মাস্টার্স সনদ দেওয়াতে ছাত্রভাইদের যদি কোনো উপকারই না হয় এবং তারা কোনো সুবিধা গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে শুধু শুধু কওমি অঙ্গনের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করে একে সরকারিকরণের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কী ফায়দা হতে পারে?

নিম্নমানের কিছু সুবিধা

হ্যাঁ! এই সনদের মাধ্যমে দু-একটি নিম্নমানের সুবিধা আমার নজরে পড়ছে, যা কখনোই দেওবন্দি চিন্তাধারায় এবং কওমি অঙ্গনে কাম্য ছিল না। প্রথমত এই সনদের মাধ্যমে বাংলাদেশের 'শিক্ষিত' মহলে কওমি শিক্ষিতরা একটি শিক্ষিত শ্রেণির মর্যাদা পেয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত তো কওমি শিক্ষিতদের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় শিক্ষিতশ্রেণি হিসেবে গণ্য করতেন না। আশাকরি এখন থেকে রাজনৈতিক আলোচনাসভা এবং টিভি টকশোগুলোতে আলিমদের পাশে সহাবস্থান করে তারা নাক সিটকাবেন না। দ্বিতীয়ত, এই সনদের মাধ্যমে কওমি শিক্ষিত ভাইয়েরা হয়তোবা প্রাইমারি স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল এবং আলিয়া মাদরাসাতে চাকুরি করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু এই ধরনের সুবিধা গ্রহণের কোনো ইচ্ছা বা লক্ষ্য কখনোই কোনো কওমি ছাত্রভাইয়ের থাকে না।

আমার ধারণা, আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কওমি সনদ প্রদানের মাধ্যমে হয়তো কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চেয়েছেন। আমার জানামতে উনি এই সনদ প্রদানের পূর্বে দেশের বিজ্ঞ আলিমদের সাথে পরামর্শ করেননি। হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানে এই সনদ কীভাবে মূল্যায়িত হয় এবং হয়ে আসছে, সেই ইতিহাসও সম্ভবত তার সামনে নেই। তা নাহলে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে এমন একটি নমুনা সামনে রেখে কীভাবে 'হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের অনুকরণে' বাংলাদেশে তারা সনদ প্রদান করলেন, যেখানে এই দুই সনদপ্রদান এবং মূল্যায়নের মাঝে ন্যূনতম কোনো সাযুজ্য নেই! আপনি একবার ভাবুন, পাকিস্তানে বেফাক বোর্ড থেকে যদি কেউ হিদায়া পাশ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নেয় তাহলে সে সাধারণ বোর্ড থেকে একটি অথবা দুটি পরীক্ষা দিয়েই ইন্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণ হবার সনদ গ্রহণ করতে পারবেন। আবার কোনো ভাই যদি মিশকাত পাশ করে সাধারণ শিক্ষাবোর্ড থেকে সনদ নিতে চান তাহলে একই পদ্ধতিতে তিনি বিএ পাশের সনদ নিতে পারবেন। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি সবাই তো দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত যেতে পারে না; তখন ছুটে যাওয়া অথবা একটি বিশেষ মারহালা পর্যন্ত

পড়াশোনার পর সেই ছাত্রভাই দীনের ইলম হাসিল করার পাশাপাশি দুনিয়াবি দিক থেকেও তার একটি সামাজিক মর্যাদা তৈরি হয়। আমাদের আলোচ্য ওয়ানস্টপ মাস্টার্স সনদ অনুযায়ী এই ধরনের কোনো সুযোগ বাংলাদেশের কওমি ছাত্রসমাজের জন্য রাখা হয়নি। আর আমার ধারণা আলিমদেরও হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের বেফাকুল মাদারিসের সঠিক ইতিহাস খুব কমই জানা আছে। অথবা জানা থাকলেও তাদেরকে সেই মডেল উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। অনেকটা একতরফাভাবে সরকারি ইচ্ছাতেই এই সনদ দেওয়া হলো। এর দ্বারা আমাদের তরুণ আলিম ভাইয়েরা কোনো সুযোগ পাবেন কি না তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না; কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সরকারি ইমাম, সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল এবং সরকারি মাদরাসা শিক্ষক হিসেবে আলিমগণ তাদের সুদীর্ঘ স্বর্ণালি ঐতিহ্য অনুযায়ী হককথা ও অপ্রিয় সত্যগুলো, কঠোর ও জালিম শক্তির সামনে আগের মতো বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বলতে পারবেন না। যদি পরিস্থিতি এমনই হয়, তাহলে একটি অপূরণীয় সামাজিক ও জাতীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের আগামীদিনের ধর্মীয় পরিবেশ। একইসাথে নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক অবস্থান হারাতে বসবেন শ্রদ্ধেয় আলিমসমাজ! আমি আজও বিশ্বাস করি, বাহ্যিক এবং সুনিশ্চিত দীনি ও দুনিয়াবি ফায়দা না থাকলে অদূর ভবিষ্যতে দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ আলিমদের জামাত এই সনদ বর্জন করবেন এবং তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী মূলধারা সমুন্নত রেখে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ও সময়ের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় দুনিয়াবি শিক্ষা ও কর্মপন্থা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : একটি অনন্য প্রস্তাব

এখানে আরেকটি বিষয় প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছি। অনেকেই বলে থাকেন, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন মতবাদের যে ফিতনা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছে যেমন সেক্যুলারিজম, কমিউনিজম, সোশ্যালিজম, গণতন্ত্র, নাস্তিক্যবাদ (অ্যাথিইজম-Atheism) ইত্যাদি, এগুলোর ব্যাপারে মৌলিক এবং গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য হলেও ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কওমি সিলেবাসে যদি ইংরেজি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে কীভাবে তারা মারাত্মক ঈমানবিধ্বংসী ফিতনার মোকাবেলা এবং জবাব দেবেন?

দেখুন ক্লাসে সবাই এক নম্বর ছাত্র হতে পারে না। সেক্ষেত্রে মেধাক্রম অনুযায়ী সিরিয়াল তৈরি করা হয়ে থাকে। যেহেতু এই ফিতনাগুলো অত্যন্ত সুদূরপ্রসারি এবং ধ্বংসাত্মক আর এগুলোর জবাব দেওয়াও গভীর জ্ঞানের দাবি রাখে এবং অধ্যয়নের

প্রয়োজনও অত্যধিক, সেজন্য মেধাবী ছাত্রভাইয়েরা এই ধরনের ফিতনা মোকাবেলায় লেখালেখি, বক্তৃতা এবং ভিডিও তৈরিতে[১২২] কাজ করতে পারেন। আর কাজের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ গ্রহণের জন্য ক্লাসের কিছু ছাত্রভাইকে বিশেষ কোনো যোগ্য উসতাদের অধীনে প্রয়োজন পরিমাণ ইংরেজি এবং তথ্য-প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এতে করে মেধাবী ছাত্রভাইয়েরা তাদের মেধা উপযুক্ত পরিবেশে দীনের স্বার্থে বিকশিত করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু ঢালাওভাবে ইংরেজি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে কওমি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীকে এই শিক্ষাগুলোর আওতায় আনা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। এমনিতেই দরসে নিজামির সিলেবাস অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। এর মাঝে যদি অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় এবং সহায়ক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে মধ্যম পর্যায়ের আলিম হওয়ার জন্য যতটুকু গভীর জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন সেটি বাধাগ্রস্ত হবে বলে আমার ধারণা। ক্লাসের মধ্যম এবং নিম্নমেধার ছাত্রভাইয়েরা যদি দুনিয়াবি প্রয়োজনে এসব শিক্ষা অর্জন করতে চান, তাহলে ফারেগ হবার পর ব্যক্তি উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তারা এই শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণ করতে পারবেন। এভাবে কওমি অঙ্গনকে পরিচালনা করলে মেধা, শ্রম এবং অর্থ সবকিছুই সর্বনিম্ন ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফায়দা আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

এক্ষেত্রে আরেকটি উপায় আমার মস্তিষ্কে এসেছে। দেখুন, সব সময় ক্লাসের প্রথম সারির ছাত্রভাইয়েরাই যে দীনের খেদমতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন অথবা বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে থাকেন, ব্যাপারটি কিন্তু এমন নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাকে দীনের জন্য কবুল করবেন এটি তার একান্তই নিজের সিদ্ধান্ত।

---

১২২. হজরত মুফতি সাহেবকে অফ দ্য রেকর্ড জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দীনের প্রয়োজনে ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে আপনার মত কী? হজরত জবাবে বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মাধ্যম ব্যবহার করিনি। জীবনভর তাসবীর ও ভিডিও এজাতীয় স্পর্শকাতর বিষয় থেকে দূরে থেকেছি। তবে সময় বদলেছে। এখন যদি বিজ্ঞ, মুহাক্কিক ও মুখলিস ফকিহদের অধিকাংশ এই মাধ্যমকে দীনের প্রয়োজন, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বলে মনে করেন, মেধাবী ও যোগ্য আলিমদের এই মাধ্যম ব্যবহারের অনুমতি দেন; সেক্ষেত্রে এটি হয়তো উম্মতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। তবে, আমি সতর্ক করে বলতে চাই- এই মাধ্যমটি অত্যন্ত প্রসারমুখী এবং ধ্বংসাত্মক মনে হচ্ছে। যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত সকলকে এমন প্রচার ও জনপ্রিয়তামুখী মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ ও অনুমতি প্রদান করা সমীচীন হবে না। অন্যথা অদূর ভবিষ্যতে এটি উপকার তো নয়, বরং দীন বিকৃতি ও তাহরিফের ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশংকাবোধ করছি। আল্লাহু আলাম।

বি.দ্র. হজরতের এই আশংকার বাস্তবতা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। (অনুলেখক)

কওমি অঙ্গনে ক্লাসের শেষসারির সর্বশেষ ছাত্রভাইটির মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াব্যাপী দীনের খেদমত নিতে পারেন, এই বিশ্বাস আমরা সব সময় লালন করে এসেছি। এই কথাটি কোনো তত্ত্ব কথা নয়; বরং এর পক্ষে হাজার হাজার উদাহরণ কওমি সমাজে এবং কওমি ইতিহাসে বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে বাতিলের মোকাবেলা করার জন্য মধ্যম এবং নিম্ন সারির ভাইদের হাতেও এই ধরনের ভ্রান্ত মতবাদগুলোর মৌলিক বর্ণনা আসা উচিত। এটি শুধুমাত্র একভাবেই সম্ভব। তা হলো সকল ভ্রান্ত মতবাদের মৌলিক কিতাবগুলো দক্ষ অনুবাদকদের মাধ্যমে মাতৃভাষায় অনূদিত করে ফেলা। এমনটি করা সম্ভব হলে যেসকল কওমি আলিম এই ময়দানে খেদমত করতে চান, তারা নির্দ্বিধায় অংশ নিতে পারবেন।

আমার দুঃসাহস!

(আলিমদের উদ্দেশে কিছু অনুরোধমূলক পরামর্শ)

আমি খুবই সাধারণ একজন তালিবে ইলম। অনেকে আমাকে আলিম অনেকে মাওলানা আবার অনেকে মুফতি বলে থাকে। আমার পক্ষে আলিমগণের জামায়াতকে নসিহত প্রদান অত্যন্ত বেআদবিমূলক বলে মনে করি। তবে আলিমদের খেদমতে দীর্ঘকাল থাকার সুবাদে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আগামীদিনের পথচলার জন্য সামান্য কিছু অভিজ্ঞতামূলক পরামর্শ নিবেদন করতে চাই।

প্রথমতঃ আলিমদের উচিত তারা তাদের অর্জিত ইলম অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন পরিচালনা করবেন। একজন সাধারণ মানের আলিমের জন্যও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ জনগণের সহজবোধ্যতার স্বার্থে আধুনিক যুগের সকল সমস্যা যথাসম্ভব কুরআন ও হাদিসের আলোকে সহজভাবে সমাধান করার চেষ্টা করা। এখানে দুটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত। যেন কোনো বিষয়ের সমাধান কুরআন- হাদিস এবং ইমামগণের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত না হয়। সামসময়িক গুরুতর সমস্যা সহজে সমাধান করার জন্য আজকাল অনেক নামধারী আলিম সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের আশায় দীনি মাসআলার ইচ্ছেমতো সমাধান দিয়ে যাচ্ছেন। ফলে তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং জনগণকেও বিভ্রান্ত করে নিজেদের গুনাহের আমলনামা আরো ভারী করছেন। আরেক শ্রেণির আলিম জনগণের দীন মানার যোগ্যতার প্রতি খেয়াল না রেখে কুরআন ও হাদিসের অত্যন্ত কঠোর বিধানাবলি তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন এমন অবস্থায়, যখন সেসব মাসআলায় কয়েক ধরনের

সহজবোধ্য আমলের বিধান উপস্থিত থাকে। এতে করে জনগণের পক্ষে দীন মানা অত্যন্ত কষ্টকর একটি জীবনপদ্ধতি বলে মনে হয়। যার ফলে তারা কখনো কখনো দীনের সেসব বিধান পালন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এজন্য মাসআলা প্রদান করার ক্ষেত্রে এবং কুরআন-হাদিস অনুযায়ী জনগণকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে আলিম ও মুফতিগণকে খুবই কৌশলী এবং বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ হতে হবে।

তৃতীয়তঃ একটি অঞ্চলের সকল আলিমকে বৃহত্তর স্বার্থে একমত হবার মানসিকতা রাখতে হবে। একটি দেশে বা অঞ্চলে নানামতের নানা ফিকহের আলিম থাকতে পারেন। তাদের মাঝে বিদ্যমান মতবিরোধগুলোতে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং দলিল-প্রমাণের সাহায্যে একে অন্যের মত কম উপযোগী প্রমাণের সময় ভাষাগত উপস্থাপনা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখার মতো উন্নত মনোবল ধরে রাখতে হবে। বৈধ মতবিরোধ যেন কখনোই জনগণের সামনে মৌলিক বিরোধ হিসেবে উপস্থাপিত না হয়, এই বিষয়টি সমধিক গুরুত্বের সাথে মাথায় রাখতে হবে। জাতীয় স্বার্থে অথবা বৃহত্তর স্বার্থে অথবা উম্মাহর অস্তিত্বের স্বার্থে এই ধরনের বৈধ মতবিরোধ একপাশে রেখে উম্মতের উপকার হয়, এমন সমাধান মেনে নেওয়ার উচ্চ মানসিকতা রাখতে হবে। এক কথায় 'আল-ইত্তিহাদ মাআল ইখতিলাফ' এই নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে।

উপমহাদেশের নিকট-ইতিহাসে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময়কালে আমরা আকাবির আলিমদের জামাতকে দেখেছি তারা তাদের আঞ্চলিক ও জাতীয় ইস্যুতে সবসময় ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখেছেন। এটি করতে গিয়ে প্রায়শই তাদেরকে নিজ নিজ পছন্দনীয় মতের বিপরীত মতকে মেনে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে। বিপরীত মতের পাশাপাশি তারা আরেকটি বিষয় মেনে চলতেন সেটি হলো একক নেতৃত্বের অধীনে বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়া। আপনি চিন্তা করে দেখুন ব্রিটিশ আমলে উপমহাদেশে কতটা জটিল সামাজিক পরিস্থিতি ছিল। সেই পরিস্থিতিতেও নানামতের নানা ভাষার আলিমগণ আকাবির ওলামায়ে দেওবন্দের নেতৃত্বে, আবার কখনো মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সাথে, আবার কখনো কখনো আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নানামুখী আন্দোলন একসাথে পরিচালনা করেছেন। হিন্দুস্থান স্বাধীন হবার ইতিহাস পড়লে আপনি প্রতিটি আন্দোলনের নেতৃত্বে কোনো না কোনো মাওলানা বা মৌলবির নাম পেয়ে যাবেন। আনুগত্যের এই কঠিন গুণটি হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের আলিমগণ দেশ স্বাধীন হবার পরও নিজেদের মধ্যে এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

বৃহত্তর ঐক্য : প্রেক্ষিত ওলামায়ে পাকিস্তান

পাকিস্তান আমলে আমি দেখেছি, রাজনৈতিক যেকোনো জাতীয় ইস্যুতে মুফতি মাহমুদ মুলতানি, আল্লামা শামসুল হক আফগানি ও আল্লামা ইউসুফ বানুরির আহ্বানে সকল মতের আলিমগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে যেতেন। দেওবন্দি, বেরেলবি, সালাফি, জামায়াতে ইসলামিসহ অন্যান্য মতের আলিমদের বিরল মিলনমেলা হতো এই মঞ্চগুলো। অন্যদিকে কখনো যদি কোনো দীনি মাসআলাতে দিকনির্দেশনার জাতীয় প্রয়োজন দেখা দিত, তখন দারুল উলুম করাচি অথবা জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়ার দারুল ইফতার সিদ্ধান্তই সারাদেশের আলিমগণ একযোগে গ্রহণ করে নিতেন। আমি তো আরো দেখেছি যে, আফগান জিহাদ চলাকালীন আফগানিস্তানের জিহাদি আলিমগণ জিহাদ সংক্রান্ত ইস্যুতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বিজ্ঞ আলিমগণ তাদের নিজ ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাতেন। অর্থাৎ, জাতীয় ইস্যুতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আলিমদের সিদ্ধান্তকে অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিমরাও নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। হিন্দুস্থানের চিত্র এর চেয়ে খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক ইস্যুতে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড, আসামের হজরত মাওলানা বদরুদ্দীন আজমল; এ ধরনের সংগঠন ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ হিন্দুস্থানের আলিমসমাজ এবং সাধারণ মুসলিম জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আবার ধর্মীয় ইস্যুতে দিকনির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিলে প্রাণপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী দারুল উলুম দেওবন্দ, মাজাহিরে উলুম সাহারানপুর, নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌসহ অন্যান্য বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের দারুল ইফতার দিকে সারা হিন্দুস্থান তাকিয়ে থাকে।

বৃহত্তর ঐক্যের অতীত ঐতিহ্য

বাংলাদেশেও ছোটবেলায় আমি একই চিত্র দেখে এসেছি। হজরত খতিবে পাকিস্তান সিদ্দিক আহমদ সাহেব, হজরত মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব, হজরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি সাহেব, হজরত মাওলানা আতাউর রহমান খান সাহেব, হজরত মাওলানা মুফতি দীন মুহাম্মদ, পিরজি হুজুর, হজরত হাফেজ্জী হুজুর যখন রাজনৈতিক ইস্যুতে দীনের স্বার্থে কল্যাণ দেখতেন তখন পারস্পরিক বিরোধ হাতের পেছনে রেখে একই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে যেতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও ধারাবাহিক দুই দশক হজরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে একই সাথে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ময়দানে আলিমদের আনুগত্য অটুট ছিল। এরপর

সম্ভবত আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অবনমন শুরু হয়। জাতীয় ইস্যুতে বৃহত্তর ও উম্মাহর কল্যাণ কামনায় একমত হবার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। একই সাথে বাড়তে থাকে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং নিজ দলের জাতীয় অবস্থান পোক্ত করার মানসিকতা। হজরত শাইখুল হাদিস এবং হজরত মাওলানা মুফতি আমিনী সাহেব তারপরও আলিমদের মাঝে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সেই বন্ধন শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পরবর্তীরা সম্ভবত নিজেদের আর ধরে রাখতে পারছেন না। আলিমদের মাঝে কেন্দ্রীয় আনুগত্য, হোক সেটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অথবা আধ্যাত্মিক পথচলায় কিংবা ইলমি ময়দানে, যদি সেটি অক্ষুণ্ণ না থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এটি সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত অশুভ পরিণাম বয়ে আনবে। আমি আশা করব তরুণপ্রজন্ম নেতৃত্ব ও আনুগত্যের এই শূন্যতা গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন এবং নিজেদের মাঝে নেতৃত্বের যোগ্যতা তৈরি করবেন। আগামীর দিনগুলো কিন্তু আর শুধু জাতীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মাহর ইস্যুগুলো আন্তর্জাতিক কোনো একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা আগামী প্রজন্মকে সময়োপযোগী দীনের খেদমত আনজাম দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন করুন এবং মুসলিম উম্মাহকে আলিমদের নেতৃত্বাধীন হয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্রয়োজন ইমামে আযমের যুগে ফিরে যাওয়া!

আর একটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং পীড়াদায়ক ইস্যু তুলে আনতে চাই। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, আমাদের দেশে গত কয়েকবছরে রেকর্ড পরিমাণ আলিম এবং দীন দরদি মুসলমানকে জেল-জুলুমে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং হচ্ছেও, যা ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আমলের ইতিহাসে আমরা কখনো শুনিনি। কখনো কখনো মনে হয়, আমরা হিন্দুস্থানের আজাদি আন্দোলন-পরবর্তী দশকে অবস্থান করছি। কোনো ধরনের অপরাধ ও অভিযোগের বিবৃতি ছাড়াই অত্যন্ত মেধাবী এবং উদীয়মান আলিমদের যেখান-সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গুম করে ফেলা হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে বহুদিন পর হয়তো তাদেরকে কোনো রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত দেখানো হয় অথবা শহিদ করে দেওয়া হয়। এহেন পরিস্থিতিতে আমার কিছু ভাবনা তুলে দিলাম।

আমি অসীম উদ্বেগের সাথে গত কয়েক বছর ধরে এ বিষয়গুলো অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। অন্যদের ব্যাপারে আলোচনার পূর্বে আমি আলিমদের

পক্ষ থেকেই তাদের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। এই যে জাতির রাহবার হিসেবে পরিচিত আলিমগণ হাজারে-হাজারে গ্রেফতার, গুম এবং শহিদ হচ্ছেন, এর পেছনে আমরাও অনেকাংশে দায়ী। সাধারণ, ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক মতপার্থক্য অথবা জায়েজ মাসায়েলের মাঝে অভ্যন্তরীণ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ঘৃণ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হবার মানসিকতা থেকে শত শত মাইল দূরে ছুড়ে ফেলেছে। এক দশক পূর্বেও তো আমরা দেখেছি, বাংলার জমিনে আল্লাহওয়ালা রাজনীতিবিদ আলিমগণ যখন কোনো জুলুমের বিপক্ষে হুংকার তুলতেন দল-মত নির্বিশেষ দেশের সকল স্তরের আলিমগণ এবং আপামর জনতা তাদের পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে যেত। জালিম সরকারের কালো হাত খুব দ্রুতই তাকে গুটিয়ে ফেলতে হতো। কিন্তু আফসোস! আমরা এমন এক সময়ে প্রবেশ করলাম যখন আমাদের মধ্যে বাতিলের জন্য যে প্রভাব থাকা উচিত ছিল, তা উঠিয়ে নেওয়া হলো। বক্তৃতা ও লেখালেখির মাধ্যমে তো অনেকেই জালিমের বিরুদ্ধে কণ্ঠ সোচ্চার করছে, কিন্তু এর কোনো প্রভাব আমরা লক্ষ করছি না। আদ-দীন আন-নাসিহার মূলনীতি সামনে রেখে এবং জাতীয় স্বার্থে আলিমদের আর তেমন কথা বলতে দেখা যায় না। সরকার ও আলিমদের মাঝে সম্পর্ক যে দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পারস্পরিক স্বার্থ মজবুত করা। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হলে আজকের বাংলাদেশের আলিম সম্প্রদায়কে পাশে রাখতেই হবে। এই উপলব্ধি সরকারকে সবসময়ই আলিমদের সামনে নতজানু ও তাদের বাহ্যিক কিছু সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখতে আগ্রহী করেছে। আর এই সুযোগে দুনিয়ালোভী কিছু নামধারী আলিম দীনকে পেছনে ফেলে নিজেদের দুনিয়াকে ক্ষণিকের জন্য আরাম-আয়েশে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে হাজার হাজার দীনদরদি আল্লাহওয়ালা আলিম এবং অগণিত সাধারণ তাওহিদি জনতার গ্রেফতার, গুম এবং শাহাদাত। অনেকেই এই কঠিন পরিস্থিতিতে শুধু নিজেদের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। তাদের মনে রাখা উচিত, ইতিহাস সবসময় তার নিজস্ব গতিতে প্রবাহিত হয়। জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার আসনে বসে যদি কেউ নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের পরিণাম ইতিহাস থেকে আমরা দেখে নিতে পারি। আলিমগণ ইতিহাস খুব ভালো করেই অধ্যয়ন করে থাকেন; তাই ইশারা দিয়েই থেমে যেতে চাই। উদাহরণ দিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না।

অপরপক্ষের কথা যদি বলি, তারা হলেন সরকারপক্ষ। বিনা অভিযোগে ও বিনা নোটিশে সম্মানিত নাগরিকদের হঠাৎ হঠাৎ অপহরণ ও গুম করে কোন আইনের আওতায় তারা এ সকল কার্যক্রম করে থাকেন তা আমার জানা নেই। আইনের সংজ্ঞা

ও বাস্তবায়ন যদি এমনই হয় তাহলে আমি বলব, পৃথিবীর সবচেয়ে অমানবিক বিষয়টি হচ্ছে প্রচলিত আইন। আমার ধারণা এই আইনগুলো সবই ব্রিটিশ আমলের। এর সামান্য সংশোধন-সংস্কার করে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্রিটিশদের ভুতুড়ে ও স্ববিরোধী আইনের ইতিহাস আশা করি আপনারা পড়ে থাকবেন। গোলামির ইতিহাসকে এভাবে নিজেদের সংবিধানে স্থান দিয়ে আমরা কী বোঝাতে চাই তা আমার বুঝে আসে না। একদিকে তো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য; বরং তাদের অস্তিত্বই মিশিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বিচারে জুলুম হয়ে থাকে; পাশাপাশি কিছুদিন ধরে জাতির আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ওলামা জামাতকেও একইভাবে নির্যাতনের কেন্দ্রবিন্দু বানানো হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে সরকার একটি পুরোনো ব্রিটিশনীতি অনুসরণ করছে বলে আমার মনে হচ্ছে। ফাররিকু ওয়া তাহাকামু- ভাগ করো এবং শাসন করো- এই নীতির বাস্তবায়ন ওলামা জামাতের সাথে হচ্ছে। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, গত এক দশক ধরে আলিমদের একটি 'মধ্যমপন্থি' জামাত সরকারের সাথে গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে সম্পর্ক তৈরির সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন ধরনের জুলুম-অত্যাচার এবং দীনবিরোধী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাদের কখনো প্রতিবাদ অথবা উপদেশ দিতে দেখা যায় না। উলটো জাতীয় সকল ইস্যুতে সরকারের গৃহীত নীতির ইতিবাচক ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা দিতে দেখা যায় তাদের। আমার জানা নেই হেকমতের কোন পর্যায় থেকে তারা এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করছেন। আমি তো আইয়ুব সরকার ও ইয়াহিয়া সরকারের সময়ে পাকিস্তানে থেকেছি। সে সময় সামরিক সরকার অত্যন্ত কঠোর নীতি জনগণের উপর প্রয়োগ করত। পরিস্থিতির কারণে কখনো কখনো রাজনৈতিক স্টেজ থেকে আলিমগণ সরকারকে নসিহত করতেও দ্বিধাবোধ করতেন। এই ধরনের কঠিন সময়ে প্রতিবাদমূলক আচরণে না গিয়ে আলিমগণ হেকমতের সাথে নসিহতের পন্থা অবলম্বন করতেন। হজরত আল্লামা বানুরিকে তো আমি অনেকবার দেখেছি, তিনি সরকারি বিভিন্ন ইস্যুতে নসিহতমূলক পন্থায় শাসককে সম্বোধন করতেন। পাশাপাশি জনগণকেও নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ইসলামিকরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। বানুরি সাহেব সরকারের নানা সময়ে গৃহীত দীনি ও জনস্বার্থে কল্যাণকর পদক্ষেপগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। আমার ক্ষুদ্র পরিসরের পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু বুঝেছি, রাজনীতিতে হেকমত বলতে তো এই ধরনের আচরণ ও কর্মপন্থাকেই বোঝানো হয়। আমি জানি না নতুন প্রজন্মের আলিমগণ ঈমান ও হেকমতের প্রাচীন কোনো কিতাবের অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি পেয়ে গেছেন কি না!

এরাই টিকে যাবে!

আর এক শ্রেণির আলিম তাদের ঐতিহ্য অটুট রেখে আকাবির আলিমদের পথ অনুসরণ করে এগিয়ে গেছেন। সরকারের জুলুম-অত্যাচার ও দীনবিরোধী সকল কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন। ফলে তাদের অনেককেই করতে হয়েছে কারাবরণ, গ্রহণ করতে হয়েছে শাহাদাত। কিন্তু জান্নাতের অদম্য পথিক এই আলিমগণ কখনোই নিজেদের দায়িত্ব ভুলে যাননি। এই ধরনের পবিত্র জীবনের অধিকারী, ত্যাগী স্বভাবের মানুষগুলো আজ কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুকে ধুকে সময় অতিবাহিত করছেন। অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী তো উচিত ছিল, এই প্রতিবাদী আলিমদের জন্য বাইরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারা আলিম এবং দীনদরদি জনগণ সরকারকে চাপের মুখে ফেলে আল্লাহওয়ালা নিরপরাধ বন্দিদের মুক্ত করতেন। কিন্তু আফসোস! অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, এই নিরপরাধ বন্দিদের ব্যাপারে সামান্য প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, তাদের নাম উচ্চারণ করতেও সরকারের মদদপুষ্ট আলিমরা এখন কুণ্ঠাবোধ করেন। ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিতে চাই। আমার একজন সুযোগ্য জামাতা—যিনি একজন আলিম এবং মুফতি সাহেব—তাকে গত কয়েক মাস পূর্বে বিনা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে গুম করে দেওয়া হয়েছে। রাজনীতির ময়দানে থাকা আলিমদের সাথে অনেক আলোচনা করেও প্রতিবাদমূলক কোনো বিবৃতি তাদের থেকে পাইনি। বরং বরাবরের মতো সরকারের অন্যান্য জুলুমি পদক্ষেপের মতো এই ব্যাপারেও ইতিবাচক ব্যাখ্যা আমাকে শুনতে হয়েছে যে, নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর দেশবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডের সাথে এই সকল গুম হওয়া ব্যক্তি ও আলিমরা সম্পৃক্ত আছেন! আমার জামাতার মতো শত শত তরুণ, মেধাবী আলিম ও মুফতি সাহেব আজ বিনা অপরাধে ও বিনা অভিযোগে জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মূল্যবান যৌবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। তাদের জন্য উহ আহ করারও যেন কেউ নেই। কখনো কখনো আমার তো মনে হয়, শেষজমানায় হতে যাওয়া অসহ্য জুলুমি পরিস্থিতির সূচনাকাল চলে এসেছে। বর্তমান সমাজে আলিমদের যে চিত্রটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এটি এখন শুধু বাংলাদেশের চিত্র নয়; বরং পৃথিবীর সকল দেশেই মোটামুটি একই অবস্থা বিরাজমান। আমি তো দিনরাত এই একই দোয়া করি, হে আল্লাহ, নিরপরাধ বন্দি আলিমদের উপর আপনি রহম করুন। তাদেরকে আশু মুক্তি দান করুন। তাদের পরিবারকে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুন। আমার মতো প্যারালাইজড একজন অসহায় তালিবে ইলম বসে বসে 'ইয়া আসাফা' বলা ছাড়া আর কী-ইবা করতে পারে, বলুন!

সাথির তরে ব্যাকুল হৃদয়

(তলাবায়ে কেরাম ভাইয়ের উদ্দেশে কিছু কথা...)

ছাত্রভাইদের উদ্দেশে আমি বলব, আপনারা দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত দরসে নিজামির মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করুন। দরসে নিজামি অত্যন্ত বরকতময় একটি সিলেবাস। লাখ লাখ আলিম এই সিলেবাস সমাপ্ত করে যুগের বাতিলদের মোকাবেলা করে গেছেন। তাই এই নিসাবকে প্রাচীন মনে করে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করার পূর্বেই অন্যান্য কম প্রয়োজনীয় বিষয়ে পারদর্শী হবার চেষ্টায় ভুলেও লিপ্ত হবেন না। অনেক ছাত্রভাই আজকাল দরসে নিজামির ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ফুনুনাতের চর্চা করে থাকেন। দরসে নিজামি চলাকালীন এই ভাইয়েরা ফুনুনাতের উপর কতটুকু দখল আনতে পারেন তা আমার জানা নেই; কিন্তু এতটুকু অবশ্যই জানি, এভাবে যারা মেহনত করেন তারা কখনোই দরসে নিজামিতে পূর্ণাঙ্গ দখল আনতে পারেন না। আমি আপনাদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে এই উপদেশ দিতে চাই যে, অন্তত দরসে নিজামির সিলেবাসটুকু ধারাবাহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে সমাপ্ত করুন। দরসে নিজামিতে যেসকল বিষয় পড়ানো হয়, সেখানে প্রতিটি বিষয়ের উপর মৌলিক কিছু দখল অর্জন করুন। তাজবিদ থেকে শুরু করে তাফসির পর্যন্ত সকল বিষয়ে যেন একটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক ধারণা আপনাদের হয়ে যায় এমনভাবে মেহনত করুন। যেহেতু আলিমদের সমাজের নেতৃত্ব দিতে হয়; তাই দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত সমস্যাগুলোর সহজ ও সহজলভ্য সমাধান আয়ত্তে রাখুন। পাশাপাশি সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ও বাতিল চিন্তাধারাগুলোর ব্যাপারে মৌলিক কিছু ধারণা এবং সেসবের জবাব আত্মস্থ করার চেষ্টা করুন। পাঠ্যজীবনে এগুলো যদি করতে পারেন, তাহলে আমি বলব আপনি একজন সফল তালিবে ইলম। আপনাদের পছন্দের সহযোগিতামূলক বিষয়গুলো আপনারা ফারেগ হওয়ার পর নিজ উদ্যোগে শিখে নিতে পারবেন। এগুলো তেমন জটিল বিষয় নয়। ফারেগ হওয়ার পর তরুণ আলিম ভাইদের উদ্দেশে বলব, আপনারা দীনের কোনো একটি শাখায় মেহনত অব্যাহত রাখুন। মহান আল্লাহ্ আমাদের নবীজিকে নবুওয়াতের যে মিশন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সেই মিশনেরই আপনারা উত্তরসূরি। নবীজির জীবনকে যদি পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন, নবীজি সাহাবিদের কালামে পাক শিক্ষা দিয়েছেন। তাদেরকে হাদিস শুনিয়েছেন। দীনের হুকুম-আহকাম ব্যাখ্যা করেছেন। নবীজির সংস্পর্শে লক্ষাধিক সাহাবি এসে থাকলেও সকলেই দীনের ব্যাপারে সমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। বরং একেক সাহাবি একেক বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এটি স্বাভাবিক ছিল, কারণ দীনের প্রয়োজনে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে

আল্লাহর দীন পৌঁছে দিতে হলে দীনের প্রত্যেকটি বিষয়ে যোগ্য এবং অভিজ্ঞ সাহাবির প্রয়োজন ছিল।

বিশেষায়িত যোগ্যতার পথে পা বাড়ান...

নবীজির জীবনে প্রায় ৯ হাজার সাহাবি সম্পূর্ণ কালামে পাক মুখস্থ করেছিলেন। কিন্তু এদের মাঝে সবাই কারি ছিলেন না। কারি বলতে প্রচলিত সময়ে যারা সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করেন তেমন মানুষ বোঝাচ্ছি না; বরং কারি বলতে ফিকহের পরিভাষায় বোঝানো হয়, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে শেখানো সবধরনের তেলাওয়াত-পদ্ধতির ব্যাপারে অবগত থাকেন এবং কুরআনুল কারিমের কোন সুরার আয়াত সংখ্যা কত, সেসবের শানে নুজুল প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন। নবীজি জানতেন, তার সান্নিধ্যে থেকে কারা কারা কুরআনুল কারিমের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন। উম্মতের কাছে কেয়ামত পর্যন্ত যেন আসমানি কিতাবের জ্ঞান পৌঁছে সেজন্য তিনি কুরআনুল কারিমের উপর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী সাহাবিদের পরিচয় উম্মতকে প্রদান করে গেছেন। যেমন নবীজি নিজেই বলেছেন, কুরআনুল কারিম বিষয়ে তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তোমরা উবাই ইবনে কাব, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনে আবি তালিবের মতো সাহাবির শরণাপন্ন হবে। এভাবে অভিজ্ঞ সাহাবিদের সনদ প্রদানের মাধ্যমে নবীজি কেয়ামত পর্যন্ত কুরআনুল কারিমের জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

হাদিসের ক্ষেত্রেও নবীজি সর্তকতা অবলম্বন করেছেন। অত্যন্ত মেধাবী ও তরুণ সাহাবিদের অধিকহারে তিনি হাদিস শুনিয়েছেন। নবীজি জানতেন কার মাঝে কোন ধরনের যোগ্যতা লুক্কায়িত রয়েছে। তিনি ঠিক সেভাবেই সেই সাহাবির সাথে আচরণ করতেন। হজরত আবু হুরাইরা নবীজির ইনতেকালের মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু দেখা যায়, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় হাদিস এই সাহাবির সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। নবীজি যেহেতু হজরত আবু হুরাইরার মাঝে হাদিস সংরক্ষণের সুপ্ত মেধা লক্ষ করেছিলেন, তাই তাকে শেষবয়সে অধিক সময় দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগুলো তার মাধ্যমে উম্মতের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়।

তেমনিভাবে ফিকহের ক্ষেত্রেও নবীজি এমন কিছু সাহাবিকে নির্বাচন করেছিলেন, যারা ইসলামের বিধানসংবলিত ব্যাখ্যা নবীজির নিকট থেকে খুব সূক্ষ্ম ও পূর্ণাঙ্গভাবে শেখার যোগ্যতা রাখতেন। সাহাবিদের এই জামাতের কাছে নবীজি সময়ে

সময়ে ইসলামের বিধানসংক্রান্ত বিষয়াবলি কুরআন-হাদিস এবং বিবেকবুদ্ধি ব্যবহারের মাধ্যমে সামসময়িক সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফলে তাদের মাঝে ফিকহের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সরাসরি নবীজির মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তার ব্যাপারে নবীজি বলেছেন, আমার পরে বিধানসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে যদি তোমরা সমস্যায় পড়ো, তাহলে ইবনে মাসউদের কাছে প্রশ্ন করবে। এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমান থেকে প্রাপ্ত ওহীর জ্ঞানের মৌলিক আলোচনা ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সাহাবিদের বিভিন্ন জামাতকে শিক্ষা দিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত দীনের ভিত্তি মজবুত করে গেছেন।

তাই আলিম হিসেবে আপনাদের উচিত হবে, কর্মক্ষেত্রে আপনি দীনের কোনো একটি মাধ্যম বাছাই করে সেই ময়দানে নিজেকে নিয়োজিত করবেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককেই ভিন্ন ভিন্ন রুচি এবং যোগ্যতা দান করেছেন। এই দুটি বিষয় বিবেচনায় রেখে আপনাদের মধ্য থেকেই একটি জামাতকে কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধ তাজবিদ উম্মতকে শেখানোর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আবার কুরআনুল কারিমের ভাষা, এর শাব্দিক ব্যাখ্যা এবং তাফসির শেখানোর জন্য একটি জামাত তৈরি হতে হবে। হাদিসে নববির চর্চা এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরেকটি চৌকস জামাত প্রস্তুত থাকতে হবে। ফিকহের ক্ষেত্রে যারা পারদর্শিতা অর্জন করবে, তারা সাধ্যমতো এই ময়দানে মেহনত করে যাবে। সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে ইসলামি ধাঁচে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আত্মশুদ্ধির মহান মিশন পালনে আপনাদের মধ্য থেকেই একটি জামাতকে দায়িত্ব নিতে হবে।

দাবি পূরণে চাই প্রতিজ্ঞ হৃদয়

ভাইয়েরা, মনে রাখবেন শুধু নবীজির উত্তরসূরি হিসেবে দাবি করলেই দাবি পূরণ হবে না। দাবির বাস্তবায়নে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক আলিম ভাইকে আল্লাহ তায়ালা কোনো না কোনো যোগ্যতা দান করেনই। আপনাদের কাজ হবে প্রাপ্ত সেই যোগ্যতাটুকুর পাশাপাশি কিছুদিন কোনো আল্লাহওয়ালা শায়েখের সান্নিধ্যে থেকে অর্জিত ইলমের ধাঁচে নিজেকে গড়ে নেওয়া, যাতে আপনার ব্যক্তিজীবন সর্বপ্রথম আসমানি আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। আর একটি কথা মনে রাখবেন, বেকার জীবন কখনোই কাম্য নয়। নবীজি বেকার থাকতে কঠোরভাবে মানা করেছেন। যেকোনো ধরনের দীনি খেদমতের সুযোগ পেলে সেখান থেকে আপনার দুনিয়াবি প্রত্যাশা পূরণ যদি নাও হয়, তবু দীনের খাতিরে খেদমতে লেগে

যাবেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আপনাদের নিরাশ করবেন না। আরেকটি কথা, আজকাল আলিমদের সামনে খেদমতের নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। যেমন সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি গ্রহণ, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের পদে চাকরি গ্রহণ ইত্যাদি। আমার ধারণা এই পেশাগুলোর ফলে আপনাদের দুনিয়াবি প্রত্যাশা খুব ভালোভাবেই পূরণ হচ্ছে। তবে এই খেদমতগুলোর পেছনে যদি উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণ লুক্কায়িত না থাকে, তাহলে আমি অনুরোধ করব আপনারা বিষয়গুলো আরেকটু চিন্তাভাবনা করে দেখবেন। দুনিয়াতে যেকোনো হালাল পেশাই উত্তম; কিন্তু আলিম হিসেবে দীনের কোনো একটি মৌলিক মেহনতের সাথে অথবা সুযোগ থাকলে সবকটির সাথে সম্পৃক্ত থাকা তো এক ধরনের ফরজে কিফায়া। নবীজির উত্তরসূরি দাবি করে যদি আমরা তার রেখে যাওয়া মেহনতে নিজেদের জান-মাল, শ্রম-সময় ও অর্থ-সম্পদ ব্যয় না করি তাহলে এই দাবি তো অসার প্রমাণিত হবে। একজন আলিম যদি দীনের কোনো মেহনতের সাথে যুক্ত না থাকেন তাহলে ধরে নেওয়া যায়, তিনি নিজেই তার এই মহাসম্মানিত অবস্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন না। যেসকল ভাই এই ধরনের পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন বা হবার ইচ্ছা রয়েছে আমি তাদের অনুরোধ করব, আপনারা দৈনিক এক ঘণ্টা হলেও দীনের কোনো একটি মৌলিক খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত হবেন এবং অর্জিত ইলমের সাথে ন্যূনতমভাবে হলেও সম্পর্ক রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সবাইকে দীনের জন্য কবুল করুন। আমিন।

আমার ভাইয়েরা...!

(অনেকে অনুরোধ করে থাকেন, মুসলিম উম্মাহর সাধারণ সদস্যদের ব্যাপারে কিছু নসিহত করুন, যাতে তারাও আপনার অর্জিত এবং যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জীবনের কিছু পাথেয় খুঁজে পায়। তাদের জন্য হৃদয়ের কিছু উত্তাপ...)

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। সাধারণ মুসলিম জনতাকে হেদায়েতের পথ দেখানোর উদ্দেশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর লোকজনকে সঠিক পথ দেখানো ও ভুল পথ থেকে তাদের আগ্রহ সরানোর জন্য এখন আলিমদেরই এই কাজ করে যেতে হবে। কেয়ামত পর্যন্ত নবীদের রেখে যাওয়া এই দায়িত্ব এখন আলিমদের কাঁধে অর্পিত। তবে সাধারণ লোকদের উপরও কিছু দায়িত্ব রয়ে গেছে। তাদের উপর দায়িত্ব হলো, তারা এই পার্থিব জীবনে দীন ইসলামকে বাস্তবায়ন করার জন্য যেসকল বিধান ও নিয়মকানুন জানা প্রয়োজন

সেগুলো নিজ ইচ্ছায় ও আগ্রহে জানার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজন পরিমাণ দীনের জ্ঞান অর্জন করা সকলের উপরই ফরজ, এটি কারও অজানা নেই। এখন তো বাংলাভাষাতেও অসংখ্য কিতাব রয়েছে, যেগুলো থেকে একজন মুসলিম ভাই ইসলামের হুকুম-আহকাম ও দৈনন্দিন মাসআলা শিখে নিতে পারেন। তবে সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো কোনো আল্লাহওয়ালা এবং অভিজ্ঞ আলিমের কাছে গিয়ে তার সান্নিধ্য গ্রহণ করে ধীরে ধীরে এই সকল বিষয় প্রায়োগিকভাবে আয়ত্ত করে নেওয়া। যেমন আপনার ওজু-গোসল কীভাবে করতে হবে, জরুরি অবস্থায় কী করতে হবে এগুলো সরাসরি একজন আলিমের তত্ত্বাবধানে থেকে শেখার পাশাপাশি প্রায়োগিকভাবেও দেখে নেওয়া যে, কীভাবে এই সকল আমল আদায় করতে হয়। শুধু কিতাব পড়ে নিলে অনেক সময় বিষয় পরিষ্কার না হওয়ায় বহু ভাই বিভ্রান্তির শিকার হন। সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি অনুসরণ করাই সবচেয়ে নিরাপদ ও উত্তম। তারা তাদের দুনিয়াবি পেশা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সময়-সুযোগ বুঝে নবীজির সান্নিধ্যে আসতেন এবং কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। সাথে নিয়ে আসতেন কিছু জীবনঘনিষ্ঠ জিজ্ঞাসা। নবীজির সুযোগমতো তারা এসব বিষয় জেনে নিতেন। এরপর আবার নিজ কর্মক্ষেত্রে চলে গিয়ে শিখে নেওয়া বিষয়গুলোর উপর আমল করে নিজেকে সেভাবে অভ্যস্ত করে নিতেন। বেশিরভাগ সাহাবি এভাবেই নবীজির নিকট থেকে দীনের মাসায়িল এবং আহকাম শিক্ষা করেছেন। এভাবে শেখার ফলে শিখে নেওয়া বিষয়গুলো নিজেদের আচরণ ও জীবনপ্রণালিতে অভ্যস্ত করে নেওয়া সহজ হয়। এ ছাড়াও আজকাল অন্যান্য অনেক মাধ্যম তৈরি হয়েছে। সময় ও সুযোগের স্বল্পতা থাকলে সেসব মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্ষণিকের ডেরায়..!

আমাদের মুসলিম ভাইবোনদের বোঝা উচিত, আমরা দুনিয়াতে শুধু কর্মক্ষেত্রে সময় দিয়ে মুনাফা বা বেতন গ্রহণ করেই জীবন কাটিয়ে দিতে আসিনি। আমরা তো দুনিয়াতে খুব স্বল্প সময়ের জীবন নিয়ে মুসাফির বেশে এসেছি। মৃত্যুর পরে এক অসীম জীবন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের জন্যই হওয়া উচিত। কর্মক্ষেত্রে একজন মুসলিমের যে আচরণ ও কর্মপন্থা থাকবে তা অবশ্যই অন্য ধর্মাবলম্বী বা ধর্মহীনদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত। যেভাবে তারা চলে, যেভাবে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, যেভাবে তারা জীবন অতিবাহিত করে, ঠিক সেভাবেই যদি একজন মুসলিম জীবন অতিবাহিত করে তাহলে শুধু শুধু পরিচয়ে ভিন্নতা তৈরির কী প্রয়োজন ছিল? এজন্য আমাদের মাঝে

এই বোধ এবং উপলব্ধি জাগ্রত করা উচিত যে, আমরা দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে জীবন অতিবাহিত করতে এসেছি। স্বেচ্ছাচারী জীবনের জন্য আমরা লালায়িত নই। তাই আমি মনে করি, হুকুম-আহকামের ব্যাখ্যা জানা ছাড়াও শুধু নসিহত, আখেরাতের পরিচয় ও বর্ণনা লাভের জন্য মুসলিম ভাইবোনদের অনুবাদসহ কুরআনুল কারিম পড়া উচিত। সম্ভব হলে সাধ্যমতো তাফসিরগ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অধ্যয়ন হতে হবে হুকুম-আহকাম ও আকাইদের জটিল বিষয়গুলো একপাশে রেখে।

শুধুই উৎসাহের জন্য!

জনসাধারণের দীনমুখিতার জন্য আলিমদের কিছু মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে। তারা সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। মসজিদের মিম্বার থেকে শুরু করে ওয়াজ-মাহফিলের মঞ্চ পর্যন্ত তাদের অবাধ ও স্বাধীন বিচরণ। জনসমাজের ধর্মীয় চিন্তাধারার গতিপথ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ তাদের হাতেই থাকে। তারা একটু উদ্যোগী ও আন্তরিক হয়ে এই জায়গাগুলোর সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহার করলে জনগণের জন্য দীন বোঝা, দীনের পথে আসা এবং দীন মানা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

আমি যখন করাচিতে ছিলাম সুস্থ থাকাকালীন দীর্ঘ ২৫ বছর জামশেদ রোডের উসমানিয়া মসজিদের ইমামত ও খিতাবাতের দায়িত্ব পালন করেছি। এই মসজিদটি মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির স্মৃতিধন্য হিসেবে এই নামে পরিচিত। দারুল ইফতার ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমি সেই সময়গুলোতে সাধারণ জনগণের সাথে কিছু সময় ব্যয় করার ব্যাপারে খুবই আন্তরিক ছিলাম। প্রতি ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে বেশি সময় দিতে না পারলেও আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ঘোরাঘুরি বা হাঁটাহাঁটির বদলে আমি মসজিদে বসে থাকতাম। প্রথমদিকে দু'একজন করে মুসল্লি ভাই আমার সাথে মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতেন। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আগ্রহী মুসল্লির সংখ্যা। একপর্যায়ে এটি আমার দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত হয়। কারণ তখন আসরের পরে প্রায় সকল মুসল্লি মসজিদে বসে থাকতেন এবং প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নিত্যদিনের জীবনঘনিষ্ঠ জিজ্ঞাসা নিয়ে আসতেন। দীনের ব্যাপারে তাদের এই দরদ ও আগ্রহ দেখে আমি এশার নামাজের পর সাপ্তাহিক একটি তাফসিরুল কুরআন আয়োজন করি। সাপ্তাহিক তাফসিরের দিনে সাধারণ মুসল্লিদের সাথে দূরদূরান্ত থেকেও অনেক ভাই এসে পড়তেন। আমিও অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এই আয়োজনের প্রস্তুতিকল্পে গভীর অধ্যয়নে ডুবে যেতাম। নিউটাউনের একটি দরস নেওয়ার মতো করে আমি বেশকিছু তাফসির অধ্যয়ন করে

এরপর মসজিদে যেতাম। ঈমান-আকিদা, নবীগণের ঘটনা, আখেরাতের বর্ণনার পাশাপাশি আমি কুরআনুল কারিম থেকে দীনি হুকুম-আহকামসংবলিত বিষয়াদি তাফসির করতাম। উসমানিয়া মসজিদ একটি বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সীমানার মাঝে অবস্থিত ছিল। ফলে মুসল্লিদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তারা তাফসিরে বসলে সবসময় নোটপ্যাড এবং কলম কাছে রাখতেন। তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়া বিষয়গুলো তারা টুকে রাখতেন। উদ্দেশ্য থাকত, ফিরে গিয়ে ঘরের সদস্যদের মাঝে বিষয়গুলো পুনরায় আলোচনা করা। এভাবে প্রায় ২৫ বছর ধরে আমি উসমানিয়া মসজিদে সাধারণ মুসল্লিদের উদ্দেশে তাফসিরুল কুরআনের দরস চালিয়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ এই দীর্ঘ সময়ে পবিত্র কুরআনুল কারিমের একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসির-খতম আমি আল্লাহর রহমতে করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ডক্টর মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার সাহেব সর্বশেষ দিনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই দরসটি তিনিই প্রদান করেছিলেন। মুসল্লি ভাইদের উদ্যোগে সেদিন ১০০০ মেহমানকে দাওয়াত করা হয়েছিল। আমি যখন উসমানিয়া মসজিদে খেদমত শুরু করি তখন অনেক মুসল্লি ভাই—যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ এর মধ্যে ছিল—আমার দরসে নিয়মিত বসতেন। যখন তাফসিরুল কুরআনের দরস সমাপ্ত হয়, তখন আমি তাদের প্রত্যেকের মুখে সুন্নতি দাড়ি এবং শরীরে সুন্নতি পোশাক দেখেছি। এই ভাইদের প্রায় সবাই সেসময় দাওয়াতে তাবলিগের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন মাশাআল্লাহ। কুরআনুল কারিমের বরকতে বহু ভাই উসমানিয়া মসজিদ থেকে ইসলামি জীবনের পথ ধরেছিলেন। অনেক জামায়াতপন্থি ভাইও আমাদের দরসে শরিক হতেন। পরবর্তী সময়ে আমি দেখেছি তাদের অনেকেই জামায়াতে ইসলামির ভ্রান্ত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে আহলে সুন্নাতের বিশুদ্ধ আকিদা ও মানহাজ গ্রহণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। যখন আমি প্যারালাইজড হয়ে যাই, তারপর থেকে দরসে কুরআন এবং মাসআলা বর্ণনার জন্য মসজিদে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমি দেশে চলে আসার পর পুনরায় পাকিস্তান সফরে গেলে লক্ষ করি, মুসল্লি ভাইদের সাথে মহব্বত এখনো অটুট রয়েছে। তারা প্রায়ই নিউটাউনে দেখাসাক্ষাতের জন্য আসতেন। আফসোস করে বলতেন, হজরত, আপনি চলে আসার পর উসমানিয়া মসজিদের রওনক (প্রাণ-প্রাচুর্য) শেষ হয়ে গেছে।

নিজের উদাহরণ এজন্য দিলাম যে, আমি কোনো পেশাদার খতিব বা বক্তা নই। খুব সাধারণভাবে কথা বলি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ছিল বিধায় সামান্য এই খেদমতটুকু জনগণের জন্য করার তাওফিক হয়েছিল। আপনাদের মাঝে যারা আলোচনা ও উপস্থাপনায় যোগ্যতা ও রুচি রাখেন, তারা লিল্লাহিয়াত ও জনগণের

কল্যাণে এই ময়দানে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে পারেন। এতে করে জনগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত দীনি চাহিদা পূরণ করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা তরুণপ্রজন্মের আলিম ভাইদের জনগণের সাথে মিলেমিশে দীনের খেদমত করার হেকমত ও হিম্মত দান করুন। আমিন।

যাপিত জীবনের কিছু প্রাপ্তি

আমার জীবনের সকল আমলই আমি চেষ্টা করেছি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশে করতে। এই সকল বিষয় আনজাম দিতে গিয়ে—সেটি হোক ছাত্রজীবনের সময় অথবা শিক্ষকতার সময় অথবা সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যয় করা সময়—কখনো মানসিক প্রশান্তি পেতাম, আবার কখনো চাপের জন্য কোনো কোনো আমল ভারী মনে হতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে রাজি-খুশি ও সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় থাকতাম। যে কয়েকটি বিষয় ও খেদমত আনজাম দিয়ে আমি অধিক প্রশান্তি লাভ করেছিলাম তন্মধ্যে দু-তিনটি বিষয় উল্লেখ করছি।

পাকিস্তানে থাকাকালীন সময়ে সেখানে জাতীয় ইস্যুতে অনেক নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। দেশের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোর দারুল ইফতা ও দারুত তাসনিফ থেকে এই সকল সমস্যার ব্যাপারে সব সময় আলোচনা সামনে আসছিল। তখন আমি বিভিন্ন বিষয়ে মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি হজরতের সাথে পরামর্শ করতাম। তিনি যখন বলতেন, এই বিষয়ে কলম ধরা দরকার তখন আমি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখতাম। কলামের ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে কখনো মুফতি সাহেব বলতেন, এগুলো গ্রন্থাকারে ছেপে আসা উচিত। হজরতের অনুমতি হলে তখন বই ছেপে দিতাম। এই কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ সময়গুলোতে আমি দীর্ঘদিন আল-বাইয়্যিনাত ও পাকিস্তানের অন্যান্য জাতীয় দৈনিকেও নিয়মিত কলাম লিখতাম। সময়ের প্রয়োজনে লেখা এই কলামগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে যখন কথা বলত এবং বড় বড় ইস্যুতে যখন ইসলামের পক্ষে পাল্লা ভারী হতো তখন আমি এক সাগর প্রশান্তি অনুভব করতাম। এ ছাড়াও দীর্ঘদিন নিউটাউনের দারুল ইফতায় দায়িত্বরত থাকাকালীন হাজার হাজার ফতোয়া লিখতে হয়েছে। কিছু কিছু ফতোয়া তো ছিল সাধারণ জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে; কিন্তু কিছু কিছু ফতোয়া দিতে হয়েছিল সরকারের ইসলাম বিরোধী ও জনস্বার্থবিরোধী নীতির খণ্ডন ও প্রতিবাদ করতে গিয়ে। এই সকল ফতোয়া প্রদানের সময় যে মানসিক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক নুর অনুভব করতাম তা জীবনে আর কখনো অনুভব হয়নি। আসলে তো ভাই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাতেই বান্দা দীনের খেদমতে থাকার সুযোগ পায়। তাই এই ধরনের স্মৃতি নিজের যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ভেবে বেশি বেশি স্মৃতিচারণ করাও উচিত

নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের জীবনের সকল আমল নিজ অনুগ্রহে কবুল করুন। আমিন।

আহ! যদি পারতাম!

(আমার জীবনে এমন কিছু খেদমত, যা করার সুযোগ এখনো হয়নি, কিন্তু মনমাঝে ইচ্ছা তো রয়েই গেছে। ছোট্ট করে বলে গেলাম। দোয়া চাই পূর্ণতার।)

আসলে বান্দা তো অনেক কিছুই আশা করে, ইচ্ছাও করে। কিন্তু সুযোগ, সামর্থ্য ও যোগ্যতা আসমান থেকে ফয়সালা হয়ে আসে। তাই চাইলেই কিছু করে ফেলা এতটাও সহজ বিষয় নয়। বিশেষ করে শুধু সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকলে দীনের যেকোনো খেদমত করা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তায়ালা যাকে যে খেদমতের জন্য পছন্দ করবেন সে ব্যক্তি সেই খেদমতটুকু আনজাম দিতে পারবে। আমার জীবনে দুটি খেদমতের ইচ্ছা ও শখ এখনো রয়ে গেছে। কিন্তু শক্তি ও সামর্থ্য বলতে গেলে প্রায় পুরোটাই হারিয়ে ফেলেছি। তাই এই মুহূর্তে আমি আমার রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতার পরিপূর্ণ আশাবাদ রাখি। যদি তিনি নজরে করম করেন, তাহলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

আমি নিউটাউনে শিক্ষকতাকালীন জীবনে টানা অনেক বছর জালালাইন শরিফ পাঠদানের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। যেহেতু অধ্যয়নের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকেই, তাই দরসে যাবার পূর্বে আমি বিষয়ের উপর সাধ্যের সবটুকু দিয়ে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করতাম। জালালাইন শরিফ পড়ানোর জন্য আমি সহায়ক হিসেবে তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন- মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব, তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন- আল্লামা ইদরিস সাহেব কান্ধলবি, তাফসিরে মাযহারি-আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি, তাফসিরে উসমানিসহ আরবি ভাষায় লিখিত দশটির মতো তাফসিরগ্রন্থ আশপাশে রাখতাম। এভাবে দীর্ঘদিন অধ্যয়নের ফলে ইসলামি দুনিয়ায় সেসময়ের উপলব্ধ যত তাফসিরগ্রন্থ ছিল, সবই কমবেশি অধ্যয়ন করার তাওফিক আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি মসজিদে উসমানিয়ায় আমি দীর্ঘদিন তাফসিরুল কুরআনের দরস দিয়ে এসেছি। তাই অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পূর্বে ইচ্ছা ছিল, কুরআনুল কারিমের সাথে চিরস্থায়ী একটি সম্পর্ক, কুরআনুল কারিমের সুপারিশ লাভের আশা, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালাকে রাজি-খুশি করার উদ্দেশে একটি তাফসিরগ্রন্থ রচনা করব। আমার পর্যবেক্ষণ অনুসারে, বর্তমান যুগে এমন কিছু বিষয় আমাদের জীবনে প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলোর ইসলামি উসুল অনুযায়ী

যুগোপযোগী ব্যাখ্যা পূর্বের তাফসিরগুলোতে সেভাবে পাওয়া যায় না। গতানুগতিক ধারা অনুসরণের পাশাপাশি এই বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনার জন্যই মূলত তাফসির রচনার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমি শারীরিকভাবে বার্ধক্যে পৌঁছার পূর্বেই অক্ষম হয়ে পড়ি। দেশে আসার পর একবার উদ্যোগী হয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল পছন্দের কিছু মেধাবী ছাত্রভাইকে সাথে রেখে তাফসিরপ্রকল্পটি শুরু করব। কিন্তু আমার অসুস্থতা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় এবং আনুষঙ্গিক আরো কিছু কারণে এখনো প্রকল্পটি অধরাই রয়ে গেছে। এখন তো জীবনের শেষপর্বে চলে এসেছি। আর শরীর স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে অচল-অক্ষম অবস্থায় রয়েছে। দোয়া চাই যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল জায়েজ ও নেক ইচ্ছা কোনো না কোনো সুরতে পূর্ণ করার তাওফিক দান করেন।

আমার জীবনের আরেকটি ইচ্ছা ছিল, আমাদের ইসলামি ফিকহের জগতে বিশেষত হানাফি মাজহাবের অন্যতম মৌলিক ফিকহের কিতাব আল-হিদায়া। এই কিতাবটি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে আমি নিউটাউনে একটানা অনেক বছর পাঠদান করেছি। হিদায়ার দরস দেওয়ার সময়গুলোতে আমার মস্তিষ্কে বেশ কিছু নতুন বিষয় এসে যায়। আসলে প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী লেখক তাদের রচনাকে সাজিয়ে থাকেন। আমিও ছাত্রদের মাঝে খেয়াল করতাম, তারা কোন ধরনের আঙ্গিক পছন্দ করছে এবং কীভাবে তাকরির করলে তারা বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এসব বিষয় পর্যালোচনা করে আমার মস্তিষ্কে আল্লাহ তায়ালা হিদায়া কিতাবটিকে একটি নতুন আঙ্গিকে সাজানোর ইশারা দেন। সে-সময় আমার মস্তিষ্ক আল্লাহর অনুগ্রহে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চিন্তাভাবনা করতে পারত। এতবড় একটি কিতাবের নতুন আঙ্গিক আমার মস্তিষ্কে আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। বিষয়গুলো কোথাও লিপিবদ্ধ বা নোট আকারে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিনি। ভেবেছিলাম, কিছুদিনের মধ্যেই রচনায় হাত দেব, তাই আলাদাভাবে নোট করার খুব একটা দরকার নেই। অতিরিক্ত এই আত্মবিশ্বাসের ফল আমাকে পরবর্তী সময়ে দিতে হয়েছে। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেই অসুস্থতা আজও বিদ্যমান। দিনের পর দিন আগের চেয়ে বেশিমাত্রায় অক্ষম ও অচল হয়ে পড়ছি। যদি বিষয়গুলো নোট করে রাখতে পারতাম, তাহলে কিছু যোগ্য তালিবে ইলম ভাইকে সাথে নিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে হিদায়ার কাজটি এগিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু এখন শুধু মৌখিক দিকনির্দেশনা দিয়ে এত বড় প্রকল্প এগিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। আমার জীবনের এই দুটো স্বপ্ন বাস্তবায়নের ব্যাপারে আমি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছি। আল্লাহ তায়ালার কাছে সব সময় দোয়া করি, যেন তিনি আমার মাধ্যমে

উম্মতকে আরো কিছু ফায়দা পৌঁছে দেন এবং আমার অসমাপ্ত ও অধরা কাজগুলোর নিয়তের উপর আমাকে কাজগুলো বাস্তবায়িত হবার সওয়াব দান করেন।

খিদমাতুল উম্মাহ : রফিকিল আ'লা

(অস্থায়ী ঠিকানার শেষ দিনগুলো...)

ভাই, দুনিয়া তো আসলে মুসাফিরখানা। আপনি যেখানেই থাকুন, আপনার পরিচয় তো একজন মুসাফির হিসেবেই থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তার দুনিয়ায় যেখানেই রাখবেন সেখানেই দীনের খেদমত করে যাব, এমনটাই ইচ্ছা আমার। এই যে হাটহাজারিতে এসে পড়বো, করাচিতে থাকতে এমন ভাবনা কল্পনাতেও আসেনি। জীবনের স্রোতধারায় আল্লাহ তায়ালা কোথায় নিয়ে যাবেন, কীভাবে রাখবেন, এটি তারই একান্ত ইচ্ছা। এখানে প্রায় দুই দশক ধরে দেশবাসী ও ছাত্রভাইদের খেদমত করে যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। হজ এবং উমরার ইচ্ছা আল্লাহ তায়ালা বেশ কয়েকবার পূরণ করেছেন। আগামীতেও যদি হারামাইনে উপস্থিত হবার তাওফিক হয়, তাহলে আন্তরিক ইচ্ছা তো থাকবেই যেন এই দুই শহরের কোনো একটিতে আল্লাহ তায়ালা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার তাওফিক দান করেন।

এখানে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি আমাকে আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমার শ্রদ্ধেয় উসতাদে মুহতারাম মুফতি আহমদ হাসান সাহেব তার হাতে গড়া একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। পাশাপাশি আরেকটি প্রতিষ্ঠান আমি নিজে প্রতিষ্ঠা করেছি। এসবই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ। সেখানে কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধ তাজবিদ শিক্ষা থেকে শুরু করে হিফজুল কুরআন, দরসে নিজামির প্রাথমিক কিছু কিতাব এবং একটি দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করেছি। দারুল ইফতা, দাওরাতুল হাদিস ব্যতীত খোলার পেছনে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ ছিল। হাটহাজারিতে আমি দায়িত্ব পালন করলেও সবকিছু নিজ ইচ্ছায় ঢেলে সাজানোর সুযোগ নেই। এখানে একটি নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী সবাইকে চলতে হয়। অপরদিকে দিন দিন আমাদের আল্লাহওয়ালা মুত্তাকি আকাবির মুফতিগণ দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন। এই আল্লাহওয়ালা মুফতিগণ সবসময় হককথা এবং হক বিষয়ের উপর ফতোয়া প্রদান করতেন। কিন্তু আজকাল এমন জমানা চলে এসেছে, ফতোয়া প্রদানের মতো যোগ্য ব্যক্তির প্রচণ্ড অভাব বোধ হচ্ছে। যারাও-বা ফতোয়া প্রদান করছেন তারাও ভুল-সঠিক মিশিয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন। সরকারি নানামুখী চাপের কারণেও অনেক যোগ্য ব্যক্তি সঠিক ফতোয়া

জেনে-বুঝে গোপন করছেন। এমন কঠিন ও নাজুক সময়ে সঠিক ফতোয়া প্রদানের জন্য একদল আল্লাহওয়ালা, সাহসী ও যোগ্য মুফতির প্রয়োজন। এই ধরনের কিছু মুফতি হজরতকে প্রশিক্ষিত করতেই আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করে আমি এই দারুল ইফতাটি প্রতিষ্ঠা করেছি। আপনাদের কাছে দোয়া চাই, যেন উদ্দেশ্য সামনে রেখে সকল বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কিছু মুখলিস খাদেম তৈরি করতে পারি।

আমার পরিচালিত দুটি প্রতিষ্ঠানে আমি তাজবিদ অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে কুরআনুল কারিম তেলাওয়াতের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এক বছর মেয়াদি কোর্স রেখেছি, যেখানে দাওরায়ে হাদিস সমাপন করে আসা অনেক আলিম ভাই অংশ নিয়ে কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত, এর ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ এবং অন্যান্য ফুনুন এক বছর মেয়াদে চর্চা করে থাকেন। বছর শেষে তাদেরকে আমরা তাজবিদের উপর বিশেষজ্ঞ আলিম হিসেবে সনদ প্রদান করে থাকি। আমার শ্রদ্ধেয় উসতাদগণ বলতেন, আবদুস সালাম, সদকায়ে জারিয়া তৈরির সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো কুরআনুল কারিমের উপর কোনো কাজ করে যাওয়া। এই উপদেশটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আমি তাজবিদ কোর্সটি সাজিয়েছি। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের অনেক তরুণ আলিম ভাই আছেন, যারা ১২ বছর দরসে নিজামি পড়াশোনা তো করেন মাশাআল্লাহ; কিন্তু কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের ব্যাপারে খুব কমই ফিকির করেন। যার ফলে এমন অনেক আলিম ভাইকে আপনি পেয়ে যাবেন, দুঃখজনকভাবে যারা আলিম হিসেবে সনদ অর্জন করেছেন ঠিকই; কিন্তু কালামে পাকের বিশুদ্ধ ও মানসম্মত তেলাওয়াত করতে এদের অনেকেই অক্ষম। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কালামে পাকের সাথে আমরণ সম্পৃক্ত থাকার তাওফিক দান করুন।

অজানা অধ্যায়

(উলুমে তাজবিদের উপর আমার বিশেষ একটি সনদ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় কিছু স্মৃতি তুলে ধরছি। আশা করি অনেকে উপকৃত হবে।)

ঘটনাটি প্রেক্ষাপটসহ বললে একটু বিস্তারিতই হয়ে যাবে। তবু বলে রাখা ভালো। পরবর্তীরা যদি কোনো উপকার লাভ করে। এটি থেকে আমিও আখেরাতে উপকৃত হব, ইনশাআল্লাহ। মূলত সে-সময় আমি করাচিতে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলাম।

যুদ্ধপরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে থেকে যাওয়া বাংলাদেশিদের জন্য দিনাতিপাত করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। যুদ্ধের কয়েক বছর পরের ঘটনা। হঠাৎ একদিন শুনি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কে বা কারা যেন হত্যা করে ফেলেছে। যুদ্ধের পর কয়েক বছরে আটকেপড়া বাংলাদেশি ভাইয়েরা পাকিস্তানে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংবাদ শোনার পর আবার নতুন করে উদ্বেগের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকে সবাই। শেখ সাহেবের মৃত্যুর পর ভারত বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলতে পারে, এই ধারণা সবার অন্তরে ছেয়ে যায়। নিজ নিজ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের চিন্তায় সকলেই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। দেশে সকল আত্মীয়স্বজন ও পরিবার-পরিজনের চিন্তায় আমিও অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রথমে কিছুদিন জ্বর এরপর হঠাৎ করে আমার কঠিন একটি ব্যাধি দেখা দেয়। ১০ দিন অতিবাহিত হবার পর শরীরে গোটা গোটা দাগ পড়ে যায়। কেমন যেন জীবনের আশাই ছেড়ে দিচ্ছিলাম। একদিন এক শাগরেদকে হজরত বানুরির কাছে পাঠিয়ে আমার করুণ অবস্থা অবহিত করি। উনি খবর শোনামাত্র তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম বড় হাকিম, যিনি হাকিম আজমল খান সাহেবের অত্যন্ত নিকটতম শাগরেদ ছিলেন এবং দেওবন্দেও পড়াশোনা করেছিলেন, উনাকে লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করে ডেকে আনান।

হাকিম সাহেব ছিলেন অত্যন্ত খোশমেজাজসম্পন্ন। তিনি শুরুতেই আমাকে এমন কিছু কথা বললেন, যার দ্বারা আমার কষ্ট ও বেদনা সম্পূর্ণরূপে লাঘব হয়ে যায়। এরপর হাকিম সাহেব আমার নাড়ী অর্থাৎ হাতের পালস পরীক্ষা করেন। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে তিনি আমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। কতক্ষণ আমি পড়াশোনা করি, কতক্ষণ ছাত্রভাইদের সাথে সময় অতিবাহিত করি, কতক্ষণ অন্যান্য কাজ করি ইত্যাদি। তিনি আমাকে একথাও জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি শরীরচর্চামূলক কিছু কাজ করে থাকি কি না। আমি অপারগতার সাথে জবাব দিই, হজরত, পড়ানো এবং অধ্যয়নেই আমার সিংহভাগ সময় চলে যায়। শরীরচর্চা আমি কখন করব? হাকিম সাহেব আমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে বললেন, নবীজির কাছে কিন্তু আমরা শরীরচর্চার উপদেশও পেয়েছি। আমাদের উচিত শরীর তরতাজা এবং কর্মক্ষম রাখতে নিয়মিত কিছু ব্যায়াম করা। এরপর হাকিম সাহেব আমাকে অদ্ভুত একটি নসিহত করে বসলেন। তিনি বললেন, আপনার উচিত বেশ কিছু সময়ের জন্য অবস্থান পরিবর্তন করা। এতে করে আপনার শরীর নতুন আবহাওয়ার বরকতে আবারো কর্মক্ষম হয়ে পড়বে। আলাপ শেষে এবার তিনি হজরত আল্লামা বানুরির কাছে

আমার পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাঠালেন, যেন মুফতি সাহেবকে ন্যূনতম দুই মাসের জন্য প্রাকৃতিকভাবে নাতিশীতোষ্ণ এবং মনোরম আবহাওয়াসম্পন্ন কোনো অঞ্চল যেমন লাহোর, ইসলামাবাদ বা কাশ্মির প্রভৃতি অঞ্চলে পাঠানো হয়। এতে করে মুফতি সাহেব প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাবেন। এরপর হাকিম সাহেব আমাকে সামান্য কিছু ওষুধ-পথ্য দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

বানুরি হজরত যখন শুনলেন, হাকিম সাহেব আমাকে আবহাওয়া পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন, তখন তিনি নিজে আমার কামরায় আসেন। জানতে চাইলেন আমি পছন্দের কোনো অঞ্চলে যেতে চাই কি না। জবাবে আমি বলি, হজরত, পাকিস্তান তো আমার বেশি পরিচিত ভূমি নয়। এই করাচি ও আশপাশের কিছু শহর আমি চিনি ও জানি। দূরে কোথাও কেউ আমার পরিচিত নেই। তবে লাহোরে আমার এক পরিচিত সাথি রয়েছেন। কারি সাহেব। আপনি অনুমতি দিলে আমি সেখানে যাওয়ার ইরাদা রাখি। বানুরি সাহেব আমার জবাবে অত্যন্ত খুশি হন। উনে আমাকে প্রস্তাব দিয়ে বলেন, আপনি লাহোর যখন যেতে চান তাহলে জামিয়া আশরাফিয়ায় আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ছোট কোনো প্রতিষ্ঠানে হয়তো আপনার একটু কষ্ট হতে পারে। জামিয়া আশরাফিয়ার মতো বড় পরিবেশে তলাবাদের মাঝে আপনার সময় ভালোই কাটবে, আশাকরি। তবু আমি অনুরোধ করি বানুরি হজরত কেবলই যেন একটি সাধারণ চিঠি লিখে দেন, যেখানে লাহোরের যেকোনো প্রতিষ্ঠানে হজরতের তরফ থেকে আমার অবস্থানের ব্যাপারে তার ইজাজত থাকবে। বানুরি হজরত সেভাবেই একটি চিঠি লিখে আমাকে দিয়ে দেন।

গন্তব্য যখন লাহোর

দুমাসের সফরের প্রস্তুতি নিয়ে আমি লাহোর যাত্রা করি। সেখানে প্রথমে আমার পরিচিত সাথি, যিনি একজন কারি সাহেব ছিলেন, তার কাছে উঠি। আবহাওয়ার পরিবর্তনে আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলাম। আমার সাথি জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা জানতেন। বেশ কিছুদিন থাকার পরে তিনি আমাকে একটি পরামর্শ দেন। সুস্থাবস্থায় যে কদিন লাহোরে থাকব, সে সময়গুলোতে কেরাতশাস্ত্র অধ্যয়ন যেন করে নিই। বাংলাদেশ থাকাকালীন আমার কেরাত মোটামুটি শুদ্ধ হয়েছিল বলা চলে। কিন্তু একদম শাস্ত্রীয়ভাবে সনদসহ জ্ঞানার্জনের সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাইলাম না। সাথিকে আমার আগ্রহের কথা ইতিবাচকভাবে জানিয়ে দিলাম। তিনি পরদিনই লাহোরের বিখ্যাত কারি আবদুল মালেক সাহেবের সুযোগ্য

পুত্র মাওলানা কারি মুহাম্মদ শাকের সাহেবের কাছে আমার পক্ষ হয়ে দরখাস্ত করেন। সে সময় তিনি জামিয়া আশরাফিয়ার কেরাতবিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। আমি তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সাথে আমাকে বরণ করে নেন। কেরাতশাস্ত্রের উপর আমার আগ্রহের কথা শুনে কারি সাহেব দারুণ খুশি হন। সে সময় তার দৈনন্দিন রুটিন ছিল সকাল বারোটা পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্রকে কেরাত শেখানো। আমাকে তিনি দুপুরের পর সময় দেওয়ার কথা দেন। আমি আগ্রহের সাথে প্রতিদিন তার কাছে এক ঘণ্টা করে সময় দিতে থাকি। এভাবে প্রায় দুমাসে এই শাস্ত্রের অন্তর্গত ফাওয়ায়েদে মাক্কিয়াহ ও সাবআ-আশারা কেরাতের প্রাথমিক পরিচিতির উপর নির্ধারিত কোর্স সম্পন্ন হয়। এরই মাঝে আমি আল্লাহ তায়ালার রহমতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। ওদিকে নিউটাউন থেকে আমার নিকট একটি চিঠি আসে। সেখানে বানুরি সাহেবের পক্ষ থেকে লেখা ছিল, হজরত মুফতি সাহেব, আল্লাহ তায়ালা যদি আপনাকে পুরোপুরি সুস্থতা দান করে থাকেন, তাহলে ছাত্রভাইদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আপনাকে সফরের অনুরোধ জানাচ্ছি। চিঠি পাওয়ামাত্র আমি করাচি সফরের জন্য ব্যাগ গুছিয়ে ফেলি। ওদিকে কারি সাহেবের ষাণ্মসিক পরীক্ষার আর কিছুদিন বাকি ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন পরীক্ষার পর সকলের সাথে আমাকেও কেরাতশাস্ত্রের উপর একটি কৃতিত্বের সনদ প্রদান করবেন। কিন্তু আমি তড়িঘড়ি করে চলে যেতে চাইলে তিনি বলেন, আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে সনদ লিখে নিউটাউনে পৌঁছে দেব, ইনশাআল্লাহ।

কালামে পাকের বরকত

যথারীতি এরপর আমি নিউটাউনের ফিরে আসি। পরিপূর্ণ সুস্থতা ও পূর্ণ উদ্যমে আবার দারুল ইফতায়, দরস-তাদরিসে ব্যস্ততম দিনগুলো কাটতে থাকে। কেরাতশাস্ত্রের উপর করা এই কোর্সের ফলে আমার একে তো নানা হরফে কুরআনে কারিমের তেলাওয়াত বিশুদ্ধতায় পূর্ণতা পেয়েছিল, অপরদিকে এর মাধ্যমে আমার রিজিকের কিছু রাস্তাও আল্লাহ তায়ালা খুলে দেন। আমাদের নিউটাউনে একটি রীতি ছিল, প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত পেশ ইমাম সাহেব মসজিদে উপস্থিত না থাকলে অথবা ছুটিকালীন ইমাম সাহেব অনুপস্থিত থাকলে মাদরাসার নাজিম সাহেব ইমামতের দায়িত্ব পালন করবেন। ঘটনাক্রমে আমি সেই সময়ে চার বছরের জন্য দারুল ইকামার নাজিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। কোনো এক ছুটিতে ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে দীর্ঘদিন আমাকে কয়েক ওয়াক্তের ইমামত করতে হয়। হঠাৎ নতুন

ভঙ্গি ও ভরাট কণ্ঠের অধিকারী ইমাম পেয়ে এলাকাবাসী প্রীত হন। তাদের মাধ্যমে ইমাম সাহেবের সামান্য খ্যাতি করাচি শহরে ছড়িয়ে পড়ে! এর কিছুদিন পর মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেবের কাছে জামশেদ রোডে অবস্থিত উসমানিয়া মসজিদের কমিটির সদস্যরা সাক্ষাত করতে আসেন। মসজিদে দীর্ঘদিন যাবত একজন আলিমে দীন ইমামত করে আসছিলেন; কিন্তু তিনি প্যারালাইজড হয়ে যাওয়ায় সম্প্রতি দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এসময়ে কমিটি একজন দীনি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং কেরাতশাস্ত্রে পারদর্শী আলিমকে ইমাম হিসেবে নিয়োগদানের জন্য নিউটাউনে যোগাযোগ করেন। এই সাক্ষাতে মুফতি আহমাদুর রহমান সাহেব তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন, আপনাদেরকে এমন একজন ইমাম সাহেব প্রেরণ করব, যিনি একইসাথে কেরাতশাস্ত্রে পারদর্শী এবং দীনি বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ মুফতি। কমিটি এই প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশি হয়ে বিদায় নেন। এভাবে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানির স্মৃতিবিজড়িত জামশেদ রোডের উসমানিয়া মসজিদে অধমের ইমামতির সুযোগ হয়ে যায়। আমি দীর্ঘ ২৫ বছর সেখানে ইমামের দায়িত্ব পালন করেছি।

নিউটাউনে একসময় অভিজ্ঞ আরেকজন কারি সাহেবের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কোনো কারণে সে সময়ে অভিজ্ঞ কোনো কারি সাহেব পাওয়া যাচ্ছিল না বিধায় কর্তৃপক্ষ অধমকে নাহবেমির এবং দাওরায়ে হাদিসের ছাত্র ভাইদের জন্য বেশ কয়েক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, কেরাতশাস্ত্রে সামান্য কিছু সময় ব্যয় করার পরেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই ময়দানে আশাতীত ফায়দা পৌঁছেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

অন্তিম প্রকল্পগুলো...

দেশে ফিরে তাই হাটহাজারির দারুল ইফতার পাশাপাশি আমার মৌলিক দুটো লক্ষ্য ছিল। এক. একটি স্বাধীন, প্রভাবমুক্ত ও পরিপূর্ণ ইসলামি মেজাজের দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করা। দুই. বিশাল আকারে নাজেরা এবং হিফজের সুযোগসংবলিত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে এবং আমার উসতাদদের দোয়ার বরকতে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অধমের হাত ধরে সীমিত আকারে বাস্তবায়িত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সবকটি প্রকল্পই বিশেষ এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত। আপনাদের কাছে দোয়া চাই যেন মৃত্যু পর্যন্ত কুরআনে কারিমের শুদ্ধিকরণ ও দীনদরদি মুসলমানদের কাছে ইসলামের সহিহ মাসআলা পৌঁছে দেওয়ার মতো দুটো মহান দায়িত্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে যেতে পারি।

আরেকটি বিষয়ে আপনার মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম এবং দেশবাসীর কাছে দোয়া চাইব। সেটি হলো, করাচিতে থাকাকালীন অধমের লিখিত ফতোয়াসমগ্র জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া নামে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। দেশে ফেরার পর বিগত সময়গুলোতে প্রকাশিত ফতোয়াগুলো একই নামে আরো চারটি নতুন খণ্ডে তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়াও নানা সময়ে অনেক ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। টেলিফোন, ই-মেইল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকালে লিখিত ফতোয়াগুলোও একত্র করার প্রচেষ্টা চলছে। আমার প্রত্যাশা, আমি জীবিত থাকাকালীন সময়ে ১০ খণ্ডের এই ফতোয়া সংকলনটি আলোর মুখ দেখবে। আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের কাছে দীনের সঠিক মাসআলা বিশুদ্ধতম তথ্যসূত্রের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দেন। এর মাধ্যমে আমাকে ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষমা করুন।

অনুলেখক : হজরত, আমরাও আপনার কাছে দোয়া চাই, যেন পরিপূর্ণ দীনদারি, সুন্নাতের ইত্তেবা এবং উম্মতের হক্কানি-রব্বানি আলিমগণের পরামর্শে জীবন অতিবাহিত করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

হযরত : আপনিও অনেক কষ্ট করে সফর করেছেন। আমার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য এতদিন অবস্থান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকেও কবুল করুন। মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। যেখানেই থাকবেন, ভালো থাকবেন। জাযাকাল্লাহু খাইরান। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

সমাপ্ত